নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে)

নেতাজী ও কুইস্‌লিং প্রসঙ্গ

বঙ্গজ ভারত-নাগরিক

প্রকাশ ভট্টাচার্য্য

প্রীতি প্রকাশনী
৮৮, হরিশ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০২৫

প্রথম প্রকাশ
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৫

প্রকাশক :
প্রীতি প্রকাশনী
৮৮, হরিশ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৫।

মুদ্রক :
এস. কে. সেনগুপ্ত
প্রিণ্ট হাউস,
৪, গোবিন্দ সেন লেন,
কলিকাতা-১২।

গ্রন্থন :
সুনীল ব্যানার্জী
জয়তারা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

প্রচ্ছদপট : নীলশ্রীনা

নাম বিভ্রাট

বইটির নাম 'নেতাজী ও কুইস্‌লিং প্রসঙ্গ' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'কুইস্‌লিং প্রসঙ্গ ও নেতাজী' অর্থাৎ উল্টোটা ছাপা হয়ে গিয়েছে ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোতে। এই ভুলটির জন্য আমি দুঃখিত।

গ্রন্থকার

আমার মাকে দিলাম

স্মরণে

এ বই লেখবার সময় বারে বারে একজন সত্যিকাবের নেতাজী-ভক্তের কথা মনে পড়েছে।

শৌলমারীর ঢেউ যখন পশ্চিমবাংলা-তটকে প্রচণ্ডরূপে আঘাত করে প্রায় ভাঙবার উপক্রম করছিল সেই ১৯৬১-৬৪ এর বহু সকাল-সন্ধ্যা-দিবাভাগ কেটেছিল দুই নেতাজী-পাগলের পারস্পরিক সাহচর্যে। সরল বিশ্বাসী ঐ দুজনই সেদিন আর দশজনের মতো 'শৌলমারী সাধুই নেতাজী' এই প্রচারের শিকার হয়ে অতি সহজেই বিভ্রান্ত হয়েছিল।

আমার সেই বন্ধু ৺অনিল ব্যানার্জী জেনে যাননি যে ঐ 'দুই পাগলের এক পাগল' শেষ পর্যন্ত নেতাজী রচনার মত দুরূহ কাজে হাত দেবে। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে!

'নেতাজী ও কুইস্‌লিং প্রসঙ্গ' প্রকাশ-প্রাক্কালে ২৫.৮.৭২-এ তিরোহিত আমার বন্ধুকে স্মরণ করছি। তিনি আজ অজানা দেশেব বাসিন্দা— তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ বহুজনের বহু সমালোচনার সম্মুখীন হবে, বহু লোকের রোষ উন্মেষের কারণ হবে এ সম্পর্কে সচেতন থেকেই এ রচনায় হাত দিয়েছি। আমি জানি, এ বই অন্ততঃ একজন একনিষ্ঠ পাঠক পেত যিনি এর প্রতিটি লাইনের সঙ্গে একাত্ম হতেন। বস্তুতঃ এ বইয়ের লেখার মধ্যে আমার সেই প্রয়াত বন্ধুর বহু সুস্থ চিন্তাধারার এবং বিশ্বাসেরও প্রতিফলন থাকলো।

এই মুহূর্তে আরও বিশেষ একজনের কথা মনে পড়ছে—তিনি আমার পরম পূজনীয় পিতৃতুল্য শ্বশুর মহাশয় স্বর্গীয় তরণী কান্ত রায়। সামান্য দিনের ব্যবধানে (১৫. ৬. ৭৩-এ তিনি দেহরক্ষা করেছেন)

এ বইটি প্রকাশিত হচ্ছে সেজন্য তাঁর কথা বেশী করে মনে হচ্ছে। যদিও তিনি এ বইটির কথা জেনে যাননি তবু আমি মনে করি তাঁর আত্মার আশীর্বাদ আমি নিশ্চয়ই পাব। আজ থাকলে তিনি কত না খুশী হতেন!

মননে

প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার জানাই সেই ছোট্ট মুদ্রণ-ঘরের ততোধিক ছোট্ট ছোট্ট মানুষ গুলোকে। ভোরবেলা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নীচু ছাদের আলোবাতাসহীন ঘরে বসে অথবা দাঁড়িয়ে যাঁরা ছাপার হরফ সাজিয়েছেন দিনের পর দিন নিজেদের অর্ধভুক্ত-অভুক্ত অবস্থাতেই, তাঁদের নীরব অক্লান্ত ও আন্তরিক পরিশ্রমের কথা কখনো ভুলবার নয়। প্রেস মালিক-মুদ্রাকর, কম্পোজিটার, মেসিন-ম্যান আর সেই বাচ্চা ছেলেটা (রামের সেতু সৃষ্টির কাজে সাহায্যকারী সেই কাঠবিড়ালীটার মত যে নানাভাবে বই মুদ্রণে সাহায্য করেছে)—প্রত্যেকের কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। এই সাথে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এ বইয়ের বাইণ্ডার বন্ধুকে যাঁর সহযোগিতায় ও চেষ্টায় আমার মনস্কামনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হল। এ ছাড়াও জানাই কৃতজ্ঞতা সেই ছাতার দোকানের মালিক-দাদাকেও। এই বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশে তাঁর অবদানও অপরিসীম।

আমার সেই 'বহু পুরাতন' বন্ধু ও তাঁর সহধর্মিনীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বহু বছর পরে ১৯৭৪-এ তাঁদের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সাথে আমার এ বই প্রকাশের বিশেষ একটি যোগ আছে। অসম্ভব ছিল আমার এ কাজ সম্পাদন তাঁদের সাহায্য ছাড়া।

১৯৫৮-এ 'পার্ক সার্কাসের সার্কাস' (?) এ যাঁর অংশগ্রহণ করবার সৌভাগ্য হয়েছে, নেতাজীর করস্পর্শ যাঁর জীবনে ঘটেছে, নেতাজী সম্পর্কে একাধিক টুকরো টুকরো গল্প তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। এই রচনা প্রকাশ সম্বন্ধে যখন হতাশ হয়ে পড়ছিলাম, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না, তখন এই মলিন মুখে আশার হাসি যিনি ফুটিয়ে তুলতে দিনের পর দিন চেষ্টা করেছেন ভরসা দিয়ে, সেই প্রবীণ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সংসারী অথচ সংসারে পুরোপুরি নির্লিপ্ত শ্রদ্ধেয় জনের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য ছাড়া এ বই প্রকাশ করা অসম্ভব হতো—তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ওঁর সাথে পরিচয় যিনি করিয়েছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে, আমার সেই সহকর্মী বয়স্ক ভদ্রলোককেও এজন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গোষ্ঠীস্বার্থের সঙ্গে পূর্ণভাবে যুক্ত এমন লোকের অন্তরের গভীরেও থাকতে পারে গোষ্ঠী-স্বার্থ বিনাশের আকাঙ্খা এ জিনিস যেদিন হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলাম বিবাদী বাগের সম্ভ্রান্ত সড়কের উপরে অবস্থিত অট্টালিকার তিনতলার সাজানো প্রকোষ্ঠে এয়ার কণ্ডিশনড চেম্বারের মালিকের সামনে বসে, সেদিন অবাক হয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে সাহায্য আকাঙ্খী তার হাত বাড়িয়েছে, দাতা তাকে বিমুখ করেন নি। এ বই প্রকাশ প্রাক্কালে আমার সেই বয়সে-শিক্ষায় দীক্ষায়-সামর্থে এগিয়ে থাকা সুহৃদ দাদার সাহায্য স্মরণ করে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

তিরিশ দশকের 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে'র বিপ্লবী সত্তরের দশকে এসেও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন এবং পুরোপুরি সজীব-কর্মচঞ্চল আছেন, স্মৃতি থেকে নিজেদের পুরনো দিনের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর কিছু গল্প—আর পাঁচজন আখের গুছানো বয়স্ক রাজনীতিকদের মতো ভাসা ভাসা দার্শনিক-দার্শনিক গল্প —ঘরে বসে নবীনদের শুনিয়ে দিন কাটান না, এমন সুস্থ চিন্তাধারা সম্পন্ন প্রবীণ রাজনীতিক এবং অসামান্য শক্তিশালী

লেখকের কাছে গিয়েছিলাম বইটা ছাপা শেষ হবার মুখে। সেই সময়ে তিনি যে মূল্যবান উপদেশগুলি দিয়েছেন তার দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত। এ বই যদি ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করে তবে তাঁর দান, তাঁর এ প্রত্যক্ষ দান অসামান্য হয়ে থাকবে। এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার—আমার এ পুস্তকের মধ্যে তাঁর নিজের লেখার বহু প্রতিফলন থাকলো। ইদানীং কালে প্রকাশিত তাঁর প্রতিটি লেখা (বোধ হয় অত্যুক্তি হচ্ছে না, আর না হয় 'প্রায়' কথাটি যোগ করা থাক) আমি পড়েছি। অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি সহজ সরল সুস্থ মনের অধিকারী এই পরম শ্রদ্ধেয় জনকে—আমার মন সৃষ্টিতে তাঁর পরোক্ষ দান অসামান্য।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিভিন্ন সংবাদ পত্র, পত্র-পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে যাদের সাহায্য নিয়েছি এ গ্রন্থ রচনায়। যে সব বইয়ের সাহায্য ছাড়া এ বই লেখা সম্ভব হত না তাঁদের লেখককেও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিভিন্ন সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের কথা আগে লিখলেও বিরাট একটা ফাঁক থেকে যাবে যদি 'সত্যযুগ' পত্রিকার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ না করি। যদিও আমি বেশ কয়েক বছর আগে লেখা সুরু করেছিলাম, তবু ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুযোগ 'সত্যযুগ' পত্রিকা.কর্তৃপক্ষই প্রথম দিয়েছেন। এজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রভাত গোস্বামী মহাশয়কে যিনি আশার বীজ বপন করে অনুপ্রেরণার রস সঞ্চয় করে আমার রচনাকে এত বড় মহীরুহে পরিণত হতে সাহায্য করেছেন।

নিজের অসময়ে দুর্বল মুহূর্তে হেলে পড়বার সময়ে যিনি ঠেলা দিয়ে সোজা করে খাড়া রাখেন, আমার দুঃসময়ের প্রতিদিনে প্রতিক্ষণ 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত ভূমিকা যাঁর, আমার সেই ছোটবেলার 'একাই একশ' প্যালারাম বন্ধুর সাহায্য

ছাড়া এক পা' অগ্রসর হবার ক্ষমতা ছিল না এই দুরূহ কাজে। দিনের পর দিন নিজের কাজকর্ম সব জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজের নাক কেটে আমার এ পুস্তকের যাত্রা সুরু করাবার পেছনে তাঁর অবদানের কথা কখনও ভোলবার নয়। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ও হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞ…না, না বন্ধু জানলে ক্ষেপে উঠবেন— বলবেন, 'আমার সাথেও ফর্মালিটি !' থাক, তাঁর সাহায্যের কথা মনে রাখবো এ কথাটাই শুধু থাক।

পাণ্ডুলিপি সৃষ্টি থেকে বই ছাপার অক্ষরে আনা পর্যন্ত বহু সময় গড়িয়েছে— পথ বড় কম নয়, পঙ্গুর পক্ষে দুর্গম গিরি পর্যন্ত পৌঁছানো এবং তা লঙ্ঘন যতটা শক্ত তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয় আমার মত অনভিজ্ঞ ভাব বিলাসীর পক্ষে। এই অসম্ভব কাজটা কিছুতেই সম্ভব হত না আরও একজনের সাহায্য ছাড়া। সাংসারিক জীবনে প্রায়শই ব্যাক-গিয়ার দিয়ে বসে থেকে 'লেখক সাজা'র বিলাসিতা 'ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পেছনে ছোটা'র সামিল কিন্তু তা আমি করেছি এবং বহুদিন ধরে করেছি। এটা করতে গিয়ে নিজেকে বহু অসুবিধায় ফেলেছি, ফেলেছি নিজের সংসারকেও। এই অবুঝ (!) মনটার 'অবুঝ ধাক্কা' সব সময়ে যাঁকে সামলাতে হয়েছে-হচ্ছে তাঁর কাছে আমার ঋণ পর্বত পরিমাণ হয়ে থাকলো। আমি তাঁকেও, আমার জীবন সঙ্গিনীকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। হ্যাঁ, এখানে বলে রাখি আমার সেই প্যালারাম বন্ধু, গোষ্ঠীস্বার্থের মধ্যে আন্তরিক ভাবে জড়াবার মত সামাজিক অবস্থান যাঁর অথচ রাস্তা যাঁকে টানলে বেশী চিরটাকাল, তাঁর জন্যও কৃতজ্ঞতা রাখছি—তাঁর জন্য নির্বাচিত প্যারা-গ্রাফ পড়েই নিশ্চয়ই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন—এই 'কৃতজ্ঞতা' প্রকাশের কথাটা হয়ত তাঁর চোখে আটকাবে না, অতএব তাঁর রোষবহ্নির কবলে নিশ্চয়ই পড়তে হবে না। ভিন্ন প্যারাগ্রাফের অন্য কথাগুলোর আড়ালে আর সকলের কাছেই না হয় তাঁকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা জানিয়ে

রাখি। আমার কথাগুলো নিছক ব্যক্তিগত স্মৃতি— কিছু দেনা আছে বন্ধুর কাছে, তাই দু'কলম লিখে ঋণ শোধের চেষ্টা। অতএব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে (গ্যাসে ফোলে না ভোলে না কোন্ জন?) বলছি এ ধারণা নিয়ে ঐ লাইন গুলো পড়লে কিন্তু ঠিক হবে না। এ বই যদি কখনও সচলতা প্রাপ্ত হয় তবে জানবেন কষ্টকর ফার্স্ট গিয়ার আর সেকেণ্ড গিয়ারটা তাঁরই হাতে টানা— টপ গিয়ারে হাত দিয়ে স্পীড এনে এফিসিয়েণ্ট ড্রাইভার হিসাবে পরিচিতির সুযোগ যদিও আমারই থাকলো।

বহুজনে যখন ভেবেছেন 'গরীবকে ঘোড়া রোগে' ধরেছে, লেখার জগতের কেউ না হয়েও বই লেখা সম্পর্কীয় আমার কথাগুলো যখন পাগলামি বলে মনে করেছেন, সে সব সময়ে এ কাজে আমার মায়ের সমর্থন লক্ষ্য করেছি। এই লেখাকে কেন্দ্র করে বহু অসাচ্ছন্দ্য বহুদিন ধরে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। পাগল ছেলের পাগলামি হাসি মুখেই সহ্য করেছেন তিনি। বই প্রকাশে আমার আন্তরিক আকাঙ্খার সাথে তাঁর আকাঙ্খাও যুক্ত হয়েছে। মায়ের কাছে ছেলের ঋণ তো সারাজীবনের, অতএব তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু বলি তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া এ বই কোনদিনই প্রকাশিত হত না।

আমার শ্বশুরকুল, নিজের পরিবারভুক্ত জন, এবং নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি—কারো নীরব কারো সরব— আন্তরিক সে উৎসাহ দান আমাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। আমি তাঁদের মুখ মনে করে প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এবং আরো দশজন যাঁরা আমার লেখার প্রতি সময়ে অসময়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাঁদেরও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

বঙ্গজ ভারত-নাগরিক

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ প্রকাশ ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব (১—১৭৭)

দ্বিতীয় পর্ব (১৭৮—২৯০)

কে দেশের শত্রু, মিত্র কেবা বোঝা ভার। আমাদের সুভাষচন্দ্রের বরাতে 'কুইস্‌লিং' (দেশদ্রোহী) আখ্যা মিলেছিল চল্লিশ দশকের ভারতবর্ষীয় কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকে। অবস্থার ফেরে সেই কমিউনিষ্ট-রাও 'ফিফথ কলামিষ্ট' নাম পেল নেহরু সরকারের কাছ থেকে ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়। এর আগেও দেশদ্রোহিতার অপরাধে পুরো পার্টিটাকে অবৈধ বলে ব্যান্‌ করেছিল গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিযা স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সনের ২৫শে মার্চ তারিখে, দোল পূর্ণিমার দিনে।

দিন গড়িয়েছে কিন্তু বাংলার আকাশে বাতাসে আজও ঐ কথাটি ঘুরে বেড়ায়, কথাটি এতদিনেও ফুরিয়ে যায় নি। সত্যি কথা বলতে কি, চার অক্ষর বিশিষ্ট ঐ ছোট্ট শব্দ 'কুইস্‌লিং'টি ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের রাজনীতির উপর যত প্রভাব বিস্তার করেছে, গত তিরিশ বত্রিশ বছরের মধ্যে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন শব্দ এককভাবে অন্য কোন স্থানের রাজনীতির উপর এমন প্রাধান্য লাভ করেছে বলে শোনা যায় নি। শব্দটি ছোট্ট হলেও আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশের বর্তমান নাই নাই, খাই খাই অবস্থায় ১৯৭৪ এর জানুয়ারী মাসে নেতাজী দিবসের প্রাক্কালে অতবড় দামী শব্দটির সঠিক মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

সুভাষচন্দ্রকে শত্রু মনে করেছিল তিন পক্ষই — ব্রিটিশ, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কম্যুনিষ্টরা। সুভাষের জীবনে স্বপ্ন ছিল বৃটিশ বিতাড়ন এবং তা যে ভাবেই হোক। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তার শত্রু ঠিকই চিনেছিল। চার্চিল মনে করতেন 'সুভাষ প্রথম শত্রু' যদিও গান্ধী-জহরলালের বৃটিশ আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিলনা তাঁর মনে। মাঝে মাঝে অসহযোগ আন্দোলন ও দু-চারবার কারাবরণের চেয়ে বেশীদূর

অগ্রসব হবার ক্ষমতা তাঁদের ছিলনা ধূর্ত ইংরেজদের সেটা বুঝতে বেশী মাথা ঘামাতে হয়নি। ১৯৩৯-এ কংগ্রেস থেকে বহিস্কার দ্বারাই গান্ধী-জহরলালের কংগ্রেস তাদের সুভাষ-বৈরীতার স্বরূপটা মানুষের কাছে সঠিকভাবে ধরিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে নেহরুজীর বিশেষ উক্তিটি 'সুভাষ বোস ফিরে এলে আমিই সবার আগে খোলা তরবারি নিয়ে রুখে দাঁড়াব' আর যাই হোক সুভাষেব দেশপ্রেমিকতার সার্টি-ফিকেট নয় এটা সকলেই বোঝেন। 'দেশদ্রোহী'কেই রুখবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন পণ্ডিতজী। 'হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন' মহাত্মাজীব এই উক্তিটিই বা কোন্ মহত্ব প্রকাশ করেছিল তাঁর? বিভিন্ন সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি সুভাষকে সমর্থন করেছিল যখন বৃটিশ-বিতাড়ন প্রসঙ্গ নিয়ে গান্ধী ও গান্ধীবাদী নেতাদেব সঙ্গে সুভাষের মতবিরোধ ঘটে। কিন্তু দিন পালটিয়েছিল— জাপ রাশিয়ার যুদ্ধ আরম্ভেব পরই তাঁবা সুভাষের বিপক্ষে যান। বাশিয়া জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হবার পরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পট-ভূমিকায় তাঁদের ধারণা পাল্‌টে যায়। পিপলস্ ওয়াব, জনযুদ্ধ, অতএব সর্বশক্তি দিয়ে 'জাপানকে রুখতে হবে', 'হিটলারকে'ও 'রুখতে হবে' আব সেই রুখতে গিয়েই ব্রিটিশ সহযোগিতা করে বসলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে 'ফ্যাসিস্ট' 'কুইস্‌লিং' আখ্যা দিলেন। একনিষ্ঠ দেশসেবক যিনি জীবনের সব সুখ শান্তি যৌবন-ধন-মান বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য এত করলেন, আবার দেশেরই লোকেব অসহযোগিতায়, অহিংস-গান্ধীর অনুদার ও অযৌক্তিক অসহযোগিতায় নিরূপায় হয়ে বিদেশে গেলেন স্বাধীনতা আনয়ন-আকাঙ্খায়, স্বাধী-নতার ভগীরথ সেই সুভাষচন্দ্রই হলেন 'দেশদ্রোহী' আর তা' বললো তারা কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যাবা তাঁর সুহৃদ ছিল।

বৃটিশ উৎপীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করা সুভাষচন্দ্রের জীবনের সাধনা ছিল। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সেই একমদ্বিতীয়ম্

চিন্তা ছিল তাঁর সাথী[১] আর ছিল তাঁর অফুরন্ত প্রাণের বল এবং মনের উন্মাদনা-সঞ্জাত অথচ বিবেক অনুমোদিত ও পরিশ্রুত কার্যক্রম। প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘটনায় নিজে জড়িত না থাকা সত্বেও ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার জন্য ব্যবহারিক জীবনে বহু মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে। আই. সি. এস পরীক্ষা দেবার জন্য পিতা জানকীনাথ বসু তাঁর লণ্ডনে যাবার ব্যবস্থা করে দেন, আই. সি. এস হবার কোন আকাঙ্খা না থাকলেও তিনি যাওয়াই সাব্যস্ত করেন। বাবার প্রস্তাবটি তাঁর পক্ষে শাপে বর হল এই ভেবেই তিনি খুশী মনে মত দেন। বৃটিশকে হটাতে তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু চাইলেই হবে না, শত্রুপক্ষ শক্তিতে অনেক বলবান— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বলে কথা, যে সে কথা নয়, এমন শক্তিশালী জাত যে তাদের রাজত্বে কখনও সূর্য অস্ত যায় না। সুভাষচন্দ্র বাবার প্রপোজাল তাই লুফে নিলেন,[২] ভাবলেন শত্রুপক্ষের শক্তি তাদের

১। স্বাধীনতা আনয়নে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই: 'Take up one idea Make that one idea your life think of it, dream of it, live on that idea Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success.. If we really want to be blessed, and make others blessed, we must go deeper' ('The Complete Works of Swami Vivekananda', Volume I. Page 177 and 'Vivekananda--His call to the Nation', Page 32) —সুভাষচন্দ্রের গুরু-মন্ত্র ছিল।

২। পিতার প্রস্তাবনার সময় সুভাষচন্দ্রের মনের ভাব সঙ্গে সঙ্গে এরূপ হয়েছিল কিনা এর স্বপক্ষে সঠিক কোন দলিল খুঁজে পাইনি। তাঁর সে সময়কার দু'একটি চিঠির টুকরো টুকরো কথায় মনে করার কারণ আছে যে, শত্রুপক্ষের শক্তি যাচাইয়ের আকাঙ্খাটা তাঁর আফটার-থট, বিলেতে আই. সি. এস পরীক্ষা দেবার আগে অথবা পরের মনের অবস্থা। তাহলেও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে একটা জিনিস নিশ্চয়ই মনে আসে—মানুষের সবক্ষণের মনের ভাব ঠিক সময়ে প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না, হলেও তার রেকর্ড থাকে না।

দেশে যাচাই করে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ কোথায় তাদের দুর্বলতা, কতটা তারা বলশালী সেটা যাচাই ভারতবর্ষ থেকে ঠিক হয় না। উদ্দেশ্য একটাই — বৃটিশ বিতাড়ন। এই বৃটিশ-বিতাড়ন আকাঙ্খা তাঁকে এমন পাগল করে তুলেছিল যে শত্রু-মিত্র বাছবিচার না করে সকলের কাছেই গিয়েছেন, যার কাছেই সাহায্যের সামান্যতম আশা করেছেন। এই আকাঙ্খা থেকেই গান্ধী-জহরলালের দিকে হাত বাড়িয়েছেন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন বারে বারেই।

ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্ অর্থাৎ স্বায়ত্ব-শাসনের প্রার্থনা ছিল ব্রিটিশের কাছে গান্ধী-জহরলাল-সর্দার প্যাটেলের কংগ্রেসের, ইংরেজদের আওতায় থেকে ছিটে-ফোঁটা যা পাওয়া যায় সেই রকম আংশিক স্বাধীনতা, জোড়াতালি দেওয়া স্বরাজে বিশ্বাসী ছিলেন গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা। আর সুভাষচন্দ্রের ছিল দাবী এবং তা' পূর্ণ স্বাধীনতার— ব্রিটিশ শাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার। 'আধখানা স্বাধীনতা আমি চাইনে, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। চাই আপোষ হীন সংগ্রাম'— ১৯১৮ সন থেকে এই কথাটি বারে বারে তাঁর মুখ থেকে শোনা গিয়েছে। গান্ধী-সুভাষের মূল বিরোধটা সেইখানেই। সুভাষচন্দ্র বারে বারে আবেদন করেছেন গান্ধীজির কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ধারণা ও কর্ম পদ্ধতি পাল্‌টাবার জন্য কিন্তু অহিংসার পূজারীর মন তাতে ভেজেনি, ভজেনি মন তাঁর অনুগামীদেরও। হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন, আবার ও আশায় বুক বেঁধেছেন, গিয়েছেন পুনর্বিবেচনার প্রার্থনা নিয়ে কিন্তু তা বৃথাই হয়েছে। নীতির দ্বন্দ্ব নীতিবিদদের মধ্যে স্বাভাবিক, কর্মপদ্ধতি কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক এ'নিয়ে বাদানুবাদ এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ত্রিশ দশক এবং চল্লিশ দশকের প্রারম্ভ সময়কার ভারতবর্ষে গান্ধী-কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ঘটেছে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে তাকে নীতির লড়াই আখ্যা কোনমতেই দেওয়া চলে না। জালিয়ান-

ওয়ালাবাগকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাগুলো পর্য্যালোচনা করলে সত্যের পূজারীর অন্তর ও বাহিরের মধ্যে প্রভেদ খুঁজতে সাংঘাতিক কিছু মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথের স্যার উপাধি বর্জন গান্ধী অনুমোদন করেন নি। ১৯১৯ সালের ২রা জুন রবীন্দ্রনাথ উপাধি বর্জন করেন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এর জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অথচ ১৯২০-এ এমন কি ১৯২৫ সনেও গান্ধীজি তাঁকে 'স্যার রবীন্দ্রনাথ' বলে সম্বোধন করেন। বস্তুতঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা যেমন ব্রিটিশের কলঙ্কময় ইতিহাস তেমনি তাকে কেন্দ্র করে গান্ধীর রোল মোটেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করায় না।[৩] রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু এঁরা সকলেই সেদিন গান্ধীজির সমালোচনা করেছিলেন কঠোর ভাষায়। সত্যি কথা বলতে কি গান্ধীজির সে সময়কার হেঁয়ালীপূর্ণ কথাবার্তা ও আচরণ তাঁকে ইতিহাসের পাতায় ব্রিটিশ দরদী ও জনসাধারণ-বিরোধী হিসেবেই এঁকে রেখেছে, একথা বললে বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকারীরা ছিল গান্ধীজির মতে নির্দোষ আর যত অপরাধ এদেশীয় সাধারণ মানুষের। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজিকে অনেক সমালোচনা করেছেন, করে চিঠি লিখেছেন। শান্তিনিকেতন ও বিশ্ব-ভারতীর জন্য প্রথমদিকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ-কে গুজরাট থেকে, তারই ডিভিডেণ্ডের কথা মনে মনে কল্পনা করেই

৩। সেদিনের রাজনীতির ইতিহাস বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যাত্রাপার্টির 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' প্লে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় কংগ্রেসী-দের গোপন সহায়তাই লেফটেন্যান্ট গভর্ণর মাইকেল ও' ডায়ার প্রমুখ বৃটিশদের সাহস যোগায় ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ এ পাঞ্জাবের শতশত নিরস্ত্র তাজা প্রাণ বদ্ধ স্থানে বন্দী করে গুলী করে হত্যা করতে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদিগকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে দেশের লোকের অতবড় ক্ষতি করাকে আর যাই হোক অহিংস কার্যকলাপ বলে মনে করা যায় না।

হয়ত মহাত্মাজি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ন্যায্য চিঠিগুলোর অন্যায্য উত্তর দিয়েছেন বারে বারে যুক্তিতর্কের ধার না ধেরে।

রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধীজির ভাবধারাটা বরাবরই বড় অদ্ভুত ছিল; স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের কাছে তাঁর কথাবার্তা কুহেলিকা পূর্ণ মনে হবার কারণ অনেক সময়েই ঘটেছে। "১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে মৌলানা হসরৎ মোহানীই সর্বপ্রথম 'পূর্ণ স্বাধীনতার (Complete Independence, free from all foreign control) দাবি তোলেন।" এই দাবিই পরে সুভাষচন্দ্রের সমর্থন পায় এবং তিনি এই স্বাধীনতা পাবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে'র দাবিদার (প্রার্থনাকারী বলাই সঙ্গত) "গান্ধীজি স্বয়ং সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করেছিলেন 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাবের। তিনি মৌলানা হসরৎ এর বিরুদ্ধে বলেছিলেন:

'The levity with-which the proposition has been taken by some of you has grieved me It has grieved me because it shows lack of responsibility ... Let us not go into waters whose depths we do not know, and this proposition of Mr. Hasrat Mohani leads you into depths unfathomable."(কি সুন্দর হিসাব করা রাজনীতি, বিন্দুমাত্র কোন ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজদের কাছ থেকে স্বরাজ আনবার অহিংস বাসনা! — গ্রন্থকার) "এর পর বেলগাঁও, কানপুর এবং গৌহাটি কংগ্রেসেও এই দাবি উঠেছিল; গান্ধীজি বারবার তার বিরোধিতা করেছেন। গৌহাটি কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২৬) 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবি উঠলে এবারও গান্ধীজি তার তীব্র বিরোধিতা করে বললেন,

'Year after year, a resolution is moved in the Congress to amend the Congress creed so as to define Swaraj as complete independence, and year

after year, happily, the Congress throws out the resolution by an overwhelming majority. The rejection of the resolution is a proof of the sanity of the Congress" [Mahatma-Vol. II P. 239]।[৪] কংগ্রেসের অর্থাৎ মহাত্মাজীর প্রকৃতিস্থ হবার কারণটা আমাদের বিমর্ষ করে— কংগ্রেস ও তার চালকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আনতে না পারাতে। যাক, গান্ধীজির মানসিক সুস্থতা মহামান্য ইংরেজ সরকারের স্বস্তির কারণ হয়েছে সে সময়, এটা বলাই বাহুল্য।

সুভাষচন্দ্রকে 'ফ্যাসিস্ট' বলেছিলেন কম্যুনিষ্টরা, 'দেশদ্রোহী'কে তাঁরা 'বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা' করবার আকাঙ্খাও প্রকাশ করেছিলেন। পণ্ডিত জহরলাল তাঁকে রুখতে চেয়েছিলেন তরবারি দিয়ে।

রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন, রাজনীতি বোঝেন এরকম মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সেদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সঠিকভাবে জানা থাকলেও, আমাদের মত সাধারণ মানুষের ঐসব ঘটনার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ১৯৪৭ এ 'ভারত স্বাধীন' হবার পরে পূর্ব পাকিস্তানে ঘরবাড়ী জলাঞ্জলি দিয়ে বহু লোক এদেশে এসেছেন তাদের মনে দিনে দিনে কংগ্রেস সম্বন্ধে কিন্তু-ভাব আসতে শুরু করেছিল। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয়ী লোক পশ্চিমবঙ্গে এসে ভীড় করেছে, তার ইম্প্যাক্ট এখানকার লোকের উপর পড়েছে। ফলে তাদেরও অসুবিধা দিনকার দিন বাড়তে থেকেছে। আর কংগ্রেস-নীতি-নেতৃত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে মনে। পশ্চিম পাকিস্তানী সিন্ধীদের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য দিল্লীর কংগ্রেস সরকার যে দরদ দেখিয়েছেন,

---

৪। নেপাল মজুমদার রচিত 'প্রবন্ধ সংকলন, মুজফ্ফর আহ্মদ' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। 'মাসিক বাঙলাদেশ', পৌষ ১৩৮০ সংখ্যা পৃঃ ৬১৪ দ্রষ্টব্য।

৫। বৃটিশের ডিভাইড্ অ্যাণ্ড রুল পলিসির সার্থক রূপায়ণের ফলশ্রুতি— রুধিরাক্ত বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের আত্মাহুতির বিনিময়ে পুরো দেশটার স্বাধীনতা মিলেছিল ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ এ।

পূর্ব-পাকিস্তান হতে আগত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জন্য তার ছিটে-ফোঁটাও দেখা যায়নি। পারিবারিক দুঃখ দুর্দশাজনিত হতাশা বেড়েছে দিনের পর দিন, আত্মবিশ্বাস[৬] কিন্তু আসেনি। তাই দেখা যায়, ১৯৫২-৫৭-৬২ সনে নির্বাচন প্রাক্কালে পোড় খাওয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীরা মনঃস্থির করতে পারেন নি। কংগ্রেসের প্রতি বিতৃষ্ণা দিনের পর দিন বাড়তে থাকলেও 'কংগ্রেস ছাড়া দেশে আর কোন্ পার্টি আছে' আমাদের মত সাধারণ লোকের প্রায় প্রত্যেকেরই এই ধারণা ছিল। যতগুলি কারণ মানুষের মনে উপরোক্ত ধারণা-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল, পশ্চিমবঙ্গের বাতাসে ভেসে থাকা ঐ কুইসলিং কথাটি তার অন্যতম এবং প্রধানতম, একথা বললে কেউ আপত্তি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। ১৯২০ সালে ভারতবর্ষের মাটিতে যে কমিউনিষ্ট পারটির ভিত্তি স্থাপনা হয়েছিল[৭] দীর্ঘ ৪০ বছর পরেও মানুষের

৬। এই লাইনটি লিখতে গিয়ে একটি কথা মনে করে হাসি পাচ্ছে। ১৯৭২ এ নির্বাচন কেরামতি করে এবার সরকার গঠনের পর গত ২০শে মার্চ, ১৯৭৩-এ এক বছর পূর্তির দিনে সরকারের সাফল্যের হিসাব দিয়ে দুই মন্ত্রী মালিকের পত্রিকা 'যুগান্তরে' এক পৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপন দিয়ে সিদ্ধার্থ বাবুরা বোঝাতে চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে নাকি 'হতাশা থেকে আত্মবিশ্বাস' ফিরে এসেছে দিল্লীর সমধর্মী সরকারকে এই প্রদেশে পেয়ে। জাল কংগ্রেসী এম এল. এ মন্ত্রীদের সেই আত্মবিশ্বাসের ফাঁকা কলসটি ১৯৭৩ এর প্রারম্ভেই চৌচির হয়ে ভেঙ্গে পড়তে দেখা যাচ্ছে। শুধু দলাদলি, অন্তর্দলীয় মারামারি-কাটাকাটি আর দুর্নীতির চিত্রগুলো পাত্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ছে।

৭। ওপরে একটু ভুল লেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পারটির ভিত্তি স্থাপনা আসলে হয়েছিল বিদেশের মাটিতে, তাসখন্দে, ঐ ১৯২০ এই, মানবেন্দ্র নাথ রায়ের উদ্যোগে ; পরে, ১৯২৯ এ, যদিও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে এম. এন. রায় কে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। "মানবেন্দ্র নাথ রায়ের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর এই নাম এখন একেবারেই মুছে গেছে, যদিও এই নামেই তিনি শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাঙলা দেশের অনুশীলন পার্টি নামক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন।" মুজফ্ফর আহ্মদ : 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি', পৃঃ ৩৪। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি স্থাপনা হয়েছিল এর এক বছর পরে, ১৯২১ সনে।

মনোযোগ খুব একটা আকর্ষণ করতে পারেনি সে পার্টি— ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কংগ্রেসের প্রবীণতাকেই মানুষ উপরে স্থান দিয়েছিল। অ্যান্টি কংগ্রেস ফিলিং যতই গড়ে উঠুক, চায়ের টেবিলে অতুল্য ঘোষ আর প্রতাপ সিং কায়রণ[৮] সমালোচনা যতই করুন, দিনের শেষে 'হরি তুমি বিনা আর কে বা আছে' বলে কংগ্রেসে আত্মসমর্পণই মানুষকে করতে দেখা গেছে। "এরা (মানে নেতারা, মন্ত্রীরা) ঠিক মত কাজ করতে পারছে না, নচেৎ কংগ্রেসের নীতি তো খারাপ ছিল না।" এরকম হেঁয়ালী মার্কা কথা চালাচালি হামেশাই হত— কংগ্রেসের যে কোন নীতিই ছিল না তা' ঐ গান্ধী-কংগ্রেসই হোক আর জহরলাল প্যাটেল-বিধান রায়-প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেসই হোক, এ ধারণা ১৯১৯ থেকে কংগ্রেসের ইতিহাস যারা পড়েছেন ও সঠিক ভাবে বুঝেছেন এরকম মুষ্টিমেয়[৯] রাজনীতি সচেতন লোকেদের থাকলেও বেশীর ভাগ মানুষেরই ছিল না। তবু সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে কংগ্রেস বিরূপতা দানা বাঁধছিল কিন্তু বিকল্প কোন রাস্তাও চোখের সামনে দেখা যাচ্ছিল না। নির্বাচনের আগে ঐ 'কুইস্লিং' কথাটি ট্রাম-কার্ডের কাজ করতো অনেকের পক্ষে এবং এক তরফের বিপক্ষে। 'কম্যুনিষ্টদের চিনে রাখুন, তারা নেতাজীকে দেশদ্রোহী বলেছিল' একথা পথে প্রান্তরে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারাই শুধু বলেন নি, বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনেদেরও খুব বড় একটা হাতিয়ার হিসাবে

৮। পাঞ্জাবের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী।

৯। রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলা আলাপ আলোচনা করা বাঙালী মধ্যবিত্তদের একটি ফ্যাসান বহু বছরের। যতই বই পড়া থাকুক আর যতই ভিন্ন প্রদেশের লোকের কাছ থেকে পাওয়া সার্টিফিকেট থাকুক, সঠিক রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতনতা অত্যন্ত অল্প লোকেরই আছে, এ কথা বহু দেরীতে হলেও লেখক ইদানিং কালে বুঝেছেন। তাই 'মুষ্টিমেয়' কথাটি যোগ করা হল। রাজনীতির চুটকি গল্প করাটাই রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় নয়।

কাজ দিয়েছে। যেন নেতাজী তাদের কত আপনার লোক ভাবখানা এইরকম আর কি! ঐ কংগ্রেসী নেতারা নেতাজীর বন্ধুর কাজ কখনও করেন নি, ইতিহাস বলছে বছরের পর বছর ধরে তার উল্টোটাই করেছেন। মানুষের কংগ্রেস-বিদ্বেষী মনের স্রোত উল্টোদিকে বইয়ে দেবার চেষ্টায় কংগ্রেসীরা নির্বাচন মঞ্চে যতই 'গান্ধীজি বলেছিলেন' অথবা হিন্দীতে 'গান্ধীজিনে কহাথা' বলে তাঁর নানান বাণীর ফিরিস্তি দিযে থাকুন, ঐ চার অক্ষরের কথাটিই তাদের পক্ষে ও কমিউনিষ্টদের বিপক্ষে মির‍্যাকল্‌এর মত কাজ করতো, বিশ্বের বৃহত্তম অশিক্ষিতের দেশ১০ এই ভারতবর্ষের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে রক্ষক-কংগ্রেসীদের বিশেষ কষ্ট করতে হত না। কম্যুনিষ্টদের বহু মূল্য দিতে হয়েছে তাঁদের ভুলের মাশুল স্বরূপ, শুধু অলক্ষ্যে ঐ ছোট্ট শব্দটির জন্য; কংগ্রেসকে কিন্তু তুলনামূলক ভাবে সেরকম কিছুই মূল্য দিতে হযনি। জহরলালের সুভাষ এলে তাঁকে 'তরবারি দিয়ে রুখব' এই উক্তিটি কেউ কেউ জানলেও সাধারণ লোকের একটা বিরাট অংশেরই এটা জানা ছিলনা নেহরু-সরকারের প্রচার সফলতায়। গান্ধীজির কথাটাকেও এমন কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে তাঁরাই পেরেছেন সব সময়। যে ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সুভাষ-বিরোধিতা করেছিলেন ত্রিরিশের দশকে গান্ধীজির যুক্তিহীন কথাবার্তা-কে সমর্থন করে, নির্বাচন প্রাক্কালে তাঁদের কংগ্রেস ও অতুল্য ঘোষের কংগ্রেস একই প্ল্যাটফরম্‌ এ দাঁড়িয়ে অক্লেশে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গীরন করবার সুযোগ নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের নাম নিয়ে তাঁকে কুইস্‌লিং বলার অপরাধে।

১০। ঘুষ আর ঘুষির জোরে চলা এই ছাতার দেশটার, আবর্জনার স্তূপ আধারটার বাসিন্দাদের শিক্ষার হাল সম্পর্কে সংখ্যাতত্ত্ব দিযে লেখা হয়েছে পরে।

ব্রিটিশ অসহযোগিতা কম্যুনিষ্ট পার্টি বহুদিন থেকেই করেছিল। ১৯২০ এ পার্টি স্থাপনার পর বহু ঘটনা ঘটেছে। গুজরাট সূতাকল ধর্মঘট থেকে আরম্ভ করে বহু আন্দোলনে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯২৮ এর মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত আসামী কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখ নেতার নানাবিধ কার্য ও বিবৃতি তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছে। হিটলারের ২২।৬।৪১ এ রাশিয়া আক্রমণের পরই কমিউনিষ্ট পার্টি সুভাষ-বিরোধী আলোচনা আরম্ভ করেন, আর বৃটিশ সাহায্যে ইচ্ছুক হয়ে পড়েন। বস্তুতঃ ১৫ই ডিসেম্বর দেউলী বন্দীনিবাসে আবদ্ধ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইস্তাহার প্রচার করে তাদের নীতি ঘোষণা করেন। বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়ার আক্রান্তকারী হিটলারকে রোখার জন্যই রাশিয়ার সহযোগী মিত্রশক্তির অংশীদার ব্রিটিশকে সাহায্যের কথা দেশবাসীকে জানান। আর সেই কারণেই হিটলার-সাহায্য গ্রহণকারী জাপানের সহযোগিতা আকাঙ্খী, আজাদ হিন্দ সর্বাধিনায়ক (অবশ্য তখনও তিনি আই. এন. এর সাথে যুক্ত হননি) সুভাষচন্দ্র হলেন 'ফ্যাসিস্ট' এবং ফলে 'কুইস্‌লিং'। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে কম্যুনিষ্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন বিস্ময়করভাবে লক্ষ্যণীয়। কুড়ি বছরের উপর তারা ব্রিটিশ বিরোধিতা করেছেন একটা স্পষ্ট কার্য তালিকা অনুসরণ করে আর বারে বারে সুভাষ-সমর্থন করেছেন অনুরূপ কারণে। কিন্তু ১৯৪১-এ সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সহযোগিতার আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, (ফলে ব্রিটিশের কারাগার থেকে সেদিন অনেক কমিউনিষ্ট নেতাই মুক্তি পেয়েছিলেন জেলের বাইরে থেকে বৃটিশ সহায়তায় কাজ করবার জন্য), রাশিয়ার মিত্রশক্তি তাদেরও মিত্র তাই ভেবে আর 'জাপানকে রুখতে হবে' এই স্লোগানের সাথে সাথে সুভাষ বসুকে বাধা দেবার আকাঙ্খাও প্রকাশ করলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির সেদিনকার স্ট্যাণ্ড নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে, আজও সে বিতর্কের একেবারে অবসান

ঘটেনি, বস্তুতঃ কোনদিনই ঘটবে কিনা সন্দেহ। তাঁদের সেদিনকার ব্যবহার অত্যন্ত কুহেলিকাময় হয়েছিল, তার জন্য তাঁদের মূল্যও দিতে হল অনেক। ১৯৬২ তে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় অল্প আয়াসেই জহরলাল-সরকার ভারতবাসীকে বোঝাতে সফল হয়েছিলেন যে এ দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে চীন সমর্থন যারা করেন, তারা দেশদ্রোহী। ১৯৪১ থেকে ১৯৬১ কুড়ি-একুশ বছরের ব্যবধান কিন্তু 'দেশের শত্রু' কথাটা হারিয়ে যায় নি, তাদের নিজেদের উপরেই ব্যাক করে কথাটা এল। একই দোষে উভয়ে দোষী, কিন্তু বড় আসামী কংগ্রেস তার শাসন ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ফয়দা উঠালো বহুবছর ধরে তাদের ফেভারে।

সুভাষচন্দ্র 'দেশদ্রোহী' নন, দেশপ্রেমিক, এমন দেশপ্রেমিক যা সারা পৃথিবীতে আর কেউ কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ।[১১] দেশের সাধারণ লোক তাঁকে সেইভাবেই বরাবর গ্রহণ করেছেন, তাদের প্রধানমন্ত্রীর কথাটাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। এমন যে দেশপ্রেমিক রাজনীতিক যিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে হেরে গিয়েও বিজয়ী-বীর হয়ে রইলেন দেশের মানুষের মণিকোঠায় এতকাল, যুগ যুগ[১২] ধরে, তাঁর সম্পর্কে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর চার বছর আগের স্পষ্ট স্বীকৃতি প্রমাণ দেয় যে প্রায় ৩০ বছরের আগের ঘটনাকে কমিউনিস্ট পার্টি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তিনি

১১। লেখকের মতে দেশপ্রেমিকের কোন গ্রেডেশন হয় না, যতীন দাস বড় অথবা বিপ্লবী সূর্য সেন, ভকত্ সিং না ক্ষুদিরাম এ প্রশ্নের জবাব নেই। তাই অনেকে ঐ কথাটিতে আপত্তি করলেও করতে পারেন। ভিন দেশের দেশপ্রেমিকদের কটাক্ষ করা ইচ্ছা নয় শুধু সুভাষচন্দ্র কত বড় এটাই বোঝাতে চেয়েছি, সুভাষচন্দ্র একক ও অনন্য এটাই বলতে চেলাম।

১২। আজকের 'যুগ যুগ জিও' শ্লোগানধারীরা না চাইলেও তিনি যুগ যুগ ধরেই জীবন্ত থাকবেন।

২৯-১-৭০ এ নেতাজী প্রদর্শনীতে যা বলেছিলেন তা এইরূপ — 'নেতাজী সম্পর্কে আমরা, কমিউনিষ্টরা অতীতে যে সব কথা বলেছিলাম, তা ভুল। আমরা আজ আমাদের সে ভুল স্বীকার করছি। কারও পদানত হয়ে থাকার জন্য নেতাজী কখনও কারও সাহায্য নেননি। নেতাজী জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন ঠিকই...কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নেতাজীর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষ করে তাঁর মতো সংগ্রামী নেতা কখনও অন্যরকম ভাবতে পারেন না। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে...আছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট দান। নেতাজীর প্রেরণায় পরবর্তীকালে নৌ, পুলিশ ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেতাজীর অস্ত্রের আঘাতের জন্যই ইংরেজকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে।' ৩০-১-৭০ এ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবসু বলেন, "আমাদের পার্টি জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী বলে নিন্দা করে। নেতাজী সম্পর্কে ভুল করে কমিউনিস্টরা এক সময়ে 'কুইস্‌লিং' অপবাদকে সমর্থন করেছিল। নেতাজীর মত দেশপ্রেমিককে কখনই 'কুইস্‌লিং' বলা যায় না।"[১৩]

যুক্তফ্রণ্টের টাল-মাটালের দিনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উপরোক্ত স্বীকৃতিতে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করেছিলেন, আবার মুখের কথা মনেরও কথা ভেবে অনেকে গ্রহণও করেছিলেন। সভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে সি. পি. আই সম্পর্কে কেননা ১৯৪১ এ পার্টি অবিভক্ত ছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে হালের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মাসখানেক আগের (ডিসেম্বর, ১৯৭৩) একটি ভাষণকে মনে করতে হয়। সি. পি. আই অনেক কবছর ধরেই কংগ্রেসকে সহযোগিতা করে আসছিল পরোক্ষে, ইদানীংকালে তারা সরকারও গঠন করেছে তাদের

১৩। 'আমি সুভাষ বলছি' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৪-৬৫

সঙ্গে। [১৪] সি. পি. আই [১৫] ইন্দিরা-কংগ্রেসের সহায়ক হয়েছে সেই বৃহৎ পার্টির মধ্যে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সন্ধানে। প্রধানমন্ত্রী সেই কথাই মনে করে বলেছেন যে, সি. পি. আই কংগ্রেসকে সহযোগিতা করার ফলে দেশ কমিউনিজমের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। "উত্তর প্রদেশের আসন্ন নির্বাচন"এ (২৪-১-৭৪ এ যা সংঘটিক হবে—

১৪। ১৯৪৫-৪৬ এর 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী আজ সোশ্যাল ডেমোক্রাট হয়েছেন, সংশোধনবাদীদের দলে ভিড়েছেন রাশিযার ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ-কোসিগিনের মত, তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও বিদ্যার ঝুলি নিয়ে ; কিন্তু 'স্বাধীনতা'র দৈনন্দিন কাজ দেখাশোনা যিনি করতেন সেই নৃপেন চক্রবর্তী কিন্তু আজও লেনিন প্রদর্শিত পথে কমিউনিষ্ট রযে গিয়েছেন ত্রিপুরা বিধান সভায় সি. পি. এম নেতা হয়ে, সুযোগ-সন্ধানে বে-লাইনে যান নি শাসক পক্ষের উচ্ছিষ্টের লোভে। অতবড উইটি-টকার সোমনাথ লাহিড়ীর নামও নেয় না আজ কেউ, কংগ্রেসী-বাংলা কংগ্রেসী-কংগ্রেসী অজয় মুখার্জীর মত। ১৯৭২ এ নির্বাচন কেরামতি সেরে সিদ্ধার্থ রায়, সরকার গঠনের অব্যবহিত পরে, সর্বপ্রথম কাজটি করেন কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচিত শাসন সংস্থাকে ভেঙ্গে দিযে পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার-অধীনে এনে। কংগ্রেসের অনেক নোংরা কাজের সঙ্গী সি. পি. আই এই অন্যায কাজেরও সহায়ক ছিল, সে দলের অন্যতম নেতা সোমনাথ লাহিড়ী কংগ্রেস-সমর্থন করতে গিযে জোরালো বক্তৃতা দেন, কলকাতার নতুন নামকরণ করেন 'প্রস্রাব নগরী'। সেই বক্তৃতার পরে এতদিন ধরে তাঁর গলার স্বর আর বিশেষ শোনা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসভাকে সরকার নিয়ন্ত্রণে আনবার প্রাকালে সিদ্ধার্থ রায় সোমনাথ লাহিড়ীরা বলেছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে করপোরেশনে নির্বাচন হবে—ছয় মাসের স্থলে তিন গুণীতক ছয় মানে আঠার মাস কেটে গিয়েছে, তাও অনেকদিন হল কিন্তু সোমনাথ লাহিড়ীরা নীরব ; আইন জেনেও সিদ্ধার্থ সরকারের এতবড বে-আইনী কার্যকলাপের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে পান না তাঁরা।

১৫। সর্বঘটের কাঁঠালী কলা—এরা সি.পি. আইও বটে আবার কংগ্রেসের একান্ত দুর্দিনে তাদের রক্ষকও বটে। ঝোলেতে আছেন, অম্বলেতেও

গ্রন্থকার)¸ "কংগ্রেস 'একমন এক প্রাণ' হয়ে লড়ছে না—মাঝে মাঝেই উপদলীয় কলহ কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডকে থামাতে হচ্ছে। ঐ রাজ্যের জনৈক কংগ্রেসী এম পি এ. আই. সি. সির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদব সম্বন্ধে আজমগড়ে পাল্টা কমিটি গঠনের অভিযোগ আনেন, যাদবের মতে অবশ্য ঐ এম. পি মিথ্যাবাদী। এই কলহ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ধামাচাপা পড়লেও দুপক্ষেরই রোষবহ্নির শিখা ধামার নীচের দিকে থেকে দৃশ্যমান। সে যাক যাদের 'কদম বিশ্বাস করা যায় না, সেই নীলবর্ণ শৃগাল, পুচ্ছবিহীন দাঁড়কাক সি.পি.আই[১৬] এর সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে একজন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে ইন্দিরা গান্ধী বলেন 'সি. পি আই এর সঙ্গে জোট গঠনে কংগ্রেসের বরং লাভই হয়েছে, লোকসান হয়নি। কংগ্রেস সি পি. আই জোট গঠনের ফলে কেরালাও পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিজমের বিপদ কমে গেছে।"[১৭] সি. পি. আইকে প্রত্যক্ষে কমপ্লিমেণ্ট দিতে গিয়ে সি. পি. এমই যে সত্যিকারের কমিউনিষ্ট পার্টি এটা তিনি পরোক্ষে স্বীকার করে বসেন। আমরা কমিউনিষ্ট পার্টির অনুপস্থিত নন। আন্দোলন করেন, প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসীদের বিপক্ষে, সমর্থন করেন সেই প্রতিক্রিয়াশীলেরা যাঁদের কল্যাণে দিনে দিনে বেড়েছে কালকেতু-সম (২৫ বছর আগে যারা ভুক ভুক বক্ষে চালে কাঁকর মেশানোয় হাত পাকিয়েছিল তারাই আজ বুক টান করে ওষুধে ভেজাল দেয়— দেশের লোক গুলোকে তিন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে সর্বক্ষণ। তাদেরই বক্ষক-স্তাবক প্রগতিশীল সিদ্ধার্থ রায় মশায়দেক। ধর্মঘট-টর্মঘটও করেন, কালোবাজারী-মজুতদারদের শায়েস্তা করবার জন্য নানান প্রোগ্রামও নেন সরকারপক্ষীয় কংগ্রেসীদের সাথে, তবে বামপন্থীদের সাথে আন্দোলন-পথচলা? নৈব নৈব চ!

১৬। রসিক সমাজের একজন সি. পি. আই এর পুরো নাম দিয়েছেন 'ছিঃ পারভার্টেড ইণ্ডিয়ান।' উচ্চারণ জড়তা না থাকলেও ব্যঙ্গভরে সি. পি. আইকে বলেন ভদ্রলোক : ছি. পি. আই।

১৭। ২৯-১২-৭৩ তারিখের একটি সান্ধ্য দৈনিকের পৃষ্ঠা থেকে।

১৫.(

কুইস্‌লিং অ্যাক্ষেয়ারটা নিয়ে অ্যাসেসমেণ্ট করতে বসেছি, আসল কমিউনিষ্ট পারটির নেতার বক্তব্যটাই তাই তুলে ধরলাম, নকল দলের বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী—ভূপেশ গুপ্ত—সোমনাথ লাহিড়ী—বিশ্বনাথ মুখুজ্যে—ডাঙ্গেবাবুরা ইতিমধ্যে যদি কোথাও কিছু বলে থাকেন সেটা হিসাবে আনছি না কেননা কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি তাদের পার্টি পাচ্ছে না তাদের নিজেদের বন্ধুদের কাছ থেকেই। সে যাক্ জ্যোতি বসু[১৮] তাঁদের ভুল স্বীকার করেছেন, এই স্বীকৃতি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু গান্ধী-জহরলালেব কংগ্রেস? না, তাঁরা তা' করেন নি, বরংচ তাঁকে আরও অনেক বেশী লাঞ্ছিত. অপমানিত করেছেন দেশের মানুষের সমক্ষে, সে কথায় পরে আসবো।

গান্ধীজি-জহরলালজী গত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে সাময়িকভাবে নেই, কম্যুনিষ্ট পার্টি'ও তাদের সেই কথাটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন অনুতপ্ত হয়ে, তাও আজ অনেক দিন হল। কুইস্‌লিং কথাটা এতদিনে আমাদেব ভুলে যাবার কথা তবু আজ ১৯৭৪ এর প্রারম্ভে দেশময় অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির অস্বাভাবিকতার মাঝে দাঁড়িয়ে, নিজেরা বিরাট একটা 'গোলে হরিবোল' অবস্থার মধ্যে পড়ে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে ঐ শব্দটি ভীষণভাবেই মনে আসছে। তাই ওটির সামগ্রিক মূল্যায়নের চেষ্টা করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এটি করতে গেলে গান্ধী—জহরলাল—সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন জনের বিভিন্ন সময়েব উক্তি তাঁদের কেন্দ্র করে, তাঁদের নিজেদের নানা সময়ের উক্তি,

১৮। জ্যোতি বসুই প্রথম ভুল স্বীকাব করেন নি, খবর আছে, পঞ্চাশ-দশকের প্রথমদিকে অজয় ঘোষেব নেতৃত্বে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির দলিলে সুভাষ বসু সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান ধারণার সঠিক রূপায়ণ করা হয় এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিং-এ জনসমক্ষে তাঁবা তাঁদের ভুল স্বীকার করেন। জ্যোতি বসুর স্বীকৃতির ১৮/১৯ বছরের আগের ঘটনা পূর্বতন স্বীকৃতিটি।

কর্মপ্রয়াস ইত্যাদিগুলি চোখের সামনে আনা প্রয়োজন আর সেই সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে যা' জানতে পাওয়া যায় সেগুলোও।

ইংরেজকে বিশ্বাস করতেন না সুভাষচন্দ্র। 'ইংরেজকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। শঠতা, কপটতা, বিশেষ করে কথার খেলাপ করতে পৃথিবীতে কোথাও ওদের জুড়ি নেই'। স্পষ্ট ভাষায় বহুবার তিনি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে একথা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, বলেছেন ভারতের বাইরে যাবার পরও। ১৯৪৩ এর জুনে টোকিও থেকে বেতার-ভাষণের মাধ্যমেও ঐ কথাই দেশবাসী তথা নেতাদের কাছে সাবধান বাণী হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। 'পাখীদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খ্যাঁক-শিয়াল, আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সব চাইতে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর'। এটা যাঁর ইংরেজদের সম্বন্ধে অ্যাসেস্‌মেণ্ট তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না শঠ-কপট ইংরেজদের কাছে কোন অনুরোধ-উপরোধে মন গলাবার চেষ্টার মধ্যে যাওয়া। সুভাষের কথা ছিল সুস্পষ্ট আর হেঁয়ালীতে ভরা কথা ছিল সেদিনকার কংগ্রেসের মুকুটহীন-সম্রাট মহাত্মা গান্ধীর। বহুবার নিজেদের কথার খেলাপ করেছে ইংরেজরা, এ অভিজ্ঞতা গান্ধীজির নিজেরও হয়েছিল। গোল টেবিল বৈঠকের নাম করে বিলাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধু হাতে তাঁকে ফিরিয়েছিল, গান্ধী-আরউইন চুক্তিও তার নিজেরাই ভঙ্গ করেছিল— তবু তিনি ১৯৩২ এ আইন অমান্য আন্দোলন ডেকেও নিজেই তা পরবর্তীকালে নিঃস্বর্ত ভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন দেশবাসীর মতামতের তোয়াক্কা না করেই যা ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে 'এমন সময়েই তিনি পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন যখন জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা চরমে উঠেছিল[১৯]।' (আমি সুভাষ বলছি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২৮)। গান্ধীজি

১৯। 'Gandhi, the politician, hopelessly blundered. He sounded the order of retreat just when the public enthusiam had reached the heating point.'

আন্দোলন প্রত্যাহারের সাথে সাথে বড়লাট লর্ড ওয়েলিংটনের কাছে সত্যাগ্রহকারীদের মুক্তি দেবার জন্য করুণ আবেদন রাখলেন তাতে অবশ্য লাট সাহেবের মন গলেনি, তিনি গান্ধীজির সঙ্গে দেখাই করেন নি। স্বাধীন সত্তা যাদের ছিল তাঁরা গান্ধীজির এই আন্দোলন-আন্দোলন খেলাটাকে কখনই সহজ ভাবে নিতে পারেন নি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৯৩৩এ বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ নারীম্যানের স্পষ্ট উক্তি '...গান্ধীজির এই অসংশোধনীয় মনোভাবের প্রতিকার কি? রাজনীতি আর ধর্মের জগাখিঁচুড়ি,[২০] আর তার ভুল ভ্রান্তির এই ছেদহীন পরিক্রমা-এর হাত থেকে জাতি কবে পরিত্রাণ পাবে? উপায় আছে। গান্ধীজির চারপাশে ঘিরে রয়েছে ঐ যে ভৈরবী চক্র, স্বাধীন সত্ত্বাহীন কতকগুলি কলের পুতুল, গান্ধীজিকে দেখে যারা মাথা নাড়ে, কথা কয়, সায় দেয়, ওদের স্থানে যদি এমন একটি মানুষ পাওয়া যেত, যার ব্যক্তিত্ব আছে, যে সোজা কথা সহজ করে বলতে পারে, আর যার আছে রাজনৈতিক মস্তিস্ক[২১]।' নারী-

---

গান্ধী চরিত্র সম্পর্কে সুন্দরভাবে লিখেছেন সতীশ পাকড়াশি 'গান্ধী জাতীয় জীবনের যাত্রাপথের ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে জাতিকে চালিত করতে চেয়েছিলেন'। পৃঃ ৪৯৭, মাসিক বাঙলাদেশ, নভেম্বর ১৯৭২ সংখ্যা, প্রবন্ধের নাম 'সময়ের গতি প্রবাহে আমরা'। প্রবীণ বিপ্লবী সি.পি.এম নেতা সতীশ পাকড়াশীর 'অগ্নিযুগের কথা' ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসের উপর লেখা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই।

এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রও গান্ধীর সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে বলেন 'To sound the order of retreat, just when public enthusiasm was reaching boiling point, was nothing short of a calamity'.

২০। Gandhiji said 'Religion is my politics' গান্ধীজি বলেছিলেন ধর্মই তাঁর রাজনীতি। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়ানো নির্বুদ্ধিতা।

২১। এই স্পষ্ট উক্তির জন্য নারীম্যানকে বোম্বে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল, ডিক্টেটর গান্ধীর কোপানল থেকে মুক্তি তিনি পাননি।

ম্যানের ঐকান্তিক আগ্রহ বিফলে যায়নি। সেদিনকার ভারতবর্ষ দেখেছিল সেইরকম একটি পুরুষসিংহকে যাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আর ছিল সেই রাজনৈতিক মস্তিষ্ক যা গান্ধীজির জগাখিঁচুড়ি আবোল-তাবোল মতবাদকে ভিটো দেননি। ১৯৩৩ এর মে মাসে সেই পুরুষসিংহ বলেছিলেন 'রাষ্ট্রনেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ।'

১৯৩৯ সনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজির অনুমোদন ছাড়া এবং স্পষ্টতঃ বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হন পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'পট্টভির পরাজয় আমার পরাজয়' বলার সাথে সাথে এক নিঃশ্বাসে 'যাহোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন্' গান্ধীজির এই উক্তিটি বড়ই কৌতুকপ্রদ। বেদনা-দায়ক ও বলা যেতে পারতো, কিন্তু বেদনার সাথে হৃদয়ের যোগ থাকে আর বহু সময়ে বহুজনের সঙ্গে গান্ধীজির ব্যবহার এত অযৌ-ক্তিকতাপূর্ণ বলে মনে হয়েছে যাকে একমাত্র হৃদয়হীনতা ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। ফলে অহিংসার পূজারী ও সত্য-সেবীর বহু ব্যবহারই ঝড় তুলেছিল অনেকের মনে। যেমন তুলেছিল রবীন্দ্রনাথের মনে বিভিন্ন সময়ে বিশেষতঃ ১৯৩৯ এ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সুভাষ অপসারণের সময়। সুভাষ-বহিস্কার গান্ধীজির কোন নীতির পরিচায়ক নয়, বরংচ অহিংসার ঝোলা থেকে হিংসাকেই মুখ বাড়াতে সেদিন দেখা গিয়েছিল

ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশন আজও সমান ভাবেই চলেছে। বর্তমানেও যদি কোনও কংগ্রেসী আজকের হাইকম্যাণ্ডের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র প্রশ্নবোধক কথাবার্তা বলেন, তাকে হয় অপসারিত হতে হয় নচেৎ এমন ব্যবস্থা হয় যাতে ভবিষ্যতে আর তিনি মুখ খুলতে না পাবেন—তারা আজ্ঞা-বাহক মাত্র, আজ্ঞা পালনটাই কাজ, বোঝা অথবা না বোঝাতে কিছু যায় আসে না।

বললেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।[২২] অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে এবং অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে হয় দিল্লী-কংগ্রেসী নেতাদের আন-পার্লামেণ্টারী ব্যবহারে.

২২। সুভাষ-অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু ১০ই মার্চ, ১৯৩৯এ কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সেখানকার সব ঘটনা লক্ষ্য করেন। এ সম্পর্কে তিনি গান্ধীকে ২১ ৩।৩৯ এ লেখেন: "What I saw and heard at Tripuri during the seven days I was there, was an eye-opener to me The exhibition of truth and non-violence that I saw in persons whom the public look upon as your chosen disciples and representatives has, to use your own words 'stunk in my nostrils'. The propaganda that was carried on by them there against the Rasthrapati and those who happen to share his political views was thoroughly mean, malicious and vindictive and utterly devoid of even the semblance of truth and non-violence." (মণি বাগচী—'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র', পৃ: ৭১) ট্রুথ ও নন-ভায়োলেন্স কথা দুটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এদ্বারা গান্ধীকে ডাইরেক্ট হিট করেছিলেন শরৎবাবু সন্দেহ নাই।

এই শরৎ চন্দ্র বসু একদা আদালত প্রাঙ্গণে সর্বসমক্ষে Statesman কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: 'I don't care for the barking of a cur masquerading under a borrowed hide of a British Lion!' ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩১ এ. Chittagong Armoury Raid Case এ অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষে তাঁর দাঁড়াবার পরে।

ঘটনাটা বরং পড়ে শোনাই সমীর ঘোষক প্রকাশিত 'কলিকাতায় ডাকাতি ও অনন্ত সিংহ,' ২য় সংখ্যা পুস্তকটির ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা থেকে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী অনন্ত সিংহ ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত হন ১৯৭০ এর জানুয়ারী মাসে, গ্রেপ্তারের সঙ্গেসঙ্গেই তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার পি কে. সেন প্রেস কনফারেন্সে বলেন—অনন্তসিংহ 'ডাকাত-সর্দার ও গ্যাঙ্গ লীডার'। প্রকাশ থাকে যে আজও তিনি প্রায় বিনা বিচারেই আটক আছেন, গত ক'বছর ধরে বিচারের নাম করে শুধু কালক্ষেপণ করা হচ্ছে মাত্র।সে যাক্, এখন শুনুন।

অত্যন্ত অবহেলার মধ্যে তাঁকে বিদায় নিতে হয়।[২৩] ১৯৩৯এ বাংলার বিখ্যাত বিধান রায়, প্রফুল্ল ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায়, সরোজিনী নাইডুদের সুভাষের প্রতি ব্যবহার মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না। সে যা'হোক, রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব চিঠি গান্ধীজিকে

"অনন্ত সিংহের জীবনের শেষ প্রান্তে, সবার অগোচরে সবার অজানায় একি এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। নেতাজী সুভাষের কারাকক্ষে তিনি আছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের বিচার কক্ষে তাঁর বিচার হবে।… …অনন্ত সিংহ আজ ট্রাইব্যুন্যালের রণপ্রাঙ্গণে যেন জেহাদ ঘোষণা করবেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে যেন সেই দৃঢ়তা ফুটে বেরুচ্ছিল। তাঁরই লেখা 'যুব বিদ্রোহ' দ্বিতীয় খণ্ডে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের দাদা শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার উল্লেখ এখানে করতে ইচ্ছে হচ্ছে: 'এই ভাবে প্রতিদিনই আমরা কিছু না কিছু নূতন বিষয় উপভোগ করতাম। দিন তিনেক পরে শরৎ বাবু আবার বিচার কক্ষে প্রবেশ করছেন। হাতে দেখলাম একটা ইংরেজী দৈনিক কাগজ। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল আজ তিনি যেন সমর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হবেন। ব্যাপার খানা কি তখনও বুঝতে পারিনি। একটু পরেই দেখি প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে দেখাচ্ছেন হাতে Statesman কাগজের সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল যা শরৎ বাবুর পক্ষে মানহানিকর এবং তাঁর মক্কেলের স্বার্থবিরোধী। ষ্টেটসম্যান কটাক্ষ করেছিল—'শরৎ বাবুর তিন মাস Practice ছেড়ে দিয়ে Non-violent movement এ যোগ দেওয়া কি violence-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনন্ত সিংহের defence-এর জন্য ভেস্তে গেল?' সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণের পর তীব্র তিরস্কারের সুরে Statesmanকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—

'I don't care for the barking of a cur masquerading under a borrowed-hide of the British Lion !'

বৃটিশ সিংহের ধার করা চামড়া পরিহিত একটা খেঁকি কুত্তার চেঁচামেচিকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। মুহূর্তে মিঃ ইউনীর লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠলো। কি করবেন, কি বলবেন, তিনি যেন ঠিক করতে পারছিলেন না। একটু থেমে খুব সংযত অথচ ধমকের সুরে শরৎবাবুকে বললেন—'Mr

লেখেন, তার উত্তর দেবার সময় কোন যুক্তিরই ধার ধারেন নি তিনি।' সত্যিকথা বলতে কি গান্ধীজির তখনকার ব্যবহারগুলি মোটেই গণতন্ত্রসম্মত ছিল না, ছিল ডিক্টেটরীসুলভ মনের অভিব্যক্তি। **'Whenever any opposition raised outside the cabinet, he could always coerce the public by threatening to retire from the Congress or to fast unto death', ('The Indian Struggle' by Subhas Chandra Bose)** সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিটি সুন্দরভাবে প্রমাণ করে উপরোক্ত কথাটি। একটু বেগতিক দেখলেই যুক্তিতর্ক ছেড়ে একদম চোখ রাঙ্গানি, হয় কংগ্রেস ছেড়ে যাবার ভয় প্রদর্শন নচেৎ অনশন।

সুভাষচন্দ্র এক অসাধারণ পুরুষ। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আন্তর্জাতিক বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ এবং রাষ্ট্রকর্ণধারদের কাছেও

Bose, please repeat !' অর্থাৎ তিনি বোলতে চাইলেন—যদি সাহস থাকে তবে পুনরাবৃত্তি করুন। মিঃ ইউনী হয়ত ভেবেছিলেন বিচারকের ধমকে কথাগুলি স্বর বদলে শরৎবাবু মোলায়েম করে অন্য কিছু বলে নিজেকে সামলে নেবেন। কিন্তু এ যে বড় শক্ত ঠাঁই। প্রেসিডেণ্ট একটু পরেই বুঝলেন শরৎবাবুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করেছেন।

মিঃ ইউনীর কথামত সমগ্র বিচারকক্ষটি কম্পিত করে আরও তীব্রতর তিরস্কারের স্বর শরৎবাবুর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—'I don't care for the barking of a cur masquerading under a borrowed-hide of a British Lion !'

প্রেসিডেণ্ট তো হতভম্ব। সজোরে ধাক্কা খেয়ে তিনি পিছু সরে গেলেন... ।"

২৩। '—বরাবরই সভাপতিকে বেশ ঘটা করে জাঁক-জমক সহকারে বিদায় দেওয়া হয়। ত্রিপুরীতে তাঁর ব্যতিক্রম দেখা গেল।...বিদায়ের কালে কাছে ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন, দুজন ডাক্তার আর ওয়ার্কিং কমিটির দুজন সদস্য মাত্র।' [কংগ্রেসের ইতিহাস—ডঃ পট্টভি]

বিস্ময়ের কারণ হয়েছে। ১৯৩৯ এর মার্চেই তিনি বুঝেছিলেন বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং সে যুদ্ধে ব্রিটেনের সমূহ বিপদ। তাই তিনি গান্ধী প্রমুখ নেতাদের কাছে আবেদন করেছিলেন ইংরেজ অসহযোগিতার। কিন্তু সে দিনের কংগ্রেস-হাইকম্যাণ্ড তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের জন্য বৃটিশের কছে আবেদন-নিবেদনেই দিন কাটালেন। সুভাষের ভবিষ্যদবাণী ফলে গেল—দ্বিতীয় বিশ্বসমর ছয় মাসের মধ্যেই ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে শুরু হল। ব্রিটেনের দুর্দিনে তাকে আঘাত হানবার সুভাষ প্রস্তাব অহিংসার ধারক ও বাহকের অপছন্দ, অপছন্দ তাঁর তল্পিবাহকদেরও। বিপদের দিনে ব্রিটিশকে আঘাত করার চেয়ে তাদের সুদিনে তাদের সুবুদ্ধির কাছে আবেদনের আকাঙ্খা পোষণ করতেন তিনি এবং তাঁরা।[২৪] পণ্ডিত জহরলাল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল,[২৫] মৌলানা আজাদ, আচার্য

২৪। গান্ধীজির অভিমত: 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশের সঙ্কটকালে তার সঙ্গে সহযোগিতা করাই ভারতের কাম্য। ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আমাদের কাম্য নয়। সে-পথ অহিংসার নয়।" তিনি গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিনলিথগোকে ঐ যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা জানান। "হিটলারের বোমার ঘায়ে ইংরেজের ওয়েস্টমিনিষ্টার এ্যাবে বা পার্লামেণ্ট ভবন ধ্বংস হবে, এ দৃশ্য তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।"

জহরলালের মতও একই: "ব্রিটেন যে সময়ে জীবন মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, সে সময়ে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হলে ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা সম্মান হানিকর কাজ হবে।" (আমি সুভাষ বলছি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৬।)

২৫। ১০৬° ডিগ্রী জ্বরে জ্ঞানহারা সুভাষচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে ইনি বলেছিলেন 'পলিটিক্যাল ফিভার'। ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করবার কৃতিত্বের অধিকারী প্যাটেলজী তাঁর সুভাষ বিরোধিতার যোগ্য পুরস্কার পেয়ে ফার্ষ্ট ডেপুটি

কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ বিধান রায়, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডঃ কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতির মধ্যে কেউই সেদিন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি, সকলেই গান্ধীজির নিগেটিভ ষ্ট্যাণ্ডের দিকেই ঝুঁকেছিলেন—আসলে তাতে যে ঝুঁকি নাই, থাকলেও খুবই কম। একজনকেও তিনি সেদিন পাশে পেলেন না বন্ধু হিসাবে যে তাঁর মন বোঝে, যে তাঁর

প্রাইম মিনিষ্টার অব ট্রান্‌কেটেড ইণ্ডিয়া হয়েছিলেন। এই নেতার কম্‌প্লিমেণ্ট ছিল তার ডিস্‌পোজ্যালে 'আয়রণ ম্যান' মানে 'লৌহমানবের।'

'স্বাধীনতার সন্ধানে কটি চরিত্র' প্রবন্ধে সর্দার প্যাটেল সমেত অনেকের সম্পর্কেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছি, অতএব এখানে আর অগ্রসর হচ্ছি না। তবে ভারতের স্বাধীনতা আনবার গর্ব করে যারা ইদানিং কালে দেওয়াল লিখন লেখেন 'বৃটিশ দস্যুদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করেছি, সি. পি. এম দস্যুদের তাড়িয়ে দেশে শান্তি আনবো,' সে সব কম বয়েসী কংগ্রেসী ছাত্র-পরিষদ যুব কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের জ্ঞাতার্থে তাদের পুরনো পৃথিবী বিখ্যাত কংগ্রেস চালকদের বৃটিশ তাড়ানোর খেলার ইতিহাসটা কিঞ্চিৎ এখানেই শুনিয়ে রাখি। আজও যদি কংগ্রেসী যুবকদের মধ্যে কারও কারও জিজ্ঞাসু মন থাকে তবে তাদের দুয়ে দুয়ে চার এর হিসেব মেলাতে হয়ত সাহায্য করবে সত্য ঘটনার ইতিহাসগুলো।

চার আনার সদস্য না হয়েও কংগ্রেস বলতে সেদিন এক কথায় যাঁকে বোঝাতো সেই হেড অব দি ফ্যামিলি গান্ধীজি সম্পর্কে শুনুন : "At the A.I.C C. meeting on June 14 and 15, 1947, there was strong opposition to the resolution [supporting partition] headed by Purushottam Das Tandon but Gandhiji himself advised the members to accept the decision of the Working Committee though he personally thought no good would come out of it. He asked them to trust their leaders. *The resolution might not have been passed but for Gandhiji's advice.*" (Emphasis added.) [J. B. Kripalani, Gandhi : His Life and Thought. (Government of India, 1970, P. 288) রণজিৎ রায়ের 'The Agony of West Bengal' পৃঃ ১৪৬ থেকে গৃহীত।] নীচে দাগ

কথা শোনে আর তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশত্যাগ করতে হল। গান্ধী-জহরলাল-প্যাটেলরা যখন স্পষ্টতঃই ভুল রাজনীতির পথে অগ্রসর হলেন, তখন তিনি দেশ স্বাধীন করবার অত্যুগ্র আকাঙ্খায় অনন্যোপায় হয়ে বিদেশে বন্ধু অন্বেষণে গেলেন। ১৯৪১ এর ১৭ই জানুয়ারী তিনি ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ করেন ও আফগানিস্থান হয়ে রাশিয়া যান। কারণ তাঁর মতে 'পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যাদের কাছ থেকে ভারত তার স্বাধীনতা

দেওয়া এই লেখকের— নিজে বুঝছেন ভালো হবে না তাও তার সম্পর্কেই ওকালতি করছেন আবার নেতাদের (নিশ্চয়ই নিজেকে ছেড়ে নয়) বিশ্বাসও করতে বলছেন। অদ্ভুত এই জগাখিঁচুড়ি মনোভাবের মালিককে বোঝা বস্তুতঃ শিবেরও অসাধ্য। কথায় আছে মেয়েদের মন দেবাঃ ন জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যাঃ। তা নারীর মনের কথা জানিনা, তবে মিঃ এম. কে. গান্ধীর মত অসাধারণ মনকে আসেস্ করা যে আমাদের মত সাধারণ স্বাভাবিক লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য তা বুঝেছি। অনেক ক'বছর আগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না' নাম দিয়ে কতকগুলি ভৌতিক, আধি-ভৌতিক ঘটনার গল্প লেখা হত। গান্ধীর সম্পর্কে বলতে গেলেও ওটারই অনুকরণ করে বলা যায় 'বুদ্ধিতে যাঁর ব্যাখ্যা মেলে না এমন যে ব্যক্তিত্ব'। সে যাক, শিব ঠাকুরকে ফেল পড়ানো এই ব্যক্তিত্ব যেমন ভালো হবেনা জেনেও পার্টিশন-প্রস্তাবকে সমর্থনের জন্য পীড়াপীড়ি করেন আবার তেমনি বহু ঘটনা ঘটেছে সুভাষচন্দ্রের আমলে যখন ভালো হবে জেনেও তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছেন, নিজেই কোন অসতর্ক মুহূর্তে পরবর্তী সময়ে তা স্বীকার করেছেন। ১৯৪২ এ আগষ্ট আন্দোলন, ডু অর ডাই ফরমূলা, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ; অন্যায় সুভাষ-বিরোধিতা যে পূর্বে সচেতন অবস্থাতেই করেছিলেন এটা বোঝা কষ্টকর কিছু নয়।

দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের-এই চরিত্রের জন্যই তাঁর সত্যি-কার সেবক সুভাষচন্দ্রকে দেশের মাটি ছাড়তে হয়েছিল।

[উল্লেখ্য : 'স্বাধীনতার সন্ধানে কটী চরিত্র' প্রবন্ধটী এই বইয়ে নেওয়া অবশেষে সম্ভব হল না স্থানাভাবে।]

সংগ্রামে উপযুক্ত সহযোগিতা আশা করতে পারে।' রাশিয়ার প্রতি সুভাষচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, দেশে থাকতে প্ল্যানিং কমিশন সোভিয়েট আদর্শেই ফ্রেম করেছিলেন যা পরবর্তীকালে জহরলাল নিজের নামে চালান। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে রাশিয়া ইংরেজ-শত্রু সুভাষ বোসকে প্রত্যক্ষ সাহায্য না করতে পারলেও মস্কো থেকে বিমানপথে বার্লিনে যেতে সাহায্য তাঁরা করেছিলেন, এই পরোক্ষ সাহায্য সুভাষের প্রতি রাশিয়ার আন্তরিকতার পরিচয় দেয়। পরবর্তীকালে জার্মাণী রাশিয়াকে আক্রমণ করলেও রাশিয়ার প্রতি কোন বৈরভাব তাঁর ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি ছিল চীন, বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং আরও কয়েকটি দেশের সম্মিলিত শক্তি আর তাদের বিরুদ্ধে ছিল জার্মাণী, জাপান ও ইতালী— এই ত্রিশক্তিই অক্ষশক্তি (Axis Power) নামে পরিচিত। বৃটিশ উৎখাত মানসে নিরুপায় হয়েই সুভাষচন্দ্রকে জার্মাণী, জাপানের সহায়তা নিতে হয়েছিল। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে তিনি তাদের সাহায্য নেন নি। জার্মাণীর বুকে বসেই, হিটলারের সাহায্য আকাঙ্খী সুভাষচন্দ্র ১৯৪২ সনে বলেছিলেন: 'Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side.' তা সত্ত্বেও হিটলারের সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন। অদ্ভুত এই ব্যক্তিত্বই ১৯৩৪ সনে জার্মাণীতে বসেই বলেছিলেন 'Hitler is at liberty to lick British boots' (হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে)। তার উত্তরে হের-হিটলারকে বেতার বক্তৃতায় ত্রুটি স্বীকার করতে হয় সুভাষচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করবার জন্য।[২৬] জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোও বাধ্য

২৬। "সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালে। সুভাষ তখন মিউনিকে। তখনকার নাৎসী পারটি সিদ্ধান্ত নিল, সুভাষকে তারা পৌর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে।

হয়েছিলেন 'হ্যাটস্‌ অফ' করতে বহুবার। 'I am opposed to Hitlerism whether in India within the Congress or any other country, but it appears to me that socialism is the only alternative to Hitlerism'—এই যাঁর মনোভাব দায়ে পড়ে হিটলার সহায়তা নিলেও তিনি কি ফ্যাসিষ্ট হিটলারের চর হতে পারেন? 'আমার শত্রু ব্রিটিশ, রাশিয়া নয়' এ উক্তিও অনেকদিন আগে বলা ওপরেরটিকে সমর্থন করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়নের কি পরিমাণ আকাঙ্খা ছিল এবং তার জন্য কতদূর পর্যন্ত যেতে আগ্রহী ছিলেন তা ১৯৩৫ সনে জার্মাণীতে তাঁর হোষ্ট চেক মহিলা মিসেস কিট্টি কুর্তীর Subhas as I knew him বই থেকে জানা যায়। সুভাষচন্দ্র নাৎসী-জার্মাণীর মিঃ গোয়েরিংয়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলে তিনি নিজের দেশ উদ্ধারের জন্য শয়তানের প্রতিনিধির সাথে হাত মেলাতে প্রস্তুত কিনা মিসেস কুর্তীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন 'It is dreadful, but it must be done.

গোল বাধল ঠিক আগের দিন। হঠাৎ সেদিন হিটলার এক বেতার-বক্তৃতা দিয়ে বসলেন ব্রিটিশের ভারত শাসনের সুখ্যাতি করে।

বাস্, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান বাতিল। 'Hitler is at liberty to lick British boots (হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে), তার দেওয়া কোন রকম সংবর্ধনা গ্রহণ করতে আমি রাজী নই।'

জবাব শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা ইয়োরোপ। জার্মাণীর ভাগ্য-বিধাতা মহামহিম হিটলার সম্বন্ধে এমন উক্তি করার মতো দুঃসাহস যে পৃথিবীতে কারো থাকতে পারে, সে কথা বুঝি তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আশ্চর্য, দুঃসাহসী এই মানুষটিকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে সেদিন আর একটুও দেরী করেন নি মিঃ অ্যাডলফ্‌ হিটলার। পরদিনই তিনি ভুল স্বীকার করে তাঁর বেতার বক্তৃতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বাধ্য ছেলের মতো।" [আমি সুভাষ বলছি, দ্বিতীয় খণ্ড : পৃষ্ঠা ১০২—১০৩]

It is our only way out. India must gain her independence, cost what it may. Have you an idea, Mrs. Kurti, of the despair, the misery, the humiliation of India? Can you imagine her suffering and indignation? British Imperialism there can be just, as intolerable as your Nazism here, I assure you. But it is perhaps difficult for you to understand it all.' তবু তিনি হিটলারের সাহায্য নিয়েছিলেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে তাই তিনি বেতার বার্তা পাঠিয়ে দেশবাসীকে জানান 'এতকাল আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য-বিষয় শোনানোর কোন সুযোগ ছিল না। শত্রু-পক্ষ যে অপবাদই দিক আমি জানি, আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব, কে কি বলে না-বলে, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। নিজেদের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য আজ ব্রিটিশ যদি রাশিয়া এবং আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায়, তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া অন্যায় ও নয়, অপরাধ ও হতে পারে না। আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকুন।' বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীই ভিন্ রাজ্যের সাহায্য নিয়েছেন নিজের দেশ উদ্ধারে। স্বয়ং লেনিন নিয়েছিলেন জার্মানীর, রাশিয়া জয়ের সময়ে। ডি ভ্যালেরা, ছগল, গ্যারিবল্ডি সকলেই সাহায্য নিয়েছিলেন অপরের। তবে সুভাষ কেন হবেন কুইস্‌লিং? কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি সেদিন তাই বলেছিলেন। সুভাষচন্দ্র এত স্পষ্ট হওয়া সত্বেও তাঁরা তাঁকে বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁরাই সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সেই গোলমেলে অবস্থার মধ্যেও কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচন প্রার্থী মহাত্মা গান্ধীর ক্যাণ্ডিডেট সীতারামিয়াকে অস্বীকার করে সুভাষের পক্ষ

সমর্থন জানিয়েছিলেন কমিউনিষ্ট পারটি। এ সম্পর্কে তাঁদের দলীয় পত্রিকা 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' প্রবন্ধ লেখা হয় মৌলানা আজাদ ও সীতা-রামিয়ার চেয়ে সুভাষচন্দ্রের উপযুক্ততা সম্পর্কে লিখে এবং তাঁকে সমর্থন করে। আরও অনেক সময়ই সুভাষ-সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁরা।

পশ্চিম জার্মাণীর বিখ্যাত লেখক Dr. Voigot তাঁর প্রবন্ধে (The Indian Image of Germany, 1870-1945) ঠিকই লিখেছেন : 'Subhash Chandra Bose made a distinction between the Nazi regime and the German Nation. His joining hands with Hitler was not an impression of his support of the Nazi ideology, as is still believed by some people. Bose was fascinated by the initial military success of Germany, but he was unhappy about Hitler's policy. His dislike of Nazi ideology found vivid impression in a letter which he wrote on German soil in 1936 to Dr. Theirfelder, the founder of the German Academy for Foreign Relations at Stuttgart···Bose distinguished between the moral and mechanical or strategic features of Nazi policy. From the point of strategy he was full of admiration, from the moral point of view full of contempt·· The nobler cause which Bose had in mind was, of course, the achievement of Indian Independence. With this end in view only did he overcome his inhibitions to Nazi ideology and threw in his lot with Hitler.'

একজন বিদেশীর চোখে কত শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছেন—নাৎসীদের সঙ্গে মানসিক দিক দিয়ে কোন মিল না থাকা সত্বেও তিনি যে নিতান্তই নিরূপায় হয়েই হিটলারের সাহায্য নিয়েছিলেন Dr. Voigot একথা বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু দেশের লোকের বড় একটা অংশের কাছ থেকে তাকে কিন্তু দুর্নামই কিনতে হলো।

পূর্ব জার্মাণীর ভারত-তত্ত্ববিদ Dr. Weidemann কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন: 'In his meeting with Ribbentrop at Vienna on April 29, 1941, Bose emphatically declared that the Indian people had no sympathy for Fascism'.

মিসেস কুর্তী জিনিসটি স্পষ্টতর করে বলেন: 'If there were opposites, complete opposites surely they were Bose and Goering.' তবু সুভাষচন্দ্র গোয়েরিং-দর্শনে গিয়েছিলেন নিজের দেশোদ্ধার মানসে।

বৃটিশের কাছে পূর্ণ স্বরাজের দাবী করার প্রস্তাব গান্ধী-কংগ্রেস কর্তৃক বারে বারে প্রত্যাখ্যাত হয়। গান্ধীজিরা এই অসীম শক্তিশালী ও যুক্তিবাদী লোকটিকে বস্তুত: ভয়ের চোখে দেখতে সুরু করেন তাই ছলে বলে কৌশলে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করেন। সন্দেহ নাই সুভাষ চন্দ্র পদত্যাগ করেছিলেন, বাট হি ওয়াজ ফোর্সড টু রিজাইন অর্থাৎ রিজাইন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।[২৭] দারোয়ানের গলাধাক্কা খাওয়া

২৭। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার ক্ষমতা একমাত্র সভাপতির। কিন্তু ১৯৩৯ এর সভাপতির উপর সর্ত আরোপিত হল গান্ধীজির মনোমত সদস্য নির্বচন করে কমিটী গঠন করতে হবে। স্বাধীনচেতা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এই সর্ত মানা সম্ভব ছিল না। তবু তিনি চেয়েছিলেন গান্ধীজি কংগ্রেস অধিবেশনে এসে তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতে। ২৭শে এপ্রিল গান্ধীজি কলিকাতার সন্নিকটস্থ সোদপুর আশ্রমে হাজির

পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না কোন আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোক কোন অভদ্র, আনুকালচারড লোকের প্রাসাদে। গান্ধী-জহরলালের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে কংগ্রেস তিনি ছাড়লেন। দেশের নেতাদের যখন কিছুতেই টলাতে পারলেন না তাঁদের নিস্ক্রিয় মনোভাব থেকে দূরে সরিয়ে আনতে তখনই তাঁকে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ শুধু কংগ্রেস থেকেই তাঁকে বহিস্কার করেন নি, দেশ থেকেও বহিস্কার

হলেন। অথচ ২৮শে এপ্রিল ওয়েলিংটন স্কয়ারের অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেন না। দেশের অতবড় সংকটের সময়, কংগ্রেসের অতবড় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন বিশ্বনামী দেশপ্রেমিক। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দ্বিতীয় কোন রাস্তা ছিলনা—২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন তার বয়ান ছিল এইরূপ 'ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাব মতো গান্ধীজিকে দায়িত্ব গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করার জন্য বারবার আমি অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু অতীতের বহু নিষ্ফল আবেদনের মতো আমার সেই আবেদন ব্যর্থ হয়েছে ... গান্ধীজির উপদেশ মতো আমি যদি নিজের মনোমত কমিটী গঠন করতাম তা না হত তাঁর মনোমত না হত তাঁর আস্থাভাজন তাছাড়া আমার নিজের বিশ্বাসের প্রশ্নও এখানে জড়িত রয়েছে। তাই অনেক চিন্তা করে একান্ত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগ পত্র আপনাদের কাছে উপস্থিত করলাম।'

এ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র পরবর্তী কালে তাঁর 'মুক্তি সংগ্রাম'এ লেখেন: 'গান্ধীবাদী দলের মনোভাব থেকে বোঝা গেল যে আমার নির্দেশ তারা মেনে চলবে না, কংগ্রেসের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেও আমাকে দেবে না। আমি যদি নামে মাত্র সভাপতি থাকতে রাজি হই, একমাত্র তাহলেই তারা আমাকে বরদাস্ত করবে। ফলতঃ সভাপতি পদে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলনা।'

তাঁর পদত্যাগের পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত—৩রা মে, ১৯৩৯এ তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সৃষ্টি করেন যা "কংগ্রেসেরই" একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসবে কাজ করবে বলে ঘোষণা করেন। এর কিছুদিন পরে ১৪ই আগস্ট ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত

করেছিলেন গান্ধীজি, একথা বললে বিন্দুমাত্র সত্যের অপলাপ হয় না। অহিংসার পূজারীর অহিংস (! ?) মনোভাবের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

লোকে বলে ভারতসরকার মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক, তারা মার্কিণ-তোষক। সুভাষের দেশত্যাগের এক বছর পরে ২২শে মার্চ, ১৯৪২, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ আসেন এদেশে কংগ্রেসী নেতাদের কাছে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের দূত হয়ে। সমাজতন্ত্রের বড় বড় বুলি কপচাতে পারতেন ভদ্রলোক,[২৮] তাই লোকে এই স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে রসিকতা করে বলত 'বিলাতী জহরলাল।' মানুষে জানতো **Jawaharlal was 'more English than Indian in his thoughts and make up.,'** জানতো একথাও যে **He was 'often more at home with Englishmen than with his countrymen.'** এই সময়ে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চার্চিলকে যে অভিনব প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা এইরূপ: **'There is only one possible chance to make up a little of the lost time to spike the guns of Bose[২৯] opposition. Nehru must be asked to become Prime Minister and Minister for Defence.'** লোকে ঠিকই বলে, সন্দেহ কিবা তায়! ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ চেয়ে চিন্তে যে

বৈঠকে সুভাষচন্দ্রকে নি. ভা. রা. স থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস "গুরুতর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।"

২৮। কে জানে, এই 'বৃটিশ ব্যারিষ্টার বিদগ্ধ পণ্ডিতই আমাদের ব্যারিষ্টার 'পণ্ডিতজী'র 'সমাজতন্ত্র ধাঁচ'-এর চিন্তাধারার সৃষ্টিকর্তা কি না!

২৯। সুভাষ বোস অ্যাণ্ড সুভাষ বোস। বোসভীতির বিভীষিকায় পেয়ে বসেছিল সেদিনকার আমেরিকা ও বৃটিশ দুই দেশের সরকারকেই।

মাউণ্টব্যাটেনী স্বাধীনতা পেয়েছে (যার প্রথম গভর্ণর জেনারেল হলেন গান্ধীজির বৈবাহিক রাজাগোপালাচারী, সম্ভবতঃ জিন্না সাহেবের মুস্‌লিম লীগের দেশবিভাগের প্রপোজালের প্রথম কংগ্রেস-সমর্থক[৩০] হওয়ার পুরস্কার স্বরূপই ইংরেজ ইনামটা মিলেছিল, মাদ্রাজের কোন কারণেই পাকিস্তানে যাবার সম্ভাবনা না থাকায় বেমালুম জিন্নার সমর্থক হয়ে যান ভদ্রলোক। সম্ভবতঃ ব্রিটিশের কাছে more homely জহর-লাল নেহরুর রেকমেণ্ডেশনেই ইনামটা মিলেছিল চক্রবর্তী আচারীজির অথবা ব্রিটিশ নিজেরাই লোক ঠিক চিনেছিল যেমন তারা বুঝেছিল জহরলালের প্রকৃতিকে ও) তার নেপথ্য গোড়াপত্তন অনেক আগে দ্বিতীয় মহাসমরে বিব্রত আমেরিকা-বৃটেন করে রেখেছিল। তারই ফলশ্রুতি, একাধারে কংগ্রেসের স্বরাজলাভের সাফল্য আর নেহরুজীর দেড় যুগ ধরে দেশের উপব খবরদারি করার সুযোগ। বিনা রক্তপাতে শান্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, তাই শান্তির নোবেল পুরস্কার লাভের আকাঙ্খাটি আর জীবনভোর ছাড়তে পারলেন না ভদ্রলোক। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ চালনা করেছিলেন, তাঁর

৩০। ভারত-বিভাগের স্বপক্ষে যে প্রস্তাব মিঃ সি. রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধান সভায় পাশ করিয়ে নেন তা' নিম্নরূপ :...'this party is of opinion and recommends to the All-India Congress Committee that to sacrifice the chances of formation of a national Government at this grave crisis for the doubtful advantage of maintaining a controversy over the unity of India is a most unwise policy and it has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation...' [হে অতীত কথা কও : সত্যানন্দ স্বামী পৃঃ ৪২২—]। Lesser evil কথাটা ভারতবাসীরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা, যেন ভালভাবে লক্ষ্য করেন, তাই দাগ দিলাম। ঐ অপরিণামদর্শী, স্বনামধন্য রাজনীতিক এবং রাজনীতিকদের দ্বারা 'দেশের আরো বেশী ক্ষতি' হওয়াও তাহলে সম্ভব ছিল ?

সাময়িক সাহায্যকারী অক্ষশক্তি, যুদ্ধে জেতে নি-হেরেছিল, জয় তো মিত্রশক্তিরই হয়েছিল তবু বিজয়ী বৃটিশকে এদেশ থেকে যে অত তাড়া-তাড়ি পাততাড়ি গোটাতে হল, তার পেছনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কের অবদান যে অনেক অনেক বেশী গান্ধী-কংগ্রেসের নেতা উপনেতাদের চেয়ে এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? অথচ রাসবিহারী বোস টোকিও রেডিয়ো থেকে, সুভাষ বোস বার্লিন রেডিয়ো থেকে ক্রীপস্ মিশন প্রত্যাখ্যানের জন্য গান্ধী, জহরলাল, রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখদের কাছে বারে বারে আবেদন করেছিলেন। সে আবেদন অনড়-অটলদের[৩১] মন স্পর্শ করেনি, করলে ভারতের এই স্যাঁতসেতে স্বাধীনতা আসতো না, অর্জিত

৩১। ভূগোল বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীটা নাকি নড়ে, সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। বহু প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পরেই ছেলেমানুষী মন নিজস্ব ভঙ্গীতে যাচাই করতে গিয়েছে কথাটা, কিন্তু না, নিজের বাসস্থানকে এক ইঞ্চি নড়তেও দেখিনি, সরেছেও শুনিনি। রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, অফিস-কাচারী যেখানেই গিয়েছি একই জিনিস লক্ষ্যে এসেছে— নট্ নড়ন-চড়ন, নড়েওনি সরেওনি। মনে হয়েছে পৃথিবীটা নড়ে না, নড়ে নিশ্চয়ই সূর্য— পূবের সূর্য পশ্চিমে স্থান পরিবর্তন করে নিজের জাগ্রত চোখের ওপরে দিনমানেই। ভূগোল পড়বো অথচ ভূগোল-গ্রন্থকারকে অবিশ্বাস করবো তাতো হয়না, অতএব নিজের চোখে দেখা জিনিসকেও সন্দেহ কর্তেই হয়েছে। (ইদানীং কালে যাঁরা, যে কোন জিনিস সম্বন্ধেই বলতে গেলে, টেবিল থাবড়িয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন 'নিজের চোখে দেখেছি, বিশ্বাস করবো না মশায়, কি বলছেন' তাঁরা যেন দয়া করে কথাটা লক্ষ্য করেন। চোখের দেখা অনেক জিনিসই সঠিক কথা অনেক সময়ই বলে না, গভীরে অন্য কথা থাকে—যুক্তি এবং জ্ঞানসে জিনিসকে ধরিয়ে দেয়।) তাহলে একটা নিষ্প্রাণ জিনিষ পৃথিবী (উদ্ভিদ, গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ ভূপৃষ্ঠে জন্মালেও প্রাণযুক্ত একে বলা যাচ্ছে না) তাও নড়ে, কিন্তু আশ্চর্য ওঁরা প্রাণবন্ত মানুষ হয়েও অনড়, অটল চিরকালই থাকলেন। ওঁদের বর্ত্তমান বংশধরদেরও একই অবস্থা।

হত পূর্ণ স্বাধীনতা আর তা ঐ জিন্নার পাকিস্তান-স্বপ্নকে বিফল করেই।

প্রসঙ্গতঃ, 'ক্রীপস্‌ মিশন' খ্যাত বৃটিশমন্ত্রী স্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ এদেশে এসে তাঁর মিশনের বাণী শোনাতে বিভিন্ন পার্টিকে ডাকেন একমাত্র সুভাষচন্দ্রের পার্টি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' ছাড়া, তাঁর মতে 'Owing to the fact the President of your organisation has been actively co-operating with enemy powers.'। তা' ক্রীপস্ সাহেবদের সমর্থকের কোন অভাব ছিল না[৩২]—সেদিনের

৩২। আজ যেমন কংগ্রেস সরকারের সর্বপ্রকার অপকর্মের সমর্থকদের অভাব নেই—আনন্দবাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী প্রমুখ পত্রিকাগুলি এর প্রমাণ। ষ্টেটস্‌ম্যানের সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানভাবেই চলেছে, শাসকবর্গের বর্ণই শুধু পালটেছে, মানসিক চেহারা তো একই আছে বরংচ আরো অনেক নিম্নস্তরের হয়েছে – বর্ণবৈষম্য ব্রিটিশ আর ইণ্ডিয়ান রুলার কারোরই কোন মানসিক বৈষম্য আনে নি। মজা কি বাত, বাঙ্গালীরা তাদের বৈঠকখানায়, খাওয়ার টেবিলে, চেম্বারে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কংগ্রেস সরকারের যে সমালোচনা অহোরহঃ করতে থাকেন তা কিন্তু ঐ আনন্দবাজার, যুগান্তর, ষ্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকা থেকে আহরিত উল্‌টো পাল্‌টা জ্ঞানকে সম্বল করেই। এরা কখনও সঠিক জ্ঞান মানুষকে দেয় না, জ্ঞানের বিভ্রান্তি যাতে হয় সেইরূপভাবেই খবরাখবর পরিবেশন করে—উদ্দেশ্য মানুষকে দিশাহারা করে রাখা, বিভ্রান্ত মানুষ কখনও সত্যিকার পথ খুঁজে পাবে না। মানুন চাই না মানুন, ঘটনাটা একদম তাই। বরুণ সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্ল রতন গাঙ্গুলীরা প্রতিদিনই সাধারণ পাঠকদের মনকে স্লো-পয়জন করে চলেছেন।

অসৎ লোকের সাথে সাথে বহু সৎ লোকও এদের পাঠক। চারদিকের আগুনে আজ পিঠ সকলেরই পুড়ছে, অনেকেই ইতিমধ্যে সম্বিত ফিরে পাচ্ছেন। একথা আশা করা অতএব অন্যায় নয় যে সৎ পাঠকেরাই একদিন ঐ সব কালো-ধারণা-সৃষ্টিকারী মিডিয়ামগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবেন।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাতেও একই কথা, তবে সুরটা আর একটু চড়া এই যা, রাজা যত না বলে পারিষদ বলে তার চেয়ে বেশী। স্টেটস্‌ম্যান ১৯৪২ এর মার্চে লিখেছিল: 'Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced pro-fascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.' (সুভাষ বোস দেশে তখন নেই, তাই was হয়েছে নচেৎ is লিখতো তারা—লেখক)। 'It is the business of the Government to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them... The penalty for traitors to India must be death.'[৩৩]

স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির অবদান যা, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রচার এবং উল্টো প্রচার তাঁকে 'মহাত্মা' করে রাখলো দেশবাসীর কাছে চিরকাল। একমাত্র কংগ্রেসই দেশে স্বাধীনতা এনেছে এবং তাঁর মূলে গান্ধীজী এই প্রচারটি উৎকটভাবে দেখা দেয় ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট মধ্যরাত্রের স্বাধীনতা-উৎসবে যখন বড় বড় নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লিস্টে নেতাজীর নামও উচ্চারণ করেন নি।[৩৪]

যাক, সে দুঃখের কথা আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে স্থানান্তরে। আসুন, এখন আমরা গান্ধী-জহরলাল-সুভাষ চরিত্রের সাথে আরও একটু গভীরে পরিচিত হবার চেষ্টা করি।

৩৩। কথাটা সত্যিই তাই, 'ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি।'—সত্যিকারের ট্রেটারদের চেহারাটা ঠিকমত জানাই হচ্ছে আসল কথা।

৩৪। প্রথমচোটে অবিশ্বাস্য হলেও ওটি কিন্তু ঘটনা। 'সুভাষচন্দ্রের সীমাহীন অবমাননা' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

১৯৪২এ নেহরুজী ক্রীপস্ সাহেব মারফৎ ব্রিটিশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: 'The Japanese must be resisted. We are not going to surrender to the invader.' 'Inspite of all that has happened, we are not going to embarass the British war effort in India'[৩৫] শুধু এই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে 'more British than Indian' বলা হয়নি, আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। মাউন্টব্যাটেন-জহরলাল হৃদ্যতা তো জগদ্বিখ্যাত। সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতটে[৩৬] আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শহীদ মিনার লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আদেশে ব্রিটিশ বাহিনী ধ্বংস করেছিল ১৯৪৫ এর সেপ্টেম্বরে, সে ধ্বংসস্তূপ ১৯৪৯ এ জহরলাল দেখেছিলেন ধ্বংসস্তূপ সৃষ্টি করার মেন আর্কিটেক্ট মাউন্টব্যাটেন সাহেবের সঙ্গেই কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাহস হয়নি সম্ভবতঃ বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মনে জাগে নি শহীদ মিনারটি পুনর্নির্মাণের, আর যা হোক ব্রিটিশ ফ্রেণ্ডটির অসন্তুষ্টির কারণ তো

৩৫। 'জহরলাল জাপানকে রুখতে চান, ভাল কথা। কিন্তু একটা প্রশ্ন-ভারতকে কে পদানত করে রেখেছে একশ পঁচাশি বছর ধরে? জাপান না ইংরেজ? তাহলে রাতারাতি সে কথা ভুলে গিয়ে সেই ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে কি করে? কোন্ যুক্তিতে?' বিলেতী ভাবধারায় মানুষ জহরলালের মতে 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নয়! সাম্রাজ্যবাদী হল এশিয়ার একমাত্র বিদেশী কবলমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র জাপান! যে করে হোক তাকে রুখতেই হবে,' (পৃঃ ২৭৪, দ্বিতীয় খণ্ড, আমি সুভাষ বলছি) বৃটিশকে ঘাড়ের উপর জিইয়ে রেখে, গর্দান-রক্ত পানের সুবিধে থেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত না করে!

৩৬। সিঙ্গাপুরকে নেতাজী আখ্যা দিয়েছিলেন: grave yard of the British Empire. ১৯৪৯ এ ব্রিটিশ-গ্রেভ ইয়ার্ডটার উপরে দাঁড়িয়ে ইংরেজ-মাউন্টব্যাটেন আর ইংরেজ-সুহৃদ জহরলাল দুজনেরই হয়ত মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নেতাজীর ভাষ্য স্মরণে এনে।

হতে পারেন না! প্রসঙ্গতঃ নেতাজী স্বয়ং এই শহীদ-মিনারের ভিত্তিস্থাপনা করেন পঁয়তাল্লিশ সালের ৮ই জুলাই।

জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস ঘটনা ঘটাবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করে নিন্দাবাদ করে মত প্রকাশ করা এবং ডেপুটেশন পাঠানোয় আগ্রহী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরু, কিন্তু তাতে আপত্তি ছিল মহাত্মার। **'I am totally against a spectacular display in the shape of sending a big deputation, it can only irritate the authorities'**[৩৭] দীর্ঘ ২৭ বছর পরে একই গান্ধী লিখেছেন: **"...insulting and injuring the Europeans is not non-violence of the Congres type...'** [মর্মার্থ: 'ইউরোপীয়ানদের অপমান করা বা আহত করা কংগ্রেস টাইপের অহিংসা নয়।' গান্ধীজি লিখিত প্রবন্ধ 'মিউটিনি ইন দি নেভী' হরিজন, ৩রা মার্চ, ১৯৪৬" সৈয়দ শাহেদুল্লাহ: 'লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ' নামক পুস্তক মারফৎ প্রাপ্ত।] গান্ধীজির অথবা তাঁর কংগ্রেসের 'অহিংসা'র টাইপের কথা থাক,

৩৭। 'আমি একটা হৈচৈ করা ডেপুটেশন চাইনা।—এতে কর্তৃপক্ষের বিরক্তি উৎপাদন করবে।' অবাক ভারতবর্ষ! সেলাম, তোমায় সেলাম! ইংরেজকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিব্রত করতে চান না, সেই বৃটিশ-বন্ধু নেহেরু-করমর্চাদেরা হন ভারতের দেশপ্রেমিক আর বৃটিশের বিপক্ষে যিনি যান সেই সুভাষচন্দ্র হন দেশের শত্রু! এবং মহামান্য সরকার বাহাদুরের পোষ্য পত্রিকা (এখনও) ষ্টেটসম্যান এই সুভাষচন্দ্রকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে **traitor to India.**

জ্ঞানী বাঙ্গালীরা আজও নিজেরা ইংরেজী শেখেন ষ্টেটসম্যান পড়ে, ছেলে-মেয়ের ষ্টক অব ওয়ার্ডস বাড়ান তারই সাহায্যে। ধিক্ সেই বিকৃত ইংরেজী-বাহককে যা মানুষের মনকে অসুস্থ অস্বাভাবিক করে তোলে, ধিক্ সেই ভ্যাসিলেটিং থটস্ সৃষ্টিকারী ইংরেজী মিডিয়ামকে যা ইংলিশ লিটারেচার শিখতে সাহায্য করলেও জীবনের জয়গান গাইবার মানসিক শক্তি না জুগিয়ে মানুষকে তিলে তিলে আত্মহত্যার হতাশার মন্ত্র শেখায়!

বহু বছর ধরে আমরা ঐ সংস্কার সহিংস রাজনীতির সাথে পরিচিত হয়েছি, অহিংসার নামাবলী গা থেকে অবশ্য কখনও এঁরা নামান না- তাহোক, আমরা বৃটিশ-অনুগতের আনুগত্যের ডিগ্রীটারই শুধু যাচাই করবো। চিরকাল শুনে এসেছি 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ মনের ভাব রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র কার কাছ হতে না শুনেছি? শুধু মুখের কথা নয়, ওঁদের প্রত্যেকের জীবন থেকে আমরা জেনেছি তাঁরা কি পর্যন্ত মানুষকে ভালবাসতেন। অথচ অহিংসার প্রচারী গান্ধীজি? শত শত লোককে অত্যন্ত নির্মমভাবে ব্রিটিশ মারলো কিন্তু তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ইংরেজের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হতে চান না, সেই একই হিসেব করা রাজনীতি। দেশের মানুষের রক্তের চেয়েও বিদেশীরাই তাঁর কাছে অধিকতর মূল্যবান, তাই বৃটিশের অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলে তাদের ইনসালট (অপমান) করতে চান না, ইউরোপীয়ান-দের কোনদিক থেকে কোন আঘাত দেওয়ার কথা বললে রীতিমত বিরক্ত তিনি। সবার উপরে ব্রিটিশ সত্য তাহার উপরে নাই— এটি একমাত্র সত্য আর সবটাই অলীক, মায়া। দেশের 'মানুষ কেমন করে সত্য' হতে পাবে তাঁর কাছে?

সুভাষচন্দ্র ক্ষোভে দুঃখে গান্ধীজি সম্পর্কে বলেছিলেন: 'The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man' তাই তিনি কংগ্রেসে তিষ্ঠোতে পারেন নি। জোর জবরদস্তি করে গান্ধীজি সুভাষকে বিতাড়ন করলেন কংগ্রেস থেকে, আবার নিজেই লিখেছেন ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০এ দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে 'I feel that Subhas is behaving like a spoilt child'[৩৮]

৩৮। 'Spoilt child' এর বাংলা অর্থ 'নষ্ট ছেলে'ও হয়—তা সুভাষচন্দ্র তাঁর মতে 'নষ্ট ছেলের মতই আচরণ' করছিলেন! E to E ডিকশনারীতে Spoilt কথাটার মানে লিখছে Corrupted—এতটা কি বলতে চেয়েছিলেন

অর্থাৎ 'বখাটে ছেলের মত আচরণ করছে সুভাষ'। এই বখাটে ছেলেই কিন্তু ৬ই জুলাই, ১৯৪৪ রেঙ্গুন[৩৯] বেতার কেন্দ্র থেকে গান্ধীজিকে 'Father of our Nation' (জাতির পিতা) বলে সম্বোধন করে সম্মানিত করেন। দুটো চরিত্রে কি অদ্ভুত পার্থক্য! অথচ একজন নাম কিনলেন অহিংসপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে আর একজন কুইস্‌লিং! অসহযোগ আন্দোলনের স্রষ্টাকে সব সময়ই দেখা গিয়েছে দেশের লোকের সাথে অসহযোগিতা করতে,[৪০] কিন্তু ব্রিটিশের সঙ্গে অসহযোগিতা? না, তাও তিনি করেছেন— আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, দেশের লোক যখন এগোতে সুরু করেছে তাঁর কথায়, বিনা নোটিশে অন্যের অজ্ঞাতেই পিছু হটেছেন বহুবার।[৪১]

গান্ধীজি, বোধ হয় না, তবে হ্যাঁও হতে পারে, কি বা অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে— সিস্টার নিবেদিতা, রামমোহন, লেনিন কাকেই বা উনি ছেড়েছেন? তবু বলবো অভিধানগত ঐ ইংরেজী মানেটা মনে হলেই লজ্জা পাই, যদিও গান্ধীজি অক্লেশে এরকম একটা কথা ছেড়েছিলেন আমার নেতাজী সম্পর্কে; তাই Spoilt child এর বাংলা মানে 'বখাটে ছেলে' নিয়েই নাড়াচাড়া করবো এর পরে, বখাটে কথাটা অনেক বেশী সহনীয় কল্লাপেটডের চেয়ে।

৩৯। এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে—কেউ কেউ বলেন ২রা অক্টোবর, ১৯৪৩ গান্ধী জয়ন্তীর দিনে নেতাজী প্রথম 'জাতির পিতা' আখ্যা দেন।

৪০। গান্ধীজীর 'অসহযোগ আন্দোলন' এর সঠিকরূপ ধরা পড়ে বিদেশী লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডস্‌ এর 'The Last Years of British India' বইয়ে যেখানে তিনি লেখেন: 'Gandhi now turned the technique of Non-Co-operation, not against the British, but against Congress's own President. Bose was forced to resign.'

প্রাণভরা নাম ছিল ঐ অসহযোগ আন্দোলনের—'Non-Co-operation and Civil Disobedience Movements.'

৪১। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায়: 'The Mahatma opens compaign in brilliant fashion, he works it up with unerring

ফলে আন্দোলন মধ্যপথে ভীষণভাবে মার খেয়েছে, ফল বিষময় হয়েছে।
'কুইট্‌ ইণ্ডিয়া' ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন যা নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর দেশে বিদেশে এত নাম, খদ্দরধারী কংগ্রেসসেবীরা যা নিয়ে এত্তো এত্তো বক্তৃতা দিয়ে আসছেন বহুবছর ধরে, আহা, সে তো একটি উপাখ্যান, মজার উপাখ্যান! তবে শুনুন সে ঘটনা। সুভাষ বসু ১৯৩৮ সনে জলপাইগুড়িতে বি. পি. সি. সির মিটিং এ সর্বপ্রথম প্রস্তাব আনেন—ইংরেজ ভারত ছাড়! পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসেও সভাপতির মুখ থেকে একই কথা শোনা যায়। কিন্তু তাঁতে আপত্তি ছিল গান্ধী-কংগ্রেসের, এমন আপত্তি যে সভাপতিকে বিদায়ই নিতে হল।[৪০] অথচ সুভাষের প্রস্থানের পর ১৯৪২এ সেই স্লোগানই নিল কংগ্রেস আর ফলে নাম পেলেন মহাত্মা গান্ধী।[৪১] তা' নাম

skill, he moves from success to success till reaches the zenith of his compaign, but after that he loses his nerve and begins to falter'.

মর্মার্থ: "মহাত্মাজী দীপ্তালোকে অভিযান আরম্ভ করেন, সুনিপুণভাবে বর্ধিত করেন। সাফল্য হতে সাফল্যে তাঁর অগ্রগতি চলে অভিযানের চরমে। কিন্তু তারপর তিনি শক্তি হারান, আর দ্বিধায় টলমল করেন।" দীপঙ্কর রায়ের লেখা 'গান্ধীজি ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন" প্রবন্ধ থেকে বাংলা অনুবাদটি সংগৃহীত; মাসিক বাঙলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪।

৪১। ১৯৪২ এ মিঃ গান্ধী ছাড়া আরও অনেকেই নাম কিনেছিলেন: অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়া, হরিদাস মিত্র প্রভৃতি কংগ্রেসী— বাংলা কংগ্রেসী-কংগ্রেসীরা সেই সময় প্রভূত নাম কেনেন— তাঁদের সেদিনকার ইনভেস্টমেণ্ট রিটার্ণ তাঁরা বহুবছর ধরে তুললেন বাট অ্যাট আওয়ার কস্ট। মন্ত্রীত্ব, মুখ্যমন্ত্রীত্ব, বিধানসভার ডেপুটী স্পীকারশিপ সব পদই তো অলংকৃত হল বিশিষ্ট ঐ গান্ধীবাদীদের দ্বারা. আজ না হালে পানি মিলছে না! তাঁদের নিজেদের কংগ্রেসী নেকস্ট জেনারেশন দেশবন্ধু-দ্রৌহিত্র মিঃ এস. এস. রায়, 'দ্বিতীয় নেতাজী' (?) মিঃ পি ডি. মুন্সীরা সাইড-ট্র্যাক করে রেখেছেন ওঁদের বর্তমানে।

তিনি পান আপত্তি নাই, কামটা যদি সুষ্ঠুভাবে হত। তা কিন্তু হয়নি। বম্বেতে ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২ এ প্রস্তাব নেওয়া হল 'ভারত ছাড়' আর 'কবেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র। এটাই ঐতিহাসিক আগষ্ট-আন্দোলনের পটভূমিকা। কিন্তু আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁর থাকবার কথা, জোরালো ভাষায় প্রস্তাব পাশ করালে কি হবে, তিনি শুধু লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ভারত ছাড়বার কথা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে চাইলেন। বীরত্বপূর্ণ কোন কাজই করলেন না, আর করার জন্য মরা? ডু অর ডাই? সে কথা থাক। বড়লাট গান্ধীজির ধার করা স্লোগানকে আমলই দিলেন না, দেখাই করলেন না, শুধু গ্রেপ্তার করলেন পরের দিন এইমাত্র, তাতেই একেবারে বিশ্বজোড়া নাম। আগষ্ট আন্দোলন যা' তার পরে চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলেছিল সাধারণ মানুষের ও আদর্শবাদী যুবক ও বয়স্কদের প্রাণের উন্মাদনায় নেতৃত্বহীন অবস্থাতেই, এ জিনিস আমাদের অনেকের স্মৃতিতেই আছে।

এটাকে 'মজার উপাখ্যান' বলে প্রথম মনে হয়েছিল পরিণত মন নিয়ে যেদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম— ৪২; বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, প্রদীপ বটব্যাল অভিনীত '৪২'। সুযোগ পেলে সে গল্পটা অন্য কোন জায়গায় শোনাবো।

যাক ওসব তো গেল দেশের ভেতরের ব্যাপার। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপারেও তাঁর দান আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলছি। এই বৃটিশ উপনিবেশে ভারতীয় শ্রমিক আর শ্বেতকায় মালিকদের ব্যাপারে তিনি নাক গলিয়েছিলেন সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯১৪ সনে। গান্ধীজি বিশ্বজোড়া নাম কিনেছিলেন এই ঘটনা মারফৎও কিন্তু ঘটনাগুলির ভেতরে যারা গিয়েছেন তারাই জানেন শ্বেতবর্ণ মালিকদের প্রতি যতটা আন্তরিকতা তিনি দেখিয়েছেন, শ্বেতকায় শ্রমিকদের প্রতি তা' কিন্তু দেখান নি। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় শ্রমিকরা শ্বেতকায়

শ্রমিকদের বিপক্ষে গিয়ে একটি চলমান ধর্মঘটকে 'সত্যের সংগ্রামের' জগাখিঁচুড়ি যুক্তি দিয়ে বন্ধ করে কাজে যোগদান করেন। তাতে মালিকরা উপকৃত হন ফলে ধর্মঘট ভঙ্গকারী ভারতীয় শ্রমিকরাও মালিকদের দ্বারা পুরস্কৃত হন। ১৯৪০ এ সুভাষচন্দ্র সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীকে জনসাধারণের বিপক্ষে ধনিক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক নরমপন্থী নেতা বলে যে উল্লেখ করেছিলেন সে তো ঐ সব ঘটনাকে দেখেই।

গান্ধীজি চরকা কাটার প্রবর্তন করেন। চরকায় স্বরাজ আনবার কথা, যে স্বরাজটা এসেছে তা চরকার দান কিনা জানিনা। সে যুগে অনেক গৃহস্থ বাড়ীতেই চরকার প্রচলন হয়েছিল, ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েরাও চরকা কাটতেন। রবীন্দ্রনাথকেও আধঘণ্টা করে চরকা কাটতে বলেছিলেন গান্ধীজি। তবে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু চরকার কার্যকারিতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না[৪৩]।

সে যাক, পরবর্তী সময়ে বছরের বিশেষ একদিন অথবা দুদিন পার্কস্ট্রীটের মোড়ে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জীদের ষোড়শোপচারে চরকা কাটতে দেখা গেলেও অন্য বাকী ৩৬৩ দিনে[৪৪]

৪৩। চরকাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে। গান্ধীজির প্রশ্ন ছিল 'But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning'? এর সাবলীল উত্তর এসেছিল শরৎচন্দ্রের নিকট হতে : 'I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders' (স্বরাজ আসতে পারে সৈনিক দ্বারা, মাকড়সার দ্বারা নয়, অর্থাৎ চরকার জাল দিয়ে নয়।)

৪৪। 'আজ শহীদ দিবস শিরোনামায় ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ তারিখের 'সত্যযুগ' খবর পরিবেশন করেছে— 'কলকাতা ২৯ জানুয়ারী— আগামীকাল বুধবার মহাত্মাজীর প্রয়াণ দিবস। প্রতি বৎসরের মত এদিন সারাদেশে

চরকার কথা কিছু শোনা যায় না। চরকা যদি স্বরাজ আনয়নের কলকাঠি হয়েই থাকে, তবে তা স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য কেন এখনও প্রতিদিনই কাজে লাগানো হবে না, এ প্রশ্ন গান্ধীবাদীদের মনেও জাগে না। আসলে তা নয়—এই চরকার ব্যাপারটার আসলে সবটাই ভোঁ আর ভাঁ। যিনি বললেন তিনি বললেন মাত্র, কারণ তাঁর কোন

শহীদ দিবস প্রতিপালিত হবে। বেলা এগারোটায় দুই মিনিট নীরবতা পালন, গান্ধীঘাটে সকালে সমধর্মের প্রার্থনা সভা, বিভিন্ন স্থানে গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান, সূত্রযজ্ঞ প্রভৃতির মাধ্যমে এই দিবস উদ্‌যাপন করা হবে।...সকাল আটটায় ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে...শহীদ স্তম্ভে মাল্যদান করবেন রাজ্যপাল এ. এল. ডায়াস*৪৫। গান্ধীঘাটে ঐ সময় সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে।'

'সকাল আটটায় রাইটার্স বিল্ডিংসে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করা হবে। সোয়া দশটায় পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর মোড়ে গান্ধীমূর্তিতে মাল্যদান করবেন রাজ্যপাল।...বাংলা কংগ্রেস, সংগঠন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহাত্মাজীর মূর্তিতে মাল্যদান, সূত্রযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করা হবে।' সূত্রযজ্ঞ বলতে নিশ্চয় চরকা কাটাকেই বোঝাচ্ছে। তা ৩০শে জানুয়ারীর 'মহাপ্রয়াণ' দিবসে যদি চরকা-কাটা হয়, তবে ২রা অক্টোবর গান্ধী-জয়ন্তীতে, ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে এমন কি ১৫ই আগস্টে কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ দিবসে (সাধারণ মানুষের জন্য অবশ্য ঐ তথাকথিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তি অপর্যাপ্ত দুঃখের কারণ হয়েছে), নিশ্চয় ঐ জিনিসটি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া হবেই। তাহলে ওপরের বর্ণনাতে একটু ভুল আছে— ৩৬৩ দিনটা ৩৬১ হবে। বৎসরের মধ্যে অর্ধ সপ্তাহ ব্যাপী ওঁরা ব্যস্ত থাকেন ওঁদের সূত্র এবং তার যজ্ঞ নিয়ে।

*৪৫। ১৯৪২ সনে আগষ্ট আন্দোলন দমন করার জন্য উত্তর প্রদেশের ব্রিটিশ ভক্ত রাজপুরুষ হিসাবে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনিই আজকের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। মিঃ অ্যানসেলট লায়ন ডায়াস প্রজাতন্ত্র দিবসে ফ্ল্যাগ ওড়ান, স্বাধীনতা দিবসে শহীদ স্তম্ভে মালা দেন, গান্ধী জয়ন্তীতে গান্ধীর গলায় মাল্যদান করেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতাজীকে পুষ্পার্ঘ দেবার ছাড়পত্রও পশ্চিমবঙ্গের ১নং নাগরিক হিসাবে তাঁরই।

স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। যারা সুতা-কর্তন কর্লেন তারা করতে হয় তাই কর্লেন, 'as He said' ভাব নিয়ে নিরাসক্ত মন নিয়েই করলেন। ফলে যা হবার হল, কতদিন চরকা কাটা চললো আর কবে থেকেই বা পাখা হয়ে উড়ে গেলো অর্থাৎ তা' বন্ধ হল, এর কোন রেকর্ডই কংগ্রেস সভাপতিদের ফাইলে লেখা পড়লোনা।

ছোটবেলায় দেশে গাঁয়ে একটা ছড়া শুনেছি। জানিনা কোথা থেকে এর উৎপত্তি, কে এর স্রষ্টা। সেদিন ঐ ছড়া মনে কোন রেখাপাত করেনি কিন্তু পরিণত বয়সে মনে হচ্ছে ছড়াটা অত্যন্ত অর্থবহ। 'স্বজনী লো, শুইন্যা যা এতরাত্রে চরকার ঘ্যানঘ্যানি। চরকা আমার নাতিপুতি, চরকা আমার হিয়া, চরকার দৌলতে আমার সাড়ে সাত ব্যাটার বিয়া। স্বজনী লো শুইন্যা যা এত রাত্রে চরকার ঘ্যানঘ্যানি।' মানেটা যা বুঝেছি তা এইরূপ : গান্ধীযুগে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলাদেশের বহু ঘরেই চরকা কাটার প্রচলন হয়েছিল। গ্রামের এইরকম কোন এক ঘরের বয়স্কা দিদিমা অথবা ঠাকুমা দাওয়ায় বসে চরকা কাটছেন আর সুর করে ঐ ছড়া বলছেন। ডাকছেন বাড়ীর ছেলেমেয়ে, পাড়ার লোক, গ্রামের আত্মীয় স্বজনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'হে আত্মীয়-বন্ধু আপনজনেরা, এত গভীর রাত্রে আমি যে চরকা কাটছি, সেটা শোনো, মন দিয়ে শোনো। এই চরকা আমার বড় প্রিয়, প্রাণের জিনিস, এত প্রিয় যে একে আমার আত্মজদের সমান মনে করি। এই চরকা কেটে আমার সংসারের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, এর সুতো বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারাই ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছি।' ইত্যাদি ইত্যাদি। চরকার মাত্রাহীন পাবলিসিটির প্রমাণ এই ছড়াটি। চরকা-প্রবর্তকের চরকা-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী তার মনের নিজস্ব ভাবালুতায় এর উপর রং চড়ালো, দেশের জন্য অক্লেশে যারা প্রাণ দিতে পারেন সেই বিপ্লবী সূর্য সেন, ক্ষুদিরামের দেশের লোক, বংশধরেরা প্রাণের উন্মাদনায় অমনি চরকাতে প্রাণমন সমর্পন করে

দিলেন দেশের মুক্তি আকাঙ্খায়। প্রবর্ত্তকের নিজের প্রদেশে এর একাংশ রেকগ্‌নিশন পেল কিনা সন্দেহ, বাংলার স্বদেশী দলের গায়কেরা অমনি গান ধরে বসলেন, মুকুন্দ দাসের স্বদেশী দলের গানের টানে যেমন করে দেশের প্রতি ঘরের মেয়েরা তাদের প্রিয় সোনার গহনা দেশের কাজে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইরকম বাঙলাদেশের প্রাণচঞ্চল সমাজ চরকাকেও অনুরূপ গুরুত্বই সেদিন দিয়েছিল। কিন্তু কত অন্তঃসারশূন্য ছিল যে অরিজিন্যাল স্কীমটি তা বুঝতে আজ আর সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছিলেন: 'The programme of the charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.' রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত লেখাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন কথা-সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের বেণু পত্রিকায় এক প্রবন্ধের মাধ্যমে। উপরোক্ত লাইন কটির মর্মার্থ: 'চরকার কার্যসূচী শিশুসুলভ; অথচ সমস্ত দেশকে এতেই ভুলানো গেলো দেখে হতাশ হতে হয়।'

সার্থক বিপ্লবী কবি নজরুলের তুলনা নাই। তিনি সেদিনই চরকাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন: 'সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই/ বসে বসে দিন গুণি! / জাগোরে জোয়ান, বাত ধরে গেল / মিথ্যার তাঁত বুনি।'

গান্ধীজি বড় শিল্প নাকি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে 'যন্ত্রই ভারতকে দরিদ্র করেছে। ম্যাঞ্চেষ্টার আমাদের যা ক্ষতি করেছে তার হিসাব করা কঠিন।' যখন নিজেই বলছেন 'এ আমার ডেলিবারেট অভিমত যে ভারত ইংরাজের বুটের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে না, নিষ্পেষিত হচ্ছে আধুনিক সভ্যতায়' তখন তাঁরই সহযোগিতায় গুজরাট-আমেদাবাদ ম্যাঞ্চেষ্টারে পরিণত হচ্ছিল কাপড়ের মিল তৈরী

করে। বাংলার আদর্শবাদী যুবক আর সংগ্রামী বয়স্কেরা হাজারে হাজারে তাঁর ডাকে বিলাতী কাপড় বর্জন করে খদ্দর যখন ধরলো, তখন তাঁর ফেভারিট কুটির শিল্প চরকা কিন্তু কাপড় সাপ্লাই দিতে পারলো না। ফলে তিনি যা নাকি অপছন্দ করতেন, সেই যন্ত্র শিল্পেরই আধিক্য দেখা গেল তাঁর নিজেরই প্রদেশে। বাঙ্গালী খদ্দর পড়ে সংগ্রাম করলো তাঁর ডাকে পকেটে একটা করে চরকা আর তকলী নিয়ে আর বোম্বে-আমেদাবাদ তার বেনেফিট তুললো ঐ ইংরেজদের দেশ থেকেই আপ-টু-ডেট মেশিন নিয়ে এসে তাদের কটন-মিলগুলো সম্প্রসারণ করে। আবার এর পরেও তিনি বাংলাদেশের পিঠে আদরের প্যাটিং করে বলেন 'এটা সত্য যে বাংলাদেশ বোম্বাইয়ের মিল শিল্পকে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ যদি সব যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র বয়কট করতে পারত ভাল হতো।' প্রসঙ্গতঃ, বাঙলাদেশের ভাবপ্রবণ যুবকেরা তাঁরই কথায় খদ্দর ধরেছিল বিলাতী কাপড় বর্জন করে, যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র বয়কট করবে কেমন করে ?

বস্তুতঃ তিনি বৃহৎ শিল্পেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন যদিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধোঁয়াটে কথাবার্তার দ্বারা উল্টোটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ সম্বন্ধে 'কাল' মার্কস দেখিয়েছিলেন কুটীর শিল্পের জন্য যারা বেশী করে বলে তাদের আসল বাসনা থাকে বৃহৎ শিল্পের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক। এবং তার সাহায্যে ঘটে বৃহৎ শিল্পের প্রসার। ভারতের ক্ষেত্রে মার্কসের এই বক্তব্য' সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। গান্ধীজি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ—গুজরাট-আমেদাবাদের বৃহৎ শিল্পগুলি তাঁর দ্বারাই বস্তুতঃ প্রসার লাভ করে।

ইদানীংকালে দেওয়াল লিখন দেখা যায় 'শ্রমিক নেতা ডাঃ গোপাল দাস নাগ জিন্দাবাদ' কোন সময় 'শ্রমিক নেতা লক্ষ্মীকান্ত বসু যুগ যুগ জিও'। গান্ধীজি নাকি মানুষদরদী ছিলেন তা

মানুষ-দরদীইতো শ্রমিকদরদী হয় কেননা শ্রমিক তো মানুষই এবং সাধারণ মানুষ, শিল্পপতিদের হাতে নিপীড়িত মানুষ অতএব মানুষ দরদী যিনি তিনি শ্রমিকদরদী হবেন এটি তো অ্যাক্সিয়ম্ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তা শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধেও তাই গান্ধীজি মাথা ঘামিয়েছেন তাঁর বহু লেখাতেই তার পরিচয় আছে। কিন্তু সেগুলো "পড়লেও দেখা যাবে তাঁর বক্তব্য রাসকিন্ বর্ণিত তত্ত্বের চার দেওয়ালের বাইরে যায়নি। সব কিছুর সর্বশেষ সারমর্ম দাঁড়ায় এই, যা তিনি আমেদাবাদের এক শ্রমিক সভায় বলেছেন : 'আমি তোমাদিগকে আর একটা কথা বলতে চাই। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে, যে সব ইউনিয়ন আমরা প্রতিষ্ঠিত করছি তা মিল মালিকদের সঙ্গে লড়বার জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ (coercion) করার জন্য বা ঐরূপ কোনও উদ্দেশ্যে ইউনিয়নগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য, আমি তাঁদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করতে বারণ করব। **মালিকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করার জন্য বা তাদের স্বার্থের হানি করার জন্য আমি জীবনে কখনও কোনও কিছু করিনি** এবং আমি নিজেকে এই কাজের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিব না।' নবজীবন, ফেব্রুয়ারী ২৯, ১৯২০[৪৬]।" হোয়াট এ রিমার্কেবল কনফেশন! কি ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি! ছোটবেলায় গান্ধী-আত্মজীবনী[৪৭] পড়েছিলাম, ইংরেজীতে নয়, বাঙ্গালী অনুরাগী-লেখকের মাতৃভাষায় অনুবাদ। তাতে তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের আত্মধিক্কার সঞ্জাত একটি কনফেশন ছিল। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তিই তাঁকে আমার চোখে মহান করে তুলেছিল, তাঁকে দেবতার সমতুল্য ভেবেছি বহুকাল; পয়গম্বর যাকে বলে আর কি! আমার বিশ্বাস যারা মোহনদাস করমচাঁদকে 'মহাত্মা' বলতেন, তাদের অনেকেই অন্ততঃ

৪৬। 'লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ' সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ পৃঃ ৮৯।

৪৭। ইংরাজী আত্মজীবনীর নাম : 'My Experiments with Truth'—M. K. Gandhi.

ঐ ঘটনার কথা স্মরণে রাখতেন। সময় গড়িয়েছে, বিরাট ঐতিহ্যময় এই উপ-মহাদেশের দুর্দশা দেখতে দেখতে আর তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন পালটিয়েছে। যাচাইয়ের ভঙ্গী নিয়ে গান্ধী-সংক্রান্ত বহু লেখা ইদানীংকালে পড়েছি, পড়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পুরোপুরি হারিয়েছি একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা আজ আর নেই। এই সহজ অপ্রিয় সত্য কথাটিতে অনেকের মনেই লেখকের উপর বিরক্তি আসতে পারে এই ভেবে যে সমগ্র পৃথিবী যাঁকে সম্মান করে, অতবড় ব্যক্তিত্বকে হয়ত আমি নীচু কর্বার, অসম্মান কর্বার চেষ্টা করছি।[৪৮] সে যে যা ভাবুন আমার করার কিছু নাই, যে যা বলুন তা খণ্ডাবার মত জোরালো যুক্তিবাণ আমার তূণে সযত্নে রক্ষিত আছে। যা বলছিলাম, গান্ধী সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়েছি যা গান্ধী-প্রচার বিভাগের প্রভাবমুক্ত লোকেদের হাত দিয়ে বেরিয়েছে, পড়েছি গান্ধীর নিজস্ব অনেক লেখাও। তাঁর বক্তব্যের একটা বড় অংশ আমি-বাচক কথাবার্তা— আমি এই, আমি সেই। তা' আত্মজীবনীর 'আমি'র সাথে বড় হরফের লাইন কয়টা যোগ দিলে আর একটি 'আমি'কেও দেখা যাচ্ছে। এই আমি-সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিটাও আর একটি ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি বলেই অনুভূত হচ্ছে, তবে একদম উলটো ধরণের এই যা। আর এদ্বারাই তাঁর সঠিক 'আমি'টির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, বদ্ধ ঝোলা থেকে আসল 'আমি'টি বেরিয়ে পড়েছে। মালিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ কখনো করেন নি, করবেন ও না এই যাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি আবার শ্রমিক ইউনিয়নও নাকি প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু কারণটা কি? কোন্‌ কাজটা তাঁর সমর্থিত ইউনিয়নগুলোর কারিকুলামে ছিল? প্রথমটার উত্তর আছে—আফ্রিকায় শ্রমিক-

৪৮। স্পেড্‌কে স্পেড্‌ বলাই ভালো তাতে হার্টস্‌এর স্পন্দন খোঁজা নিরর্থক। অথচ তাই তো হতে দেখা গেলো অর্ধ-শতাব্দীর ওপর ধরে—কালো স্পেড্‌ অনায়াসে লাল হার্টস্‌ নাম পেল।

দরদী নাম কেনবার পরে তো আর বসে থাকা যায় না—অতএব অ্যাকটিভিটি দেখাতেই হয়। যেমন আজকের পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতারা শ্রমিকদের ক্ষতি কর্বার মানসে ইউনিয়ন-ইউনিয়ন খেলা, আন্দোলন-আন্দোলন খেলার সার্কাস দেখাচ্ছেন অজ্ঞ জনসাধারণকে। মানুষের শত্রুরাই শ্রমিকদরদী সাজছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের ডাইরেক্ট উত্তর নেই অর্থাৎ শ্রমিকদের কি করণীয় তা কিছু বলা নেই, কি করা চলবে না সেটা কিন্তু স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। 'মালিকদের সঙ্গে লড়বার জন্য' নয়। তবে কিসের জন্য এই শ্রমিক ইউনিয়নের প্রহসন যা শ্রমিকস্বার্থ দেখে না? গান্ধীজি গত হয়েছেন, এর উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না জানি, তবে তাঁর উত্তর-সূরীরা আজ তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে নানান শিল্প সংস্থায় যুবকংগ্রেসী ইউনিয়ন গড়েছেন, তারা বলতে পারবেন নিশ্চয়ই। সরকার পক্ষীয় সুব্রত মুখার্জি আর তার সমর্থক প্রিয়দাস মুন্সীরা তাঁদের নেতৃত্বে ব্যাঙের ছাতার মতো গজানো ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে হয়ত বলতে পারবেন, বলতে পারবেন হয়তো তাঁদের চরম বিরোধী লক্ষ্মীকান্ত বসু-সোমেন মিত্র-পঙ্কজ ব্যানার্জী-বারিদবরণ দাস তাঁদের গড়া ইউনিয়ন সম্বন্ধে? তাঁদের কার্যক্রম? না থাক, সেটা মানুষে চোখের উপরই প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছে, কেউ তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না, সেটা সম্বন্ধে বলার দরকার নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশের লোকেরা শ্রেণীহীন সমাজের কথা শুধু মুখেই বলেন না, কার্যতও তা তারা করেছেন, করে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের কম্যাণ্ডারের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে গেলে সৈয়দ শাহেদুল্লাহর লেখা 'লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ' পুস্তকের ১৭-২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত গান্ধীজির কথাবার্তা ও তার উপর লেখকের সুচিন্তিত বক্তব্য ও মন্তব্যগুলো তুলে দেওয়াই ভালো। "যাদের জমি আছে তাদের নিশ্চিন্ত করে দিতে হবে যে তাদের বিরুদ্ধে কখনোই শক্তি প্রয়োগ করা হবে না' (হরিজন ২১-৪-৪০)। (তবে

পুলিশ কার বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যে! যারা বেনাম জমি উদ্ধার করবে তাঁদের বিরোধিতার জন্যে?[৪৯] 'কংগ্রেসের পক্ষে জমিদারের সম্পত্তি নেবার কোনও ইচ্ছা নেই' (ইয়ং ইণ্ডিয়া ৮-১০-৩১)।[৫০] চাষীরা মজুরী বাড়াবার জন্য কাজ করতে পারে এটা মেনেছেন কিন্তু জমির কথা বলেন নি। (হরিজন ৫-১২-৩৬)। লক্ষ্যণীয়, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোনও প্রস্তাব বা কার্যক্রম নেই"।

"সরকার, রাষ্ট্র কিংবা জমিদার প্রভৃতি অন্যদের উপর দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। তারা নিশ্চয়ই আমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী, কিন্তু আমরা নিজেরাও দায়ী।' (হরিজন, ১১-৫-৩৫)। দোষ কাদের দেওয়া যাবে? 'আমরা (অর্থাৎ কৃষকরা) দায়ী।' তাছাড়া গ্রামের যাঁরা গঠনমূলক কাজ করেছেন তাঁদের অভিমত হিসাবে বলছেন: 'যদি গ্রামবাসীদের কোনও মতে বরাবরকার আলস্য পরিহার করাতে পারা যায়, তারা আরামে থাকতে পারে। (হরিজন, ১৪-৯-৩৫)

৪৯। যুক্তফ্রণ্টের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বহু বেনামী জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষকদের বিতরণ করেন. এর বিরোধিতা যারা সেদিন করেছিল কংগ্রেসী গ্রুপের সেইসব জোতদারকে সহায়তা করেনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুলিশ। তাই হরেকৃষ্ণ কোঙার যেমন বাংলা কংগ্রেসী-কংগ্রেসী নেতাদের কাছে বিভীষিকা স্বরূপ হয়েছিলেন, তেমনি জ্যোতি বসুকেও দলবাজীর মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। গরীব কৃষকদের বিরুদ্ধে পুলিশকে লাগালে গান্ধীজির শিষ্যেরা খুশী হতেন, নিজেদের সরকারী আমলে তাই তাঁরা করে থাকেন।

৫০। শুনুনগো, বাবু মোশয়রা শুনুন সব, আপনাদের গান্ধী সাহেব (মানে মিঃ কংগ্রেস—মিঃ ইউনিভার্স, মিস্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি উপাধির অনুকরণে মিঃ কংগ্রেসই লিখলাম, বহু বছরের মিঃ কংগ্রেস) কি বলেন। হোয়াট এ টেরিফিক অ্যাস্যুওরেন্স টু জমিণ্ডারস্! বাংলার জমিদারবৃন্দ ভারতবর্ষেরও তাই বুঝি এতকাল খুশী?

"শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব নিম্নের উদ্ধৃতিতে যথেষ্ট পরিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে শ্রেণীভেদের প্রয়োজনীয়তায় তিনি কিরূপ বিশ্বাস করতেন তাও দেখা যাবে।

'If you were strong in number even if you were a million you would not be able to run a mill. You lack talent to run it. You have not acquired the capacity to run a mill even after twenty years of organised work, nor are you likely to acquire that capacity the next twenty years[৫১]. If you think you have you do not need a leader to lead you.

'I do wish you may acquire that capacity some day It is certainly possible for you individually so to train yourselves as to run a mill. In that case the rest of you will be as much slaves as you are to day. What I mean is that you as a body could not own a mill in a given munber of years

'If instead of insisting on rights everyone did his duty there will immediately be the rule of order established among mankind. There is no such thing as divine rights of kings to rule and the humble duty of the ryots to pay respectful obedience to their masters. …it is true that these hereditary inequalities must go, these are harmful to society."

৫১। এ গ্রেট প্রফেট, ইন্‌ভীড্‌!

[মর্মার্থ : "তোমরা যদি সংখ্যায় শক্তিশালী হও, এমন কি দশলক্ষ হও একটা কল (মিল্) চালাতে পারবে না। তোমাদের সে প্রতিভার অভাব! বিশ বৎসরের সংগঠিত কাজ করা সত্বেও তোমরা একটা কল (মিল্) চালাবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারো নি। আগামী বিশ বৎসরেও তা পারবে এমন সম্ভাবনা নেই। তোমরা যদি ভাব তোমাদের তা আছে, তোমাদের পরিচালনা করার জন্য নেতার' (নেতাই বটে!—লেখক) 'প্রয়োজন হতো না।'

'আমি চাই যে তোমরা সে-ক্ষমতা একদিন অর্জন কর। এ নিশ্চয়ই সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে একজন কিংবা আর একজন এমনভাবে শিক্ষা অর্জন করবে যে মিল্ চালাতে পারবে। সে ক্ষেত্রে তোমরা বাকী সকলে তেমনই গোলাম থাকবে এখন যেমন তোমরা আছ। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই, তোমরা সমষ্টি হিসাবে একটা নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে মিলের মালিক হতে পারবে না।

"যদি অধিকার নিয়ে জেদ করার বদলে প্রত্যেকেই তার কর্তব্য পালন করে যায়, মানবজাতির মধ্যে অবিলম্বে-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। শাসন করার ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার রাজাদের আছে এবং রায়তদের কর্তব্য হচ্ছে নত হয়ে তাদের প্রভুদের নিকট সশ্রদ্ধ বাধ্যতা নিবেদন করা—এ রকম কিছু অবশ্য নেই। এই সব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অসাম্য চলে যাওয়ার এখন সময় হয়েছে। সমাজের পক্ষে এ হচ্ছে ক্ষতিকর।' কিন্তু ঐরূপ কথার অব্যবহিত পরেই তিনি বলছেন 'কিন্তু এতাবৎকাল পর্যন্ত যারা পদনিষ্পেষিত হলো সেই সব কোটি কোটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অকুণ্ঠ ও বেপরোয়া জেদাজেদিও সমাজের পক্ষে তেমনি ক্ষতিকর। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ঈশ্বর প্রদত্ত বা অন্যান্য অধিকারের দাবী করে (অর্থাৎ ধনীরা—লেখক শাহেদুল্লাহ) তাদের অপেক্ষা কোটি কোটি জনগণের ক্ষতি

করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ উপরোক্ত বেপরোয়া ব্যবহার করা হয়।]"
(হরিজন, ৬ই জুলাই, ১৯৪৭)

"লক্ষ্য করার বিষয় অভিজাতদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারকে গান্ধীজী এখানে অস্বীকার করেছেন বটে কিন্তু 'ভুঁইফোড়' বুর্জোয়ার অধিকারকে তিনি অচল অনড় ও অনস্পর্শনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। প্রকারান্তরে তিনি শ্রমিকের নিকট দাবী করছেন ঐ বুর্জোয়াদের নিকট বাধ্য থাকতে হবে। বুর্জোয়ারা অভিজাতদের নিকট তাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কিন্তু শ্রমিক যদি বুর্জোয়ার নিকট তার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে যায় তা হবে অকুণ্ঠ বেপরোয়াগিরি।" (সৈয়দ শাহেদুল্লাহ)

"ক্ষমতা হস্তান্তরের মাত্র ৪০ দিন পূর্বে উচ্চারিত ও প্রকাশিত তার এই বক্তব্য শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় দেয়। ১৯৪৬ এর ৪ঠা আগষ্ট অর্থাৎ উপরোক্ত বক্তব্য প্রকাশের বৎসর খানেক পূর্বে ধনী ও নির্ধনের যোগ্যতার পরিমাপ ধন থাকা না থাকার উপর স্থির ক'রে তিনি তাদের পৃথক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছিলেন, 'ধনীদের তত্ত্বাবধায়কের কাজ শেখাতে হবে এবং গরীবদের শেখাতে হবে আত্মনির্ভরশীলতা।' (হরিজন ৪-৮-৪৬)। প্রসঙ্গতঃ স্কুলেতেই শিক্ষার বিভাগব্যবস্থা করা (যাকে স্ট্রিমভাগ বলে) এবং মার্কিন কায়দায় ম্যানেজমেন্টের কলেজের আবির্ভাব যে বুর্জোয়া চিন্তাধারার কোনও বিচ্ছিন্ন নিদর্শন নয় গান্ধীজীর এই উক্তি থেকে তা বোঝা যায়।"[৫২] (দাগ বর্তমান লেখকের)

৫২। উপরোক্ত 'শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িকতার সমাধানে কিরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে' একথা নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক তাঁর বইয়ে। তবে সে পয়েন্টটা এখানে টাচ্ করলাম না, বইয়ের আয়তনটা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে।

অনশন আন্দোলন করতেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তখনকার দেশপ্রেমিক যুবকেরা নিজেদের বহু সময়ে অনশনে জড়িয়েছেন। একটি ইতিহাস বিখ্যাত অনশনের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। বাঙ্গালী সংগ্রামী চরিত্রের দৃঢ়তা বোঝাতে গেলে ঐ অনশনের কথা উল্লেখ আবশ্যিক। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার[৫৩] আসামী যতীন দাস—যাঁর উপর সেদিনের ইংরেজ সরকারের উৎপীড়নের সীমা পরিসীমা ছিল না—১৯২৯ সনে ৬৩টি দিন অনশন করে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেন (সেপ্টেম্বর)। তাঁর মৃত্যুতে চঞ্চল হয়েছিলো দেশের লোক। চঞ্চল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র এমন কি বহির্বিশ্বের বহু মনীষিও। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধীজি। এত বড় ঘটনা সম্পর্কে কিন্তু তাঁর মুখ থেকে সেদিন কোন বাণী নিঃসৃত হয়নি-সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ সত্ত্বেও না। অনেকদিন পরে অবশ্য দেশবাসী জেনেছিল যে যতীন দাসের মৃত্যু তাঁর মতে ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যার (diabolical suicide) ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। অপ্রিয় সত্য বলতে হত জন্যই নাকি গান্ধীজি

৫৩। ১৯২২ এর ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে বরদৌলী আন্দোলন হবার দিন ধার্য হয়েছিল। ঐ ঐতিহাসিক আন্দোলনটির নাম আমরা অনেকেই শুনেছি নিজেদের ছোটবেলা থেকে কিন্তু আজ জানি এটিও একটি মজার উপাখ্যান মাত্র—সে আন্দোলন হয়নি, কংগ্রেস মানে গান্ধীজি কারুও সঙ্গে পরামর্শ না করেই গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ঘটা একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত ঐ আন্দোলনটি প্রত্যাহার করে নেন। সে সময় জেলে আবদ্ধ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, মতিলাল নেহেরু, পাঞ্জাব কেশরী লালা লজপত রায় গান্ধীজির ঐ ছেলেমানুষি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন জোরালো ভাবায়। লালা লজপত রায় একাকভাবে যে চিঠি দিয়েছিলেন গান্ধীজিকে, তার পৃষ্ঠার সংখ্যা ছিল সত্তর। এই বিপ্লবী লালা লজপতের হাতে খুনী স্যাণ্ডার্স সাহেব নিহত হন ১৯২৮ সনে। সেই হত্যাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সরকার আরম্ভ করেছিল ঐতিহাসিক 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'।

সেদিন মুখ খোলেন নি। এতে প্রশ্ন জেগেছিল সকলের মনে— অনশন তো মহাত্মারই সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার, তিনি তো বহুবার অনশন করেছিলেন, তবে যতীন দাসের অনশনে অপরাধ কোথায়? দুদিন বাদে লেবুর রস পান করে আমরণ অনশন ভঙ্গ না করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এইজন্যই কি যতীন দাশের অনশন অস্বীকৃত? তবে কি তিনি অনশন করলে সেটা হয় দেশের জন্য অনশন অন্য কেউ করলে হয় ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা? মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব স্পষ্টভাবে জানা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু সেই দধীচিকে সম্মান দেখিয়েছেন দিনের পর দিন।[৫৪] এই যতীন দাস ১৯২১ সালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন। এই মৃত্যুঞ্জয়ীর দেহাবসানের অনতিকাল পরেই সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ দেন তাতে ছিল: 'আসুন আজ আমরা সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি—সেই উদ্যমে জীবনপাত করিয়া আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হইবার উপযুক্ত হই। বন্দে মাতরম্।' স্মরণ থাকে যে, সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজি দুজনেরই কিন্তু সেই সময়ে মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম্'

শহীদ যতীনদাসের অনুজ কিরণ দাসের কাছ থেকে জানা যায় যে পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক 'যতীন দাস মৃত্যুদিবস'[৫৫] পালন করেছেন। এমন কি ঐ দিনেই

৫৪। 'আমি সুভাষ বলছি' ১ম খণ্ড পৃঃ ৪০৬।

৫৫। ঢক্কানিনাদ যেরকম শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যতীন দাসের স্মৃতিরক্ষার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু একটা করেই বসবেন। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৪ এ প্রজাতন্ত্র দিবসে নাকি চেতলা ব্রিজটা চালু করে তার নাম দেবেন 'যতীন দাস সেতু'। (হাজরা পার্কের নাম অবশ্য 'যতীন দাস পার্ক' করেছে পূর্বতন সংগঠন কংগ্রেস তবে কবে এ অঘটন ঘটিয়েছে তা' জানিনা)। এ কি নিছক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না যতীন দাস তাদের দলীয় লোক ছিলেন এই প্রচারের চেষ্টা? (এ সম্পর্কে

(২২-৯-৪৪) তাঁর ঐতিহাসিক শপথ বাণীটি শোনা যায়: 'Give me blood, I will give you freedom. তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।' এই হচ্ছে সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীজি, বিড়লা মন্দিরের রামধূন সঙ্গীতজ্ঞ সেই ভগবান-উপাসক

আর একটু বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে 'যতীন দাস স্মরণে' প্রবন্ধে)। ১৯৭৩ এর ১২ই জানুয়ারীতে কলকাতার বুকে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল সেদিনটা ছিল মাষ্টারদার তিরোধান দিবস, বিপ্লবী সূর্য্য সেনের আত্মাহুতির দিন। পুরণো দিনের শ্রদ্ধেয় সংগ্রামীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন শহীদের প্রতিকৃতির সামনে কংগ্রেসের বাহারী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। এতে ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে অনেকেই সেই স্থান সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করেন। বিপ্লবী সূর্য সেনেরা 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা পেয়েছিলেন খোদ গান্ধীর কাছ থেকে—মানবো একথা যে তাঁদের সেদিনকার মত ও পথ অভ্রান্ত ছিল একথা সত্যিকার বামপন্থীরাও আজ মনে করেন না, সুভাষচন্দ্রও তাঁদের পূর্ণ সমর্থন কখনো করেন নি। কিন্তু মত ও পথ যাই হোক, তাঁদের দেশপ্রেমকে অস্বীকার কোন সত্যনিষ্ঠ মানুষই করতে সুভাষচন্দ্রও পারেন নি, তাহলে যতীন দাস অতবড় সার্টিফিকেট পেতেন না, খুদিরাম, ভকত সিং, সূর্য সেনেদের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠতো না। কিন্তু গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস এঁদের দেশপ্রেমের ন্যুনতম স্বীকৃতি সেদিনও দেননি, পরেও না, কিন্তু ১৯৭২ এর গড়বড়ে নির্বাচনটা সেরে বুকে কাঁপুনী ধরেছে, তাই সন্তায় কংগ্রেস বুঝি নাম কিনতে চায় লোককে উল্টোপাল্‌টা বুঝিয়ে! 'কত রঙ্গই দেখবো ভাই আমাদের এই বঙ্গে'। 'ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যাকারী' (?) যতীন দাসের নামে সেতু উৎসর্গ হচ্ছে, 'উপদ্রবকারী' লেনিনের (এ সম্পর্কে কয়েক পৃষ্ঠা পরে বিস্তারিত লেখা হয়েছে) প্রতিকৃতি স্থাপনা হল কে. সি. দাশের দোকানের সম্মুখে এস্‌প্ল্যানেড ইষ্টে আবার গলায় মালাও দিয়েছেন তাঁর জন্মদিবসে—এ ছেলেরা তো ছেলে নয়, দেবতা নিশ্চয়। মোহনদাস অহিংসবাজের চেলারা যে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'র বুকে কলকাতার মাটিতে এত অহিংস-উদারতা দেখাতে সুরু করেছেন, তা গান্ধী-মহারাজ বেঁচে থাকলে যে হরদম মূর্চা যেতেন ভদ্রলোক এ কথা কি কেউ খেয়াল করিয়ে দিচ্ছে না ওদের? লেনিনের গলায় মালা

মহাত্মা গান্ধীজি ? না থাক…। উনার সম্বন্ধে যত কম বলা যায় তবে হালের বাজার মাত করা দুজন নোটেবল্ গান্ধীবাদীর কথা না হয় এই ফাঁকে শুনিয়ে দি। সময়টা ১৯৬৯ এর ডিসেম্বর, দ্বিতীয় যুক্ত-ফ্রন্টের শেষের দিক, গান্ধীবাদের আর্তনাদ পশ্চিমবঙ্গ—দিল্লী ছেড়ে মর্তধাম-স্বর্গলোক বিদীর্ণ করেছে, গান্ধীবাদী বাংলা কংগ্রেসী নেতৃদ্বয় 'জঙ্গল রাজত্বে' (?) এই অভাগাদের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কামনায় অনশন করলেন, অনশনের স্টীলে বেস।[৫৬] কার্জন পার্কের দাওয়া জমজমাট হল—দিনে রাতে প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে, প্রকাশ্যে-নেপথ্যে অনেক ঘটনা ঘটল। যা' হবার তাই হল, যুক্তফ্রন্ট ডিগবাজী খেল তাদের মুখ্যমন্ত্রী-শিল্পমন্ত্রীর দক্ষতায়। সময় যায়, পৃথিবীর বয়স আরও এক বৎসর বাড়ল। ১৯৭১ এর মার্চে আবার নির্বাচন হল। আগের বারের ৩৩ জন বাংলা কংগ্রেসী পাঁচ-এ নামল। যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রীত্ব পেলেন, ১৯৬৯-৭০ এর জেন্টলম্যানস্ এগ্রিমেণ্ট কংগ্রেস নিজের স্বার্থেই রাখলো, ভদ্র-লোককে নিরাশ করলো না। কিন্তু গোল বাধল এবার বাংলা কংগ্রেসের চেয়ারম্যান (প্রেসিডেণ্ট বোধ হয়) ও সেক্রেটারী সাহেবের মধ্যেই, কি সব তহবিল টহবিল সংক্রান্ত ব্যাপার। এত্তো টাকা, এত্তো লক্ষ টাকা যে পাওয়া গেল কার্জন পার্কে রাতের অন্ধকারে যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার আগাম ইনাম স্বরূপ পুঁজিপতি আর কালোবাজারীদের কাছ থেকে সে টাকাটাই বিবাদের প্রারম্ভিক কারণ। যা হোক, মুখুজ্যে

পড়াবার আগে ১৯৬৯-৭০ এর আকাশ-বাতাস কাঁপানো গান্ধী-চ্যালা অজয় মুখার্জী তাঁর গুরুর কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন তো? নাকি স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি করে গুরু তাঁকে আশীর্বাদ-বর্ষণ করেছিলেন— তাঁর যোগ্য ছাত্র শিককের ধোঁয়াটে কথাবার্তা ও কাজকর্মের সার্থক রূপায়ন করছেন দেখে খুশী হয়ে? 'যতীন দাস সেতু' উদ্বোধনের সুযোগ অবশ্য তিনি পাবেন না—তাঁর পরের জেনারেশন অর্থাৎ সিদ্ধার্থ রায়, প্রিয়দাস মুন্সী প্রমুখদের সে সুযোগ মিলছে।

মশায় এবং ধাড়া সাহেব দুটো আলাদা শিবিরে আস্তানা গাড়লেন। (আরো পরে অবশ্য অজয়বাবু বীরদর্পে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন, সে অন্য কথা)। এরপর, বেশ কিছুদিন পর, ধাড়া সাহেব[৫৭] অনশন করলেন তাঁর বসন্ত বোসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অফিস ঘরের[৫৮] সামনে সামিয়ানা খাটিয়ে। এই অনশন সম্বন্ধে সাংবাদিকেরা অজয়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ সুশীল ধাড়ার অনশন করাটাকে নস্যাৎ করে দেন। পেটে ভাত না থাকলেও বাঙ্গালীর ব্রেণ আছে (ব্রেণে ব্রেণে তাই তো এত ঠোকাঠুকি।) স্মরণশক্তি পুরোমাত্রায় আছে বাবুদের ব্রাহ্মীশাক না জুটলেও। খবরের কাগজের ঐ সংবাদটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধীমানদের একজন তার স্মৃতি-শক্তির প্রমাণ দিয়ে দিলেন মহাত্মা গান্ধী আর যতীন দাসের ৪২ বছর আগেকার ঘটনাটি মনে করিয়ে দিয়ে। এত বছর পরেও সেই একই ডিক্টেটরীশিপ-মুখুজ্যেমশায় করলে হয় সেটা অনশন, অন্যে করলে সেটা কিছু না। সার্থক গান্ধী-চেলা! দেশটা তো এঁরাই চালাবেন, পার্মানেণ্ট ইজারাদারী পেয়েছেন যে! ইজারাটা দিল কে এটাই হচ্ছে কথা। যখন দুজনে এক শিবিরে ছিলেন তখন অনশনটা ঠিক ছিল — বার্ডস অব দি সেম ফেদার ইউসড্ টু ফ্লক

৫৬। এই 'অনশনের লে বেস'টি সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা হয়েছে স্থানান্তরে

৫৭। গান্ধীবাদী শিল্পমন্ত্রী সুশীল ধাড়া যিনি "পার্ক হোটেলের ছাড়পত্র পাইয়ে দেবার জন্য সবচেয়ে বেশি কর্মোদ্যম দেখিয়েছেন। তিনিই আবার জোর গলায় বলেছিলেন: 'জ্যোতি বাবু পার্ক হোটেলের কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেছেন, (বাসব দাসগুপ্ত: 'পালা বদলের নেপথ্যে' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০), জোরটার মদত যে এসেছিলো তাঁর অবিভিজ্ঞাল পার্টির কাছ থেকে।

৫৮। ঐ অফিস বাড়ীটির পেছনে একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে, পারলে সে কথা পরে শোনাবো।

টুগেদার। এখন শিবির ভিন্ন তাই সেম 'বেদার' হলেও ব্লকিংটা একসাথে নয়, ফলে সুশীলের অনশনটা কিছু না অর্থাৎ প্রহসন, মুখুজ্যেমশায়ের মতে। তা প্রহসন তো সবটাই ওঁদের!

সি. পি. আই তাদের প্রধানমন্ত্রীর সার্টিফিকেট পেয়েছে ১৯৭৩ এর ডিসেম্বরে। অনুরূপ একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট ফ্রম এ গেজেটেড অফিসার গান্ধীজির ও ছিল। ৩০শে জুন, ১৯৪৫ এ কিছু হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ আলোচনা হয়েছিল ভারতবর্ষের পুঁজিপতি-দের অন্যতম ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর হেনরী ক্রেকের মধ্যে যিনি দমন পীড়নে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। বিড়লার কোন কথার উত্তরে সার ক্রেক বলেছিলেন 'গান্ধীজির আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি স্বীকার করি তিনি কমিউনিজমের জোয়ার আটকে দিয়েছেন।' বোঝা যাচ্ছে কমিউনিজম-জুজুর ভয় ইনাদের বহুকালের। বিদেশী বৃটিশ আর দেশীয় কংগ্রেসীদের মধ্যে তাই তো এত সাদৃশ্য, সৌহার্দ! মহাত্মা গান্ধীর-বৃটিশ আনুগত্য ও পুঁজিপতিদের প্রতি আন্তরিকতার বহু নিদর্শন আছে। লোকে বলে কংগ্রেস পুঁজিপতি ও কালোবাজারীর পৃষ্ঠপোষক—বটেই তো, না হলে টাকার পাহাড় জমে ওঁদের ঘরে আর দেশের লোক খেতে পায় না। মাত্র দু'বছরে (১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ এ) একমাত্র বিড়লাদের টাকা ৫০৫ কোটি থেকে ৬৩৬ কোটিতে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে ঘনশ্যাম দাস বিড়লার নিজের কথাগুলোও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "১৯৩৫ এ বৃটিশ ভারত-সচিব স্যামুয়েল হোরকে পত্রে লেখেন: '...আমি গান্ধীজির আদরের সন্তানদের একজন। আমি তাঁর খদ্দর তৈরী আর অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতিতে উদার-ভাবেই দান করেছি। আমি নিজে কখনও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিনি।' (শেষোক্ত ঘোষণা ইংরাজের সতীর্থ হিসাবে

নিজের পরিচয় দানের জন্য? বোধ হয় দুঃখ জ্ঞাপনের জন্য সরকার তাঁকে তেমন সুনজরে দেখেন না এই মত নিবেদন করার পর বলছেন: 'আমি কর্তৃপক্ষকে (বলা বাহুল্য, বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে) এই মতে জয় করতে চাই যে গান্ধীজী ও ঐ টাইপের মানুষেরা শুধু ভারতের বন্ধু নয়, গ্রেট বৃটেনেরও বন্ধু। ...**He (Gandhiji) alone is responsible for keeping the left wing in India in check** (একমাত্র গান্ধীজিই ভারতের বামপন্থী শক্তিকে চেক করে রেখেছেন।" (ইন দি শ্যাডো অব দি মহাত্মা, জি. ডি. বিড়লা, পৃ:৫৩, সৈয়দ শাহেদুল্লাহর মাধ্যমে)।

'অখণ্ডভারত' যাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল সেই যোগীর, সেই ঋষির কেউ নামও নেয়নি প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উৎসব দিনে। পরেও তাঁকে চিরকালই অস্বীকার করলো এ দেশের সরকার। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিলেন, তাঁর উত্তরসূরী নেহরুজী শুধু তাঁকে তরবারি হাতে রোখবারই বাসনা প্রকাশ করেন নি, দেশে ফেরবার সমস্ত পথ রুদ্ধ কর্বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর অন্তর্ধান জনিত প্রশ্নটা নিয়েও কি পর্যন্ত নোংরামির পরিচয় দিল নেহরু-সরকার গঠিত শাহনাওয়াজ কমিটি। ১৮-৮-৪৫এ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এটা জনশ্রুতি ছিল। ভারতবর্ষের মসনদ বৃটিশ-প্রসাদে পণ্ডিতজী পেয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে কিন্তু নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা জনিত তদন্ত কমিটিটি গঠনের সময় করে উঠতে পারলেন না ভদ্রলোক ৫-৪-১৯৫৬ এর আগে, কাজের চাপে মাত্র বছর নয়েকই সময় গিয়েছিল। তিনজন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির দুজন—চেয়ারম্যান শাহনাওয়াজ খান ও সরকারী সদস্য আই. সি. এস এস. এন. মৈত্র—কর্তার ইচ্ছাকেই কর্ম হিসাবে ধরে নিয়ে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেন। বিমান

দুর্ঘটনার স্থান ফরমোসা দ্বীপে সরেজমিনে তদন্তে না গিয়েই ১১টি বছর পরে গঠিত অনুসন্ধান কমিটি কতকগুলি হাস্যকর যুক্তি লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ করে দিলেন নেতাজী মৃত। ব্যারিষ্টার-সাহেবকে খুশী করা নিয়ে কথা—তা তিনি হয়েছিলেন শুধু বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছিলেন তৃতীয় বেসরকারী সদস্য সুভাষ-অগ্রজ সুরেশ চন্দ্র বসু যখন তিনি পণ্ডিতজী নিযুক্ত অপর দুই পণ্ডিতের[৫৯] আবোল-তাবোল কথাবার্তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। যাক তাঁদের সে কলঙ্কের কথা। নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ ১৭.৮.৪৫ তে প্রথম পেয়ে নেহরুজী বলেছিলেন 'সুভাষবাবুর মৃত্যুসংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে কিন্তু ইহা আমাকে স্বস্তি ও দিয়াছে।' দুঃখিত হবার কথা থাক, বহু বছর ধরে বাক্যবাগীশ মহাশয়টি যে অস্বস্তিতে জীবনটা কাটিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'নেতাজী এনকোয়ারী কমিটি'র ডেলিবারেট ফাইন্যাল রিপোর্টে যা সরকার প্রকাশ করেছিলেন ১৯৫৬ এর সেপ্টেম্বরে। এনকোয়ারি কমিটির সদস্য সুরেশ চন্দ্র বসুর যুক্তিগ্রাহ্য আপত্তি সত্ত্বেও শাহনাওয়াজ খান ও এস. এন. মৈত্রের রিপোর্টটি ছাপা হয়,[৬০] যার বিষয়বস্তু পাঠ

৫৯। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতদের যুক্তিতর্ক যে কোন্ স্তরে নামতে পারে তা' নারায়ণ সান্যাল রচিত 'নেতাজী রহস্য সন্ধানে' পাঠ করে সুরেশ চন্দ্র বসুর চিঠির উত্তরে জহরলালজীর পত্রের বয়ানে পরিস্ফুট হয়েছে। নারায়ণ সান্যালের বহু গবেষণার ফল এই অপূর্ব সৃষ্টিটি পড়লে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ১নং চরিত্রটির পূর্ণরূপ দেখতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি বোধহয় প্রথম নম্বর, প্রধান মন্ত্রী তার পরে কিন্তু এদেশের প্রেসিডেন্টরা তো নাড়ুগোপাল, তাই প্রধানমন্ত্রীকেই ১নং বললাম। সান্যাল মহাশয়ের অপূর্ব গবেষণার গ্রন্থটি প্রতিটি বাঙ্গালীর অবশ্য পঠিতব্য। বস্তুতঃ নাম জানবার পরেও এ বই না পড়া অমার্জনীয় অপরাধ।

এখানে অবশ্যই স্বীকার্য যে উপরোক্ত প্যারাগ্রাফটির প্রায় সবটাই নারায়ণ বাবুর গ্রন্থের সাহায্যে লেখা।

৬০। সুরেশ চন্দ্র বসু পরে নিজব্যয়ে Dissentient report বের করেন।

করলে একজন শিশুর পক্ষেও হাসি সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে ওঁদের পাণ্ডিত্য দেখে। সুরেশ চন্দ্র বসুর চিঠির উত্তরে জহরলাল যা' লিখেছিলেন তাতে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মানসিক চেহারাটা পুরোপুরি চেনা যায়। নেতাজী সত্যিই মৃত একথা সরকারী ফাইলে লিপিবদ্ধ করতে পারার পরে জীবনের শেষ ৮টি বছর হয়ত স্বস্তিতে কেটে থাকবে (পুরোপুরি স্বস্তি এসেছিল তো, নাকি নতুন অস্বস্তি মনে দানা বেঁধেছিল ?)। প্রসঙ্গতঃ, এই জহরলালকে সুভাষচন্দ্র বড়ভাইয়ের সম্মান দিতেন। যারা খবর রাখেন তারা জানেন শাওনাওয়াজ রিপোর্টটি তথ্যসমৃদ্ধ নয়। সে রিপোর্টটি বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়াতে বছরের পর বছর ধরে এজিটেশন হতে থাকে। বাধ্য হয়ে জহরলাল-দুহিতা অধুনা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রায় ৪ বছর আগে (১১.৭.৭০) খোসলা কমিশন বসিয়েছেন। বহু প্রমাণ এই ২৫।২৯ বছরে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে, খোসলা কমিশনের সদিচ্ছা (?) থাকলেও এতদিন পরে কতটা কি করতে পারবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ পুরোপুরিই আছে। একটা জিনিষ সময়মত করা আর অনেক পরে করার মধ্যে তফাৎ অনেক হয়ে যায়। গরম ভাত ও ঠাণ্ডা ভাত—দুইই ভাত, কিন্তু স্বাদে তফাৎ অনেক, গুণেও বটে। সে যাক, চল্লিশের দশকে ভুলাভাই দেশাই এর সাথে একসঙ্গে গাউন পরে এই জহরলালই লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকদের হয়ে বৃটিশ আদালতে দরবার করেছিলেন। তবে সেটা যে ব্যারিষ্টার সাহেবের নিছক নাম বাড়াবার আকাঙ্খায়, সে কথা আই. এন. এর সৈনিক ও তার সর্বাধিনায়কের প্রতি তাঁর পরবর্ত্তী কালের ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমান করা গিয়েছে। আই. এন. এর সৈনিকরা ভারত সরকারের কাছে সৈনিক হিসাবে স্বীকৃতি কোন-দিনই পায়নি। 'দিল্লী চলো'[৬১] যিনি হাঁক দিয়েছিলেন দিল্লীর অধুনা কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্মদিবসে ছুটী ঘোষণা করে স্বাধীনতা

সংগ্রামে তাঁর কোন দান আছে একথা স্বীকারে অনিচ্ছুক। কংগ্রেসী নেতাদের কাছে তিনি প্রাদেশিক নেতা মাত্র, 'ভারতবর্ষের 'নেতাজী' নন।

আসুন, এই ডামাডোলের বাজারে এবার শিক্ষার জগৎটা একবার ঘুরে আসি।

১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে যখন হো-চি-মিন শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র ভিয়েতনামে শতকরা মাত্র দশজন নিজের নাম লিখতে পারতো। এক হাতে বন্দুক নিয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে রোখা আর এক হাতে বই নিয়ে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার মরণপণ নিয়ে গত তিন দশকের সংগ্রামের ফলে ভিয়েতনামকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মানুষকে তিনি মুক্ত করেছেন। আজ অথর্ব, চলৎশক্তি রহিত, অন্ধ ছাড়া ভিয়েতনামে একজন ও নিরক্ষর নাই, অর্থাৎ শতকরা ১০০ জনই শিক্ষিত। বড় সোজা কথা নয় এটি। এ জিনিষ ভারতের লোক হয়ে আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য বলে হেসে উড়িয়ে দেবার মত ঘটনা এটি একটি। কিন্তু ভিয়েতনামের ইতিহাস বলছে হো-চি-মিন ও তাঁর সুযোগ্য সহকারীরা এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। আর আসুন ভারতবর্ষে। ১৯৪৭ এ বৃটিশ এর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার হার ছিল যেখানে ১৬%, সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে দেশ-

৬১। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জঙ্গী গীত' –

'অব্ দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে
রোকেন হম কিসীকে রুকে হৈঁ ন রুকেংগে॥
ঝাণ্ডা তিরংগা লাল কিলে পৈ উড়াংযেগে
জয়হিন্দ্ কে নারোঁ সে ফলক কো হিলায়েংগে॥
... ...
চলো দিল্লী পুকারকে, কৌমী নিশান সাম্‌হালকে।'

প্রেমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দেশসেবার ফলে আজ মাত্র ৩০% লোক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। অর্থাৎ দুই যুগ সময়ের ও পরে শতকরা ৭০ জনের কোন ও অক্ষর পরিচয় ঘটেনি। সাতাশ বছরে ১৪% মানে হাফ পারসেণ্ট পার ইয়ার অর্থাৎ প্রতি দুই বছরে শতকরা একজন লোকের অক্ষরহীনতার অভিশাপ মুক্তি ঘটেছে। সত্যিই জ্ঞানী গুণীর দেশ, মন্দির মসজিদে ছয়লাপ দেশ, এই ভারতবর্ষের তুলনা নাই। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শান্তির নোবেল প্রাইজ প্রায়-পাওয়া দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের অতুলনীয় দেশপ্রেমের ও কর্মদক্ষতার পরিচয় বহন করে এই ছোট্ট ঘটনাটি সন্দেহ কিবা তায়! এই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভিন দেশের নেতা স্মরণ অপরাধে লেখকের ফিফথ কলামিষ্ট আখ্যা, অনেকেই দিতে পারেন কিন্তু সে আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করেই ভারত-নেতা গান্ধীজির সাথে ভিয়েতনাম-নেতা হো-চি-মিনের একটা তুলনা এই মুহূর্তেই করলে ক্ষতি কি? শিক্ষার ব্যাপারে হো-চি-মিনের মতামত শুনিয়ে আর কি হবে, কর্ম ও তার ফল সম্বন্ধে ধারণাই যখন ওপর থেকে পাওয়া যাচ্ছে—এবার মহাত্মাজীর ধারণাটা যাচাই করা যাক। ফল তো আগেই জানা হয়েছে, দুযুগ সময়ে গান্ধী ও গান্ধীবাদীদের দ্বারা ১৪% লোক নিরক্ষরতা মুক্তিপ্রাপ্ত। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তাঁর বইয়ে গান্ধীজির শিক্ষাসম্বন্ধে মতামত কি ছিল সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন— "রাসকিন তত্ত্ব—গান্ধীজি একবার বলেছিলেন: 'তোমাদের জানা উচিত আমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে কম পড়া লোক।'[৬২] (হরিজন, অক্টোবর ১, ১৯২৬)। আশ্চর্য হবার

৬২। এই কথাটিকে অনেকে 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি' ফরমূলায় ফেলে গান্ধীজির বিনয় দেখে শ্রদ্ধায় মুহ্যমান হতে পারেন, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ঘটনাটা ঠিক তার উল্টো। তাঁর মুখ দিয়ে সত্যি কথাটাই বেরিয়েছিল এটা তাঁর জীবনী ও কথাবার্তা (যেগুলোকে ওঁরা তাঁর বাণী বলে মনে করেন)

নাই। তিনি কৃষকের উল্লেখ করে একবার বলেছিলেন : 'তাকে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়ে তোমরা কি প্রস্তাব করতে চাও? তার সুখে কি তোমরা এক ইঞ্চি যোগ দিতে পারবে? তোমরা কি তার কুটিরটি কিম্বা তার ভাগ্যের বিষয়ে তার মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চাও? তা যদি চাও তাহলেও শিক্ষার প্রয়োজন হবে না।' (হিন্দ স্বরাজ, ১৯২২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৮)। কাজেই, তাঁর নিজেই, তাঁর নিজের, কোয়াসি-মেটাফিজিক্যাল আধা দার্শনিক কথাবার্তার পরিচর্চা ছাড়া তাঁর কোন পুস্তক পাঠ করা বা করতে উৎসাহিত করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁর যা পড়া ছিল তা' রাসকিনের 'আনটু দি লাষ্ট' নামক ভেক-অর্থনীতির জগাখিঁচুড়ি পুস্তকটি।" ১৯০৮ সনে আরো এক জায়গায় গান্ধীজি লিখেছিলেন "কৃষককে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়ে কি করতে চান? সে তো তার পিতামাতা, পত্নী, সন্তান সন্ততি ও নিজ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তা জানে"।[৮০]

লেখাজোখা বিচার করলে বোঝা যায়— শিক্ষায় অনাসক্তি জনিত অবিদ্যা ভর করে ছিল তাঁকে জীবনভোর। এইরকম সবজান্তা মনে কখনও শিক্ষা প্রবেশ করে না— কেননা এঁরা প্রবেশ পথ বন্ধ করে রাখেন জোর করে, কুসংস্কারাছন্ন হয়ে। দুর্ভাগা আমাদের, এঁদের মত লোকগুলোই আমাদের দেশটা চালাচ্ছেন এতকাল ধরে।

৬৩। 'Education, education, education alone! Travelling through many cities of Europe and observing in them the comforts and education of even the poor people, there was brought to my mind the state of our own poor people, and I used to shed tears. What made the difference? Education was the answer I got.' ('The Complete Works of Swami Vivekananda', Vol IV. Page—483)...

'The only service to be done for our lower classes is to give them education, *to develop their lost individuality*. Give them ideas — that is the only help they require, and

বলুন, কি বলবেন? শিক্ষা মানে স্থবিরতা নয়, শিক্ষা মানে আরো এগোবার অদম্য আকাঙ্খা। তা নাহলে অতবড় জ্ঞানী যে নিউটন তিনি বলতেন না 'জ্ঞানের সমুদ্র থেকে নুড়ি কুড়াচ্ছি'। গান্ধীজি নিজে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছিলেন, আইনজ্ঞ হয়েছিলেন অথচ জ্ঞান সম্বন্ধে এত অনীহা—তিনি তাঁর দেশের লোককে জ্ঞানদানে আগ্রহী নন। এটাকে মানসিক স্থবিরতা ছাড়া আর কি বলে! ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ, জনগণের একটি বৃহৎ অংশই (৮০%) কৃষক সম্প্রদায়ের লোক, অথচ তাদের শিক্ষিত করার কোন আগ্রহই ছিল না তাঁর। কৃষকদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ইংরেজী ভাষার সেই গ্যাকা গ্যাকা কথাটি হয়ত তাঁর মনে পড়েছিল—ignorance is bliss অর্থাৎ অজ্ঞানতা পরম সুখের কারণ। দেশের পক্ষে ইগনোরেন্স কিন্তু

then the rest must follow as the effect. Ours is to put the chemicals together, the crystallization comes in the law of nature. . .Now it the mountain does not come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain **If the poor boy cannot come to education, education must go to him**' (Vol. IV. P. 362-63) [আহা, কি অদ্ভুত চিন্তাধারা, কি সুন্দর কথা—জীবনে এত ভাল কথা আর কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না। মানুষের প্রতি কি অসামান্য দরদ! (আমরা গরীব মানুষ—শিক্ষার দ্বারে কাছে যেতে পারিনি না, কেউ শিক্ষাকে আমাদের কাছেও এনে দিল না, মহাত্মারা নিজেদেরই দেখল—তাই মূর্খই থাকলাম।] (মোটা হরফ গ্রন্থকারের)

হায় ভারতবর্ষ। তুমি কি দেখ নি নেতাজী-গুরু স্বামী বিবেকানন্দকে? তবে কেন ভুললে ঐসব 'মহাত্মা'দের কথা শুনে?

'Death is better than a vegetating ignorant life, it is better to die on the battle field than to live a life of defeat'. (Vol. VII. P. 232). (অজ্ঞানতা কোন সময়েই পরম সুখের কারণ নয়। **জ্ঞান, জ্ঞানই জীবন।—লেখক**) '...**Misery is caused by ignorance and nothing else**'. (Vol. VII. P. 498). (মোটা হরফ বর্তমান লেখকের)।

ব্লিস্‌ হয়নি। কৃষককে শিক্ষাদান করলে কৃষিকার্যের তা সহায়ক হবে, মানুষগুলো শিক্ষিত হলে তাঁদের উন্নতি হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশেরও উন্নতি ঘটবে কিন্তু জন-সচেতনতায় আগ্রহ ছিলনা দেশনেতার।

নিজের জ্ঞান বাড়াতে অনিচ্ছুক, অন্যান্য আর পাঁচটা দেশ বিশেষতঃ ১৯১৭ এর আগে ও পরের রাশিয়া সম্বন্ধে অনাসক্ত (নিরাসক্ত) দার্শনিকই হলেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা আর ব্যারিষ্টার মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সুপার-স্যাচুরেটেড মাইণ্ডের হেঁয়ালীবাদ আর খাম-খেয়ালীবাদকেই গান্ধীবাদ নাম দিয়ে তাঁর অনুগামী উত্তরসূরীরা গত দুই যুগে মূর্খের ভারতবর্ষ, দরিদ্রের ভারতবর্ষ, বেকারের ভারতবর্ষ তৈরী করলো।[৬৮] আশ্চর্য, দেশটা কি ক্লীবে ভরতি? দেশে কি একটিও লোক ছিল না? ছিলেন বটে একজন তবে তাঁকে ইনারা, কর্মবীরেরা, সব দল বেঁধে দেশ থেকে বের করে দিয়েছেন। বুঝুক ঠেলা এখন, একজনের অভাব যে কি ভীষণ বুঝুক তারা, বুঝুক দেশের মানুষ যারা অনায়াসে তাঁকে ভুলে থাকলো এতকাল। মহাত্মা গান্ধীর নেতিবাদই কংগ্রেসের ক্লীবত্বের কারণ। আর কংগ্রেসের এই ক্লীবত্বই আমাদের সামাজিক ক্লীবত্বের কারণ। কংগ্রেস, বড় পার্টি, বহু বছর

৬৮। পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ এই ভারতবর্ষ বেকারত্ব আর নিরক্ষরতাতেও ১নং পজিশন পেয়েছে। কি অস্বাভাবিক অবস্থা আজ দেশের। পশ্চিম বাংলায় বেকার ছেলেমেয়ের ছড়াছড়ি। Idle brains are the devils' workshops — কংগ্রেস দেশের পুরো যুবসমাজটাকে আজ অচেতন করে 'মেনড্রেক্স' আর 'রেসের মাঠে'র কবলে এনে ফেলেছে। বহু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা, যারা দু-পাঁচশ টাকা নেহাৎ বরাতগুণে উপার্জন করে, ২৫শে ডিসেম্বর আর ১লা জানুয়ারী (কোন কোন ১লা বৈশাখেও) উদ্‌যাপন করে পার্ক স্ট্রীটের হোটেলগুলোতে মদের গ্লাস সামনে নিয়ে—ডিমরালাইজেশন আজ এই স্টেজে এসে পৌঁছেছে। আয়রনী অব ফেট এই যে দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে এই ঘটনা ঘটে চলেছে।

ধরে দেশে আছে, তাই এদের ক্লীবত্ব দেশের সমাজের সার্বিকভাবে ক্লীবত্ব আনলো। যুক্তিবাদী সহজ চিন্তার মানুষ আমাদের সমাজে ভীষণভাবে কমেছে, এটাই কংগ্রেস রাজত্বের সফলতা। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, তাই দেশের শতকরা ৭০ জনেরই অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নীচে, মাসিক আয় কুড়ি টাকারও কম, তার মানে দৈনিক ১ টাকাও নয়। গ্রামের লোকেরা সীমাহীন দরিদ্রতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, শহরেও ইতর বিশেষ নয়। শতকরা ৭০ জনের হিসাব সেও তো ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসাব, গভর্ণমেন্ট সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য যে তথ্য যোজনা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহন ধাড়িয়া লোক-সভাতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ১৯-১১-৭৩ তারিখে, ১৯৭২ এর নির্বাচন কেরামতির পরে এতদিনে হয়ত আরও ৫ জনকে বাড়িয়ে ৭৫% করে ফেলেছেন ওঁরা।

যা বলছিলাম, ওঁরা অনেক কিছুতেই সফলকাম হয়েছেন। নিঃসন্দেহে কংগ্রেস— তা সংগঠনই হোক আর সবুজ বিপ্লবই[৬৫] হোক, আদিই হোক আর অস্তঃই হোক— একটি সফল প্রতিষ্ঠান অন্ততঃ এইদিক দিয়ে সফল যে তারা তাদের নেতাব মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন, করতে পেরেছেন। কংগ্রেস শিক্ষায় নৈরাজ্য[৬৬] আনতে পেরেছে এটা

৬৫। 'শ্বেত ও সবুজ বিপ্লবের জন্য আমরা লড়ছি, লড়বো'। (ছাত্র-পরিষদ— ওয়াল পোষ্টার)।

এখন অবুঝদের সবুজ বিপ্লব-পিরিয়ড চলছে, তবে খলে হাতে বাজারে গেলে চাল, ডাল, তেল, নুন কোনটারই আর নিজের রূপ ক্রেতারা দেখতে পান না, সব সামগ্রী এখন গ্রীণ রেভলিউশনের ফলশ্রুতি হিসেবে হরিদ্রাবর্ণ হয়ে সর্ষের ফুলের রূপ ধারণ করেছে তাদের দৃষ্টিতে।

৬৬। ১৯৬৯ এ সত্যপ্রিয় রায়ের শিক্ষামন্ত্রীত্বের সময় থেকে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বলতে শুনেছি যুক্তফ্রন্ট শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করছে।. বহু লোক, অন্ততঃ ৪ জনের মধ্যে ৩ জন তো বটেই, বলেছেন স্কুল কলেজে

তাদের সফলতা! মানুষের নিরক্ষরতার প্রত্যক্ষ ফল তাদের ফেভারে বহু বছর ধরে ভোটের বাক্সে পেয়েছে। ১৯৭৩ এর ২৮শে মার্চ কংগ্রেসী ছাত্র-পরিষদের নব্য-যুবারা এসপ্ল্যানেডে গণ অবস্থান করে 'শিক্ষা বাঁচাও কমিটি' বানিয়ে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন দাবী করে, সেই শিক্ষা যাকে ওরা টুকরো টুকরো করে জবাই করেছে এতদিন ধরে। সেই নব আর যুবদের সমাবেশ দেখে হাসি পেয়েছিল, অট্টহাস্য দিয়ে বলতে ইচ্ছা করেছিল— ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ কাঁচার দল, যারা তোমাদের মাঝে ঝুনো পাকা কংগ্রেসী আছেন, সেই সব প্রবীণ

পড়াশোনা কেমন করে হবে, শুধু রাজনীতি চলছে। বলবার সময় তারা কিন্তু বেমালুম ভুলে যান শিক্ষার জগতে ১৯৪৭ এর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পশ্চিম-বঙ্গকে দ্বাদশ স্থানে অবতরণ করিয়েছে কংগ্রেস সরকার শিক্ষাখাতে অবিশ্বাস্য রকম বরাদ্দ কমিয়ে, শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি (অ-রাজনীতি মানে অসুস্থ রাজনীতি) এতকাল ধরে তারাই করেছে। যুক্তফ্রন্টের সময় শিক্ষা জিনিসটাকে ঠিক পথে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল প্রদেশের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে। কিন্তু তা সুপার-স্যাচুরেটেড মধ্যবিত্ত বাবুদের মধ্যে অনেকেরই ভালো লাগেনি। স্কুল কলেজে রাজনীতি সম্বন্ধে কটাক্ষ যখন করেন, ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয় বলে যে ঢালাও ভারডিক্ট দিয়ে দেন তখন উদোর পিণ্ডিটা বুদোরই ঘাড়ে চাপিয়ে বসে থাকেন গ্যাট হয়ে। বাঙালীদের বেশীর ভাগ ঘরেই এই অবস্থা। মধ্যবিত্ত বাবুরা যদি একটু চোখ তুলে চেয়ে দেখতেন তবে বুঝতে পারতেন নোংরা রাজনীতি কারা করে, কারা করে আসছে এতকাল ধরে। মানুষকে যারা ভয় করে, তারাই তো তাদের শিক্ষিত করে তুলতে ভয় পায়। মানুষের নিরক্ষরতার প্রত্যক্ষ ফল তো কংগ্রেস বহু বছর ধরে ভোটের বাক্সে তাদের ফেভারে তুলছে। তাই আবার বলি, কংগ্রেস এ রাজ্যে, এ রাজ্যেই বা কেন সারা ভারতবর্ষে শিক্ষায় নৈরাশ্য এনেছে। এই অসুস্থ রাজনীতির মোকাবিলা জনসাধারণকেই করতে হবে সুস্থ রাজনীতি দিয়ে। লাইন অফ অ্যাকশন তখনই ঠিক হতে পারে যখন কনসেপশনটা ক্লিয়ার থাকে। কংগ্রেসের দেওয়া শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের কি স্বচ্ছ জ্ঞানটা আসবে?

শিক্ষামন্ত্রী তা' কেন্দ্রেরই হোন আর পশ্চিমবঙ্গেরই হোন, কারোরই শিক্ষা বলতে কোন ধারণাই নাই, আগ্রহ নাই জন্য তাই মূলই বল আর আমূলই বল শিক্ষার কোন পরিবর্তনই ওদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, ঘা ওদের যতই মারো ওদের মস্তিষ্ক থেকে কোন ঘৃতই বের হবে না, কেননা তাদের বাপুজি তাদের সুপার স্যাচুরেটেড মন তৈরী করে দিয়ে গিয়েছেন, সে মনে অন্যান্য অনেক জিনিসের মতই শিক্ষার দাগও কাটেনা। হায়ার সেকেণ্ডারী কোর্সই বল আর স্কুল ফাইন্যালই বল, উঠল বাই তো কটক যাই এর মতন, যখন খেয়াল চাপবে তখনই পালটাতে পারে কিন্তু কোনটার সম্পর্কেই ছিঁটে ফোঁটা ধারণাও নাই। পনের বছর আগে দেশকে উপহার দিল অভিনব হায়ার সেকেণ্ডারী আর প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স, যার না ছিল মাথা না মুণ্ডু। কবন্ধ নিয়ে আর কতদিন চলা যায়, তাই এখন আবার ব্যাক টু ওলড সিস্টেম। তবে তাতেও একই অবস্থা, নতুন এস. এফ. কোর্সের সিলেবাসের ও কোন হেড ও নাই টেলও নাই।[৬৭] আজ শিক্ষা জগতে যে ডামাডোল, পশ্চিমবঙ্গ সমেত সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী গণ টোকাটুকি আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মারামারি, একটু সুস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এর মূলে কিন্তু সেই এক নম্বর বৃক্ষটি, যাঁর ছায়ায় বসে ওরা সকলে আবোল-তাবোল করেছে। অশিক্ষা আনয়নে ওরা সকলকামী, যে শিক্ষার কথা ওদের মাথায় ঢুকলো না এতকালেও, তার সংস্কার করবে? শিক্ষা সংহার কর্তারা বাঁচাবে শিক্ষাকে? শিক্ষার সংস্কার হবে, নিশ্চয়ই হবে, তবে তা' করবে অন্য মানুষে, ওরা নয়। সংহারকারীরা কখনও প্রাণ দিতে পারে না, যে শিক্ষাব্যবস্থা ওরা পুরোপুরি নষ্ট করেছে তাকে বাঁচানো ওদের কর্ম নয়।

৬৭। 'স্কুল-ফাইন্যালের ভুষলুকি কোর্সের পরিবর্তণ চাই'। (এস. এফ. আই— দেওয়াল লিখন)।

যাক, ভাবপ্রবণতা থাক। এবার আপনাদের রবীন্দ্রনাথ শোনাই। কি বলছেন, সুভাষচন্দ্র, তাঁর কথা? তাঁর কথা তো শোনাবই। হে পাঠক, তাঁর কাছে যে আমি কমিটেড, তাঁর প্রতি আমি যে ডিভোটেড্। তাঁর কথা শোনাব বলেই তো এত কথা কাঁদছি। তবে তাঁর কথা সর্বশেষে শোনাব যাতে তাঁর কথার সুর আমার—আপনার কানে সর্বসময় বাজতে থাকে। আসুন, এখন রবীন্দ্রনাথ শোনাই। রবীন্দ্রনাথ—সুভাষচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথ—বাংলার রবীন্দ্রনাথ—বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ, যিনি জাতির দুঃসময়ে[৬৮] বীরেন্দ্র বরণ করে বলেছিলেন 'সুভাষচন্দ্র, বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।·· তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।...দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চরিত্র শক্তিই বাঙলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।......সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য তার আসন প্রস্তুত।...বাঙালীর

৬৮। গান্ধী-জহরলালের চরম অবিবেচনা ও অত্যাচারের সময়ে— মে, ১৯৩৯ এ।

সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব পদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তি স্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ। আমি আজ তোমাকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্র নেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহবান করি তোমার পার্শ্বে সমগ্র দেশকে।'

রামমোহন জনশিক্ষায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। দেশবাসীকে গণিত, পদার্থবিদ্যা, কেমিষ্ট্রি, অ্যাস্ট্রনমি প্রভৃতি বিজ্ঞান শেখানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গান্ধীজি কিন্তু রামমোহনকে 'পিগমি' (বামন অবতার) মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলেছিলেন '**I strongly protest against Mahatma Gandhiji's depreciation of such great personalities of modern India as Rammohon Roy in his zeal for declaiming against our modern education.**' গান্ধী সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার বলেন 'আমাদের নীতিগত মূল ভিত্তি এবং মেজাজের পার্থক্য এই অবস্থা নির্ধারিত করে দিয়েছে যে তিনি যেখানে রামমোহন রায়কে বামন ভাবেন, আমি সেখানে রামমোহনকে দেখি এক বিরাট ও বিশাল ব্যক্তিত্ব।' বটেই তো! রামমোহন তাঁর পাকা ধানে মই দিয়েছিলেন, তিনি যে ইংরেজী শিখেছিলেন আর সাধারণ মানুষকে শেখাতে চেয়েছিলেন তাই মহাত্মার কাছে হলেন 'পিগমী'।[৬৯] তা বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার

৬৯। "ইংরাজী শিক্ষার অপরাধে রামমোহন, তিলক প্রমুখ যাঁরা...ইউরোপীয়ান বিজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত তাঁরা তাঁর কাছে হলেন 'পিগমী'। গান্ধীজি নিজে ও তাঁর শিষ্যরা বলেছেন, এঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করতেন না। গান্ধীজি সেজন্যই ওকথা বলেছেন। রামমোহনের এতগুলি বাংলা লেখা সত্বেও তাঁর সম্বন্ধে এ অভিযোগ কি করে ওঠে তার কোনও সদুত্তর কেউ দেননি।" "গান্ধীজির 'হিন্দ স্বরাজ' পুস্তকটি সমগ্রভাবেই আধুনিক সভ্যতা তথা 'পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধ সংগ্রামে'। এই যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম

সাহেব কোন্ ভাষায় পড়েছিলেন ব্যারিষ্টারি—গুজরাটিতে কি? এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে থাকা যাচ্ছেনা, ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক এই ভদ্রলোকটি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন 'বিলাস বহুল রমণী।'[৭০] সুভাষচন্দ্র 'স্পয়লট্ চাইল্ড' বখাটে ছেলে হলেও তাঁর আত্মাত্মিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর বক্তব্যটা কিন্তু জানা যায় নি।[৭১] একদা টেররিষ্ট (সন্ত্রাসবাদী) বারীণ ঘোষ

যুক্তিই হচ্ছে— 'ভারতের কারও কাছে কিছু শেখার নেই"। (সৈয়দ শাহেদুল্লাহ—'লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ' পৃঃ ৮৩)। রবীন্দ্রনাথ ৮ই মার্চ ১৯২১ এ শিকাগো থেকে শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে লেখেন : '...যেদিন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজী পড়া বন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি, আমাদের দেশে দেওয়াল গাঁথা সুরু হয়েছে'।

রামমোহন শিখেছিলেন রাজভাষা কিন্তু তা শেখাতে চেয়েছিলেন রাজার প্রজাদের, জনসাধারণকে, এটা অপরাধ বই কি! ব্রিটিশ রাজভক্তের রামমোহনের প্রতি নারাজ হওয়ার বিলক্ষণ কারণ ছিল।

৭০। 'একটি বিলাস বহুল জীবনে অভ্যস্ত অস্থিরচিত্ত (volatile) রমণী'। (আমি সুভাষ বলছি, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪০৪)। হায়রে স্থির'চত্ত পুরুষ, তোমার খুরে দণ্ডবৎ!

৭১। হঠাৎ চোখে পড়ল : 'I have gone through his' (Swami Vivekananda's) 'works very thoroughly, and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousandfold'— Mahatma Gandhi. আরো আছে : 'স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগের অনুপ্রেরণা লাভের জন্য স্বামিজীর উদ্দিপনাময়ী বাণীর নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছি।' (মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ, বেলুড় মঠ)। স্বামিজী ভাগ্যবান, মহাত্মাজীর প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন দেখছি।

ঋষি অরবিন্দ ও অনুরূপভাবে তাহলে পেয়ে থাকতে পারেন! তবে 'Life of Sri Ramkrishna' গ্রন্থের 'Foreword' মহাত্মা গান্ধীই

ঋষি অরবিন্দ হয়ে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম বানিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছিলেন ১৯০৫ সন হতে। তা' অরবিন্দ সম্বন্ধেও অহিংসার পূজারীর মতামতটা জানতে পারিনি বহু নথিপত্র ঘেঁটেও। তবে কৌতুকপ্রদ হলেও ঘটনাটি সত্য যে মহান বিপ্লবী লেনিন সম্বন্ধেও তাঁর একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল। ১৯২৪এ লেনিনের মৃত্যু-দিবসে বেলগাঁও কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়ার কথা উঠলে তিনি বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের স্রষ্টা লেনিনকে একজন 'উপদ্রবকারী' বলে অভিহিত করেছিলেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, সত্তরের দশকে এসে লেনিন জন্মশতবার্ষিকীতে ২২. ৪. ৭০. এ তাঁরই দলীয় লোকেরা, মুক্তির দশকে পরিণত করবার আকাঙ্খীরা,[১২] তাঁকে লেনিনের

লিখেছিলেন দেখা যাচ্ছে। তাতে নিশ্চয় অনেক ভালো ভালো কথা, জ্ঞান-গরিমার কথা লিখে থাকবেন। তা বেশ!

রামকৃষ্ণদেব-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথায় হঠাৎ চোখে আটকে গেল— 'If you really want to judge of the character of a man, look not at his great performances. Every fool may become a hero at one time or another. Watch a man do his most common actions, those are indeed things which will tell you the real character of a great man. Great occassions rouse even the lowest of human beings to some kind of greatness, but he alone is the really great man whose character is great always, the same wherever he be'. . Vol. I. Page 29. না, লেখকের কোন বক্তব্য নেই!

১২। 'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন' সি. পি. আই. (এম. এল) এর দেওয়াল লিখন ১৯৭১ এর পরে একটু পালটিয়েছিল, আই. (এম. এল) মুছে গিয়ে শুধু সি. পি হয়েছিল। খুঁজলে আশে পাশের দেওয়ালে সে লিখন আজও দেখতে পাওয়া যাবে, তবে সি. পি. আই. (এম. এল) দের 'যুগ যুগ জিও' স্লোগানটা ঠিক মত রাখলেও 'সত্তরের দশকের' স্লোগানটি কিন্তু ইদানীং কালে কোনও দেওয়ালে লিখতে দেখা যাচ্ছে না।

সঙ্গে তুলনা করেন। লেনিনকে নামাবার ক্ষমতা তো তাদের নেই, তবে তাদের বাপুজীকে বিপ্লবীর সঙ্গে এক আসনে উঠিয়ে বসিয়ে হয়ত বা ওরা একটু আনন্দ পেতে চান আর নিজেদেরও বিপ্লবী বিপ্লবী ভাবতে পারেন মহাত্মাজীর উত্তরস্মূরী হিসাবে।

সিস্‌টার নিবেদিতা প্রসঙ্গটা নিয়ে দু-চার কথায় একটু আলাপ আলোচনা করতে মন চাচ্ছে। 'যুগাচার্য' স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা-শিষ্যা যিনি নিজেকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা' বলে মনে করতেন সেই ভগিনী নিবেদিতা এই ধরাধাম হতে তিরোহিত হন ১৩ই অক্টোবর ১৯১১এ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আয়ার্ল্যাণ্ডের টাইরন্‌ প্রদেশের ডানগ্যানন নামক ক্ষুদ্র সহরে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্‌ নাম নিয়ে। গান্ধীজি জন্মেছিলেন ১৮৬৯এ, তিরোধান তাঁর ১৯৪৮ এর ৩০শে জানুয়ারীতে। ফলে দেখা যাচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা ও গান্ধীজি সমসাময়িক ছিলেন, বয়সের দিক থেকে খুবই কাছাকাছি ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জগৎবিখ্যাত শিষ্যার লেখা বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি একজন শিক্ষিত লোক হিসাবে এবং বিশেষতঃ একজন ধার্মিক হিসাবে তিনি সে সময়েই পড়ে থাকবেন এটা আশা করা অতএব অন্যায় নয়। নিবেদিতা তো তো আর লেনিন নন অথবা তাঁর অনুগামিনীও নন, রাজনীতির ক্যাচকেচি গ্রাস করেনি তাঁকে অতএব নিবেদিতার ১৯০৫এ অথবা তার কাছাকাছি লেখা The Master as I saw Him ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি') Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে') প্রভৃতি ধর্ম ঘেঁষা বই তো সাধারণ স্বভাবজাত আগ্রহ থেকেই ধার্মিকপ্রবর মহাত্মার পড়ে থাকবার কথা। নিবেদিতা লিখেছিলেন অনেকগুলি বই, তাছাড়া অসংখ্য প্রবন্ধ ও তিনি লেখেন বিভিন্ন পত্রিকায়, ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রায় সকল ইংরেজী মাসিক ও দৈনিক পত্রিকাতেই তাঁর লেখা বের হতো। পাশ্চাত্যের বহু পত্রিকাতেও

তিনি লিখতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজায়গায় বলেন 'নিবেদিতার ধর্মবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব এবং চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল। এই সকল বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।...তিনি...খুব স্পষ্টভাষায় কঠোর সত্য লিখিতেন'। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ টি. কে. চেইন 'হির্বার্ট জার্নাল' পত্রিকায় নিবেদিতার একটি বই সম্বন্ধে লেখেন 'শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে এই পুস্তকখানিকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।' ১৯০৬ এর পরে ভগিনী নিবেদিতা **Indian Nationality** (ভারতীয় জাতীয়তা), **Footfalls of Indian History** (ভারতীয় ইতিহাসের পদক্ষেপ), **Education** (শিক্ষা), **Indian Studies** (ভারত পর্যবেক্ষণ) প্রভৃতি বইগুলো লেখেন। সেগুলো লেখবার পরও তাদের লেখিকা একজন 'বিলাস বহুল রমণী' মাত্র ছিলেন মহাত্মার কাছে! নাকি তাঁর নিজের কথাটাই ঠিক 'আমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে কম পড়া লোক।' আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে সাধারণ অজ্ঞানীর কথাবার্তা একটু আধটু উল্টোপাল্টা হয়ই, তবে 'অসাধারণ'দের কথা বলা দুষ্কর। নিবেদিতার লেখা বইগুলি হয়ত না পড়েই, পড়বার কোন আগ্রহ না রেখে তাঁকে বিন্দুমাত্র যাচাই না করেই অম্লানবদনে বলে দিলেন অতবড় কথাটা: বিলাস বহুল রমণী! বলাই বাহুল্য, বইগুলি পড়ে থাকলে ভাবধারা ইতরবিশেষ হবার সম্ভাবনা থাকতো।

তারপর, গান্ধীজি যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে বলছেন .. 'উচ্চশিক্ষার কথাই ধরুন। আমি ভূগোল, অ্যাষ্ট্রনমি, অ্যালজেব্রা, জ্যামিতি ইত্যাদি শিখেছি। তাতে কি ফল হয়েছে? তাতে কিভাবে আমি নিজেকে বা আমার চারপাশের মানুষকে উপকৃত করেছি? এগুলো আমি কেন শিখেছি [১৩]?' সেখানে রবীন্দ্রনাথের

১৩। ভাবতেও লজ্জা হয়, এই স্থবিরই আমাদের দেশের কর্ণধার ছিলেন (কর্ণধারই বটে, কান ধরে এবং ধরিয়ে উঠবোস বেশ করালেন দেশের তামাম

উক্তি 'যদি ইউরোপ কর্তৃক বিজ্ঞান চর্চ্চার কোন বৈশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান মানুষকে প্রকৃতির আউটরেজ থেকে উদ্ধার করে, মানুষকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করার জন্য। একটা জিনিস সুনিশ্চিত। যে সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য আমাদের দেশের উপর চেপে বসেছে বিজ্ঞানকে হতগ্রাহ্য করে সে দারিদ্রকে[৭৪] অপসারণ করা যায় না। মানুষের জানার ব্যাপারটা যাবে থেমে অথচ তার কাজ চলবে চিরকাল এরূপ অসম্মানজনক পীড়নমূলক শ্রম আর কিছু হতে পারে না।' দুটো মনের গঠনে কত তফাৎ! ঐ কয়টি লাইন দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ পরিচয় দিয়েছেন মানুষের প্রতি কি পরিমাণ দরদ তাঁর, আর তাদের শিক্ষিত করে তুলবার জন্য কি ব্যাকুলতা! শিক্ষিত মন বলতে বিশ্বকবির এই সজীব মনকেই বোঝায়। আর অশিক্ষিত মন বলতে কার মনকে বোঝায়? নিজমুখে নামটা আর নেব না, ছোট মুখে বড় কথা বলার চার্জ এনে আমার মধ্যে হয়ত

লোককে, যোগ্য শিষ্যরাও তাই করাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে হঠাৎ একটি কথা মনে এল। ক্যাসাবিয়াঙ্কার পিতৃভক্তির খ্যাতি আছে— পিতার আদেশ মাত্র করে সেই অল্প বয়সী বালক প্রাণ দিয়েছিলেন, পিতা না ফেরা পর্যন্ত যথাস্থানে অবস্থানের আদেশ ছিল তাঁর উপর, পিতা ফেরেন নি ফলে জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান অবস্থাতেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণবিয়োগ হয় তাঁর। ভারতবাসী আর বঙ্গবাসীরা তো সকলেই আদর্শবাদের ধ্বজাধারী, তাই হয়ত সন্তানেরা তাদের বাপুজীর হস্তকর্ষিত অথবা স্বহস্তকর্ষিত কর্ণধারণ করেই জীবন ধারণ করে চলেছেন। পিতৃভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা আর কি! পিতৃভক্ত ক্যাসাবিয়াঙ্কাতে দেশটা যেন একেবারে ভর্তি!)

৭৪। রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত উক্তির পর চার যুগ সময় কেটেছে তার মধ্যে দেশীয় শাসন চলছে দু'যুগেরও ওপর, অথচ দারিদ্র্য হটেনি বরংচ 'গরীবি হটানো'র গালগপ্প দিয়ে মানুষকে দারিদ্রের শেষ সীমায় এনে ফেলেছে শাসক-শোষকেরা। পৃথিবীর বৃহত্তম হা-ভাতে দেশের ইতিহাস সত্যিই অত্যন্ত লজ্জার এবং দুঃখের।

ঔদ্ধত্য খুঁজবেন জ্ঞানীগুণীরা! প্রশ্ন করবেন না, অপ্রিয় সত্যভাষ্য অনেকেই পছন্দ করেন না। তবে আমি তাঁবেই বলি....আমি তাঁরেই বলি...। হে বন্ধু করিবেন ক্ষমা, অবাধ্য এই রসনাকে।

১৯৩০ এ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি কথিত 'উপদ্রবকারী' লেনিনের গড়ে তোলা দেশ রাশিয়াতে গিয়েছিলেন। ১৯১৭ এর আগে জার-শাসিত দেশে শতকরা দশজন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক ছিল, অশিক্ষা কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতায় বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের চেয়ে তারা এগিয়ে ছিল না। কিন্তু মাত্র ১২ বছর পরে গিয়ে সে দেশ দেখে তিনি বলেছিলেন "রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা' কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সবপ্রথমে মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। ..হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ। ...এই যে বিপ্লবটা[৭৫] ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল।[৭৬] আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। খ্যাত অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে; সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা

৭৫। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব।

৭৬। ভারতবর্ষের অবস্থাও অনুরূপ। অনেক কাল ধরেই ঘটবে বলে অপেক্ষা করছে অথচ ঘটছে না; যে কোন দিন ঘটবে। বহু সচেতন লোকই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, প্রহর গুণছে— কবে হবে, কেমন করে হবে, হলে তার পরিণতি কোনরূপ নেবে এ সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও।

বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।" ১৫৪ পৃষ্ঠার বই 'রাশিয়ার চিঠির প্রতি ছত্র প্রমাণ দেয় শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকুল আগ্রহ সম্বন্ধে। অত অল্প সময়ের মধ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং শিক্ষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাই যে রাশিয়ানদের এই অসামান্য উন্নতির প্রধান কারণ তা বারে বারে বলেছেন। "এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই' পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' ৭৭ এ না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল। আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ়ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়, এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা-কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ী চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম. এ পাশ করবার মতন নয়।" ৭০ বছর বয়সের পরিণত মন আর অশক্ত শরীর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তীর্থদর্শন' করেছিলেন। মহাতীর্থ কালীঘাটের অন্দরে অবস্থিত 'সদাজাগ্রতা শক্তিময়ী'র রূপ-দর্শন করে অভিভূত হবার সাথে সাথে আশেপাশের পাণ্ডারাও তাঁর দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করে থাকবে, তাদের বিচ্যুতিও তাঁর চোখ এড়াবার কথা

৭৭। 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' নাম দিয়ে পৃথক একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে পরবর্তী পৃষ্ঠায়।

নয়। সতেরো বছর বয়সের ছেলের উচ্ছ্বাসভরা বিদেশ-দর্শন ডেস্‌ক্রিপশন নয়, আরও তিপ্পান্ন বছর এগিয়ে যাওয়া মন নিয়ে দেখা-লেখা রাশিয়ার চিঠিগুলি।

পরিণত বয়স হলেও কবিসুলভ উচ্ছ্বাস আছে সন্দেহ নাই তবু তাদের ঠিক মত বোঝবার প্রয়াস আছে সমাজ-সংস্কার-আকাঙ্খী মানব-দরদী দেশপ্রেমিকের ঐ পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে। রাশিয়া যেমন তাঁর মনে ধরেছিল, তেমনি সেখানকার অনেক অনেক জিনিস তিনি পছন্দ ও করেন নি। রাশিয়ার যে তীব্র সমালোচনা তিনি করেছিলেন, তাতে যুক্তির স্পষ্টতা ছিল, হেঁয়ালীবাদ সেখানে ছিল না। কে জানে, আজকের ক্রুশ্চভ-ব্রেজনেভ কোসিগিনের রাশিয়ার ভবিষৎ-বিচ্যুতির কারণ হয়ত তাঁর চোখে সেদিনই ধরা পড়েছিল—লেনিনবাদীদের মধ্যে সংশোধনবাদীদের অভ্যুত্থানের অঙ্কুরের গন্ধ হয়ত তিনি তখনই পেয়েছিলেন।[৭৮] রাজনীতিবিদ হলে যে ভাষায় লিখতেন, তা থেকে তাঁর ডেস্‌ক্রিপশনের ভাষা অন্যরকম ছিল এইমাত্র। সে যাক্, সে অন্য কথা। দেশটা ঘুরেছেন আর অবাক হয়েছেন তাদের শিক্ষা-দরদ দেখে। তাই তিনি বলেন "এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ আমাদের থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি করে। ...১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে

৭৮। এখানে হয়ত অনেকে বলতে পারেন লেনিনবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। সেই বিতর্কমূলক কথায় আপাততঃ যাচ্ছি না। রবীন্দ্রনাথ যতদূর পর্যন্ত স্পষ্ট ততদূরই যাচ্ছি, তাঁর অস্পষ্টতাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করবার স্থান এটা নয়।

তুলেছে। তার কারণ, এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো। পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোন প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনদিন জানতে চাইতে শেখেনি—প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।" বিশ্বকবির স্বদেশবাসী মহাত্মা গান্ধীর কাছে কিছু অবলিগেশন ছিল, ব্রতী বালক-বালিকাদের জন্য আদর্শ শান্তিনিকেতন গড়বার আকাঙ্খায় তিনি বহুজনের কাছ থেকেই অর্থসাহায্য নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে যেমন অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন তেমনি বেশ কিছু টাকা তুলেছিলেন গান্ধী-সহায়তায় গুজরাট থেকেও। তা সত্বেও কাব-মনে গান্ধী-অসঙ্গতি মাঝে মাঝেই যে তুফান তুলেছে, তা বহু ঘটনা দ্বারাই প্রমাণ হয়েছে। সুদূর রাশিয়াতে গিয়েও এদেশের কথা মনে কর্বার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে পড়েছে সেই অনেক-শিক্ষিত কম্যাণ্ডারের কথা যাঁর কাছে 'Entire intellect of the Congress' (and therefore the whole of the country—তাই তো কবির এত ব্যাকুলতা) 'has been mortgaged' তাই রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলেন "আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজির ছাত্রেরা ছিল তখন 'একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে

পারুল-বনে বেড়াতে ইচ্ছে কর কি। সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কিনা আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানিনে। অর্থাৎ এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু করবার চর্চাই করে না—তাকে চালনা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না। এরকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসারতা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না" ইত্যাদি ইত্যাদি। যে বাচাল এবং বধির [১৯] নেতা 'আমার জীবনই আমার বাণী' বলে তাঁর জীবনের

১৯। হে পাঠক, কথাটি রাইট স্পিরিটে নেবেন, লেখককে বাচালতা দোষে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। যুক্তি দিয়ে যাচাই করার পর 'জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা'কে আজ এর চেয়ে বেশী কম্‌প্লিমেণ্ট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাচাল তারেই বলে যিনি কথা বলেন বেশী যার একটা বড় অংশ অসঙ্গতিপূর্ণ, বধির বলে তাকে, যিনি অন্যের কথা শুনতে পান না। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধীজি কার কথা কোন্ দিন শুনেছেন? জালিয়ানওয়ালাবাগের নরমেধ যজ্ঞের সময় মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ কারও কথাই শোনেন নি—নিজের মনগড়া কথাই তাঁর বড় হয়েছিল অতগুলো প্রাণের দামের চেয়ে। ['সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' একথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর সারা জীবনের কাজ দিয়ে প্রমাণ করেছেন কথায় কাজে ফাঁকি তাঁর ছিল না. বলেছিলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীরা, করেও ছিলেন সেইমত কাজ, সুভাষচন্দ্রও একই ভাবের শরিক। গান্ধীর কথাবার্তা যাই হোক, জালিয়ানওয়ালাবাগের সময়ের তাঁর কার্যকলাপ থেকে কিন্তু মনুষ্যপ্রীতির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কে জানে, অহিংসার সত্যিকারের মানেটা কি? 'সত্যকে নিয়ে গবেষণাকারী' (Ref: 'My Experiments with Truth'— M. K. Gandhi) কোন্ সত্যে সেদিন উপনীত হয়েছিলেন সেকথা জানতেও বড় কৌতূহল হয়। সত্য অনেক সময়েই অপ্রিয় হয় এ জানি, কিন্তু ইংরেজী 'ট্রুথ' যে এত 'ব্রুট' হয় তা জানা ছিল না। 'সত্যমেব জয়তে' কথাটাকে নিয়ে কার্স করা অতএব ওঁদের পক্ষেই

ভগ্নাংশ এবং বাক-চাতুর্যের অনেকাংশ সামনে রেখে কংগ্রেস পরিচালনা কর্লেন তাঁর সঠিক মত কি পথই বা কোন্‌টা তা কোনদিন না বুঝিয়ে, না বুঝতে দিয়ে যে 'মাথা নাড়ে, কথা কয়' কলের পুতুলগুলো তৈরী করেছিলেন, তারাই তো নিজেদের গান্ধীবাদী বলে পরিচয় দিয়ে এই ক্লীব সমাজে প্রতিষ্ঠা নিলেন। সন্দেহ কি, এর দ্বারা আমাদের মত সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন অর্ধশিক্ষিত অথচ শিক্ষাগরবী সব কিছুতেই 'জানি জানি' মনোভাবাপন্ন জরদ্গবদের এতকাল ধরে বিভ্রান্ত করে রাখা গেল। অসহযোগ আন্দোলনটা কি জিনিস, অনশন-আন্দোলনটাই বা কাকে বলে, কি তার এম্‌ইম্‌প্লিকেশনটাই বা কেমন করে, কি এদের সফলতা, ব্যর্থ হলে কেমন করে সেই ব্যর্থতাকে সফলতার জন্য রি-অ্যাপ্লাই করা যাবে মডিফিকেশন করে, সম্ভব]। ১৯৩৯ এ সুভাষচন্দ্রের কথা শুনেছিলেন তিনি? রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার চিঠিগুলোর ভাষা বুঝতে চেয়েছিলেন কি? (বধির দৃষ্টিহীনও ছিলেন নচেৎ অত স্বচ্ছ চরিত্রগুলি তিনি দেখতে পেতেন, বুঝতে পারতেন তাঁদের)। অন্যের কথা তার কানে পৌঁছতো না, তাঁর নিজের কথাটাই একমাত্র কথা এটা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ তাঁর পুস্তকের ৭৬ পৃষ্ঠায়। "১৯২০ সালের ১৮ই মে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে লিখিত এক পত্রে 'হোমরুল লীগের' নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের সংগঠনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণের উল্লেখ করে তিনি বললেন: 'I have told them... I could only join an organization to affect its policy and not be affected by it. (আমি শুধু কোনও সংগঠনের নীতিকে প্রভাবান্বিত করার জন্যই তাতে যোগদান করতে পারি, ঐ সংগঠনের দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত করার জন্য নয়)।' অর্থাৎ আমি নিজে কোনও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা চরিত হব না; এমন কি অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ব, তাও নয়। আমি শুধু অন্য প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করতে পারব। এই সর্তেই কোনও প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারি।" (নীচে দাগ বর্তমান গ্রন্থকারের)

ইংরেজী সাহিত্যের সেই অপূর্ব কথাটি যেন এইসব 'মহাত্মা'দের জন্যই লেখা: They keep their lips open but eyes and ears closed.

না তিনি কখনও তা' মন খুলে বলেছেন, না তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বুঝেছেন। অসহযোগ মানে সহযোগিতা নয় এইমাত্র, স্থান কাল-পাত্র কোন কিছু বিবেচনা করার দরকার নাই—মনে এল করলেন, কাউকে বোঝাবার প্রয়োজন নাই আর সুপার-স্যাচুরেটেডরা তো সেই ছাত্রদের একজন যে 'স্বয়ং কোন বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না—তাকে চালনা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না' অতএব হঠাৎ মাঝপথে বিনা নোটিশে বিনা-পরামর্শে সেই তথাকথিত আন্দোলনটি প্রত্যাহার করে যখন নেন, তখনও সুপার স্যাচুরেটেডদের চোখের দৃষ্টি ঘোলাটেই থাকে, কর্মকর্তার এবংবিধ ডাইমেট্রিক্যালি অপোজিট বিহেভিয়ারে কোন প্রশ্নই সে দৃষ্টিতে থাকে না। নিরাসক্তি জনিত ঘোলাটে চোখ আন্দোলনের আগেও যা পরেও তাই। এই হাড় জিরজিরে দবিদ্র দেশের পরাধীন-কবি যতই স্বপ্নালু মন নিয়ে অর্ধশতাব্দী আগে 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' বলে গান ধরুন, 'বীরেন্দ্র সুভাষচন্দ্র' তাঁর শিক্ষক-কবির কবিতা মনের মধ্যে গ্রহণ করে, প্রাণের মধ্যে ধারণ করে পৃথিবী ব্যাপী যতই ছোটাছুটি করুন, ঐ সুপার-স্যাচুরে-টেড ও তাঁর ধ্বজাধারীরাই যে এই হতভাগা দেশের আসল ফোর্স, অতএব যা হবার তাই হয়েছে।

অবুঝ-অজ্ঞান জনগণকে মাঝে মাঝেই গান্ধীশিষ্যরা 'গান্ধীজি বলেছিলেন' বলে যে লেকচার ঝাড়েন মঞ্চ থেকে, তা' কিন্তু 'গান্ধীজি কি বলেছিলেন' [৮০] তা না বুঝেই। যতই বিজ্ঞানের বড় সার্টিফিকেট নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগ আলোকিত করে থাকুন,

৮০। গান্ধীজি কি বলেছিলেন তা বুঝলে আর তাঁরা গান্ধীবাদী থাকতে পারতেন না। গান্ধীবাদ তো বস্তুতঃ 'আকাশবাদ' মাত্র, মানুষের সাথে সম্পর্কহীন কথাগুচ্ছ যার সাথে মাটীর কোন সংযোগ নেই। গান্ধীবাদ মানে মায়াবাদ আর কি, কায়াহীন ছায়াবাদ!

১৯৬৭ তে পি. ডি. এফ চিফ মিনিষ্টার হবার সময় এই শিক্ষিত ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ কোন ন্যায় নীতি আর যুক্তির ধার ধারেন না কারণ কোন জিনিস সম্বন্ধেই ধারণা এঁর স্পষ্ট নয়। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখ (বাংলা কংগ্রেসী অবিভিন্যালী কংগ্রেসী পরবর্তী সময়ে পি.ডি.এফ দলভুক্ত এখন কি কে জানে) দল ভাঙ্গানো কুড়িটা পঁচিশটা এম.এল.এ নিয়ে বেমালুম ইনি সটাকে পড়ে গান্ধীজির নাম নিয়ে মিনিষ্ট্রি করেন রাতের অন্ধকারে। দেশের লোক বিশ্বাস করে যাঁকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করেন, যুক্তফ্রণ্টের ২১৮ জনের মধ্যে ৩৩ জনের দলের সেই অজয় মুখার্জী৮১ অনায়াসে মিনিষ্ট্রি ভেঙ্গে দেন অগণতান্ত্রিক উপায়ে গান্ধী ও গণতন্ত্রের নাম নিয়ে। এতবড় একটা দেশ যাদের হাতে পড়লো কত অস্বচ্ছ ও পুওর তাঁদের চিন্তাধারা!

বিশ্বকবি ১৯৩০ এ বলেছিলেন 'আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।' (পৃষ্ঠা ৫৮, রাশিয়ার চিঠি)। কবিগুরু নেই, তিনি থাকলে ৪৪ বছর পরেও দেখতে পেতেন তাঁর জন্মভূমির বুকের উপর থেকে অশিক্ষার জগদ্দল পাথরটা সরা তো দূরের কথা আয়তনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে দেশের লোক দারিদ্র্য জর্জরিত হয়ে পড়েছে—বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের চাপে ধুঁকছে আর বাঙ্গালী জাতি তো আরও। ৮০ কোটি লোকের দেশ চীনে একটিও ভিখারী নেই, কর্মক্ষম

৮১। এই ঘুমন্ত দেশে এত ঘটনার পরেও এই অজয় মুখার্জীদের দেশপ্রেমিক আখ্যায় খুব একটা ঘাটতি পড়ে না। 'বাংলার বিপ্লবী-বীর শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, দমদম-চিড়িয়ার মোড়ে নির্বিবাদে '১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৩' এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। হে নেতাজী, তুমি কি কেবলই ছবি?

একজন ও বেকার নেই। আর ৫৫ কোটি[৮২] মানুষের ভারতবর্ষ যেখানে ৩৩ কোটি দেবতা বিদ্যমান— প্রতি দুজন মানুষের সেফ-গার্ডের জন্য ১জন করে দেবতা—বিশেষত: ৪.৫ কোটি হতভাগ্য বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশটিতো আজ ভিখারীরই রাজ্য বস্তুতঃ বাঙ্গালীরা আজ একটি ভিখারীর জাতে পরিণত হয়েছে। ৫৫ কোটি লোকের মধ্যে ১৬ কোটি মাত্র চিঠি পত্র পড়া ও লেখার টেজে আছে। নিরক্ষর ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৯ কোটি, সারা পৃথিবীতে যত নিরক্ষর লোক আছে তার অর্ধেক এই ভারতের অধিবাসী। সার্থক গান্ধীবাদ আর গান্ধীবাদীরা—তাদের ধ্যান ধারণা ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই তো দেশটা পৃথিবীর বৃহত্তম নিরক্ষর দেশ হতে পেরেছে।

আমাদের বর্তমানের হতাশাময় ছন্নছাড়া জীবনে একমাত্র বিলাসিতা শিক্ষিত হওয়া অথবা হওয়ার আকাঙ্খা। পরাজয় তো বাঙ্গালী জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাই আর কিছু না হোক জ্ঞানী গুণী যেন লোকে বলে, আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শীর কাছে যেন এ ব্যাপারে একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি পাওয়া যায়, এ আকাঙ্খা আমাদের সকলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সরস্বতী প্রতিমা প্রতিটি বাঙ্গালী শিশুরই মন প্রথম আকর্ষণ করে, লক্ষ্মী ঠাকরুণ এমন কি মা দুর্গার চেয়েও। বলতে বলে 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী' কিন্তু তবুও লক্ষ্মীর চোখ ধাঁধানো রূপকে বাদ দিয়ে গুণের বিচারে এমন কি দর্শনধারিণী হিসেবেও বীণ-বাদিনীর প্রতিই চোখ ধায়। এর গভীরেও সেই একই মনস্তত্ব 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' নিজের সংসারের দুরবস্থায় যে ছেলের পড়াশোনায় খুবই

৮২। মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকজনকে বাদ দিলে হয়ত দেবতাদের ভক্তের সংখ্যাও ৩৩ কোটিই হবে— তার মানে প্রতি জনের জন্য একজন করে উদ্ধার কর্তা— দেবতা!

বাধা পড়তে থাকে বাড়ীতে কোন শিক্ষিত আত্মীয়— যার প্রতি তার মনে মনে শ্রদ্ধা আছে—এলে প্রণাম করে বলে 'আশীর্বাদ করুন যেন লেখাপড়া হয়।' 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে' দিয়ে পড়া আরম্ভ করলেও টাটা-বিড়লা হওয়ার আকাঙ্খা বাঙ্গালী শিশুর মনের ধারে কাছেও থাকে না, গাড়ীটা-বাড়ীটা-ভালো খাওয়াটা সম্পর্কে চিন্তা বহু পরে আসে, তাই লক্ষ্মীদেবী যাতে ব্যাজার না হন তাই তাঁকে নমস্কার পূজো-আর্চার প্রশ্নটাও আসে বটে তবে সেটা হিসেবী মনে, স্বতঃস্ফূর্ত্ততার জোয়ারে ভাটা পড়লে। দুজন বাঙ্গালী—সমাজের যে লেভেলেই তাদের অবস্থান থাকুক—একসঙ্গে হলেই 'কেমন আছেন, ভালো আছি, বাড়ীর সবাই ভালো তো'র পরবর্তী কথাই হয় চাল-ডাল এবং হালফিলে বিদ্যুৎ আর কেরোসিন সম্পর্কে। সেটুকু কথার স্থায়িত্ব হয় পাঁচ-সাত মিনিট মাত্র। তারপরই শুরু হয় 'আপনার ছেলে কি পড়ছে, মেয়ের কোন্ ক্লাশ? তা আপনার ছেলে মেয়ে তো পড়াশোনায় ভালো, আপনার আর দুশ্চিন্তা কি? আপনি তো মেরে আনলেন প্রায়।' তারপর নিজের পুত্রকন্যার পড়াশোনার কথা এবং বর্তমানের স্কুল কলেজে যে শুধুই রাজনীতি হয় পড়াশোনা হয় না তার সম্বন্ধে কিছু চুটকি কথা, মাষ্টারমশায়রা সব ফাঁকীবাজ হয়ে গিয়েছে শুধু প্রাইভেট টিউশানী আর টাকার দিকে নজর (নিজে যদি শিক্ষক/শিক্ষিকা হন বলাই বাহুল্য নিজেকে ওর মধ্যে না ধরে). আজকালকার ছাত্রদের গুরুভক্তি একদম অ্যাবসেন্ট ধরণের কথা, নিজের পাঠ্যজীবনের কৃতিত্বের কথা, সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকলে পরিবারস্থ পূর্বপুরুষদের জ্ঞানগরিমার কথা, নিদেন-পক্ষে নিকট আত্মীয়ের গৌরবমণ্ডিত পাঠ্যজীবনের কথা আর ওয়ানস্ আপন এ টাইম তাঁর সঙ্গে কোনো ক্লাশে পড়েছিলেন যারা আজ সমাজের শীর্ষস্থানে উঠেছেন মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়েছেন অথবা ডাক্তার-ইনজিনিয়ার হয়েছেন অথবা কোন সংবাদপত্রের নাম করা সম্পাদক-টম্পাদক হয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে নানাবিধ কথা—ভোজনবিলাসী

বাঙ্গালীর ভোজনের গপ্প আর বেশীক্ষণ চলে না আজকাল, সকাল হতে সাঁঝ পর্যন্ত তারও পরে শিক্ষাবিলাস অর্থাৎ পড়াশোনা কর্‌া অথবা সে সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক গল্পগুজব নিয়ে সময় কাটে এখন। তা আমরা তো ঐ শতকরা ৩০ জনের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষা মিলেছে কি? কে দেবে সেই শিক্ষা? (শিক্ষা-বিতরণের মিডিয়ামটাই যে অশিক্ষায ভর্তি!)

বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে সমাজে নাম কেনায় শিক্ষা ছাড়া কজনেব সত্যিকাবেব শিক্ষা হওযা সম্ভব এই পূতিগন্ধময় অজ্ঞান রাজত্বের শিক্ষা ব্যবস্থায়? (অথচ এটুকু পাবার জন্যই আমাদের প্রত্যেককে কত কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে সারাজীবন ধরে—প্রত্তিটি পরিবারেব শিক্ষাখাতে খরচ আয়ের একটা বড অংশ, অনেকেবই নাভিশ্বাস ওঠে সে খরচের টাকা জোটাতে। বেশীর ভাগ বাঙ্গালীর জীবনই বাজেট-লেস, সেই জীবনেব একমাত্র বাজেটে শিক্ষার খরচ সম্পর্কে ধর্‌া থাকে যা তার আয়ের অথবা অন্য স্থান হতে ঋণের সিংহভাগ কনজিউম করে। প্রায সকলেই বুকের রক্ত মুখে তুলে নিজের উত্তর পুরুষকে শিক্ষিত করে তুলবার চেষ্টা করি আমরা সকলেই ইতিহাসের ডক্টরেট হয়ে কলেজ-অধ্যাপক-অধ্যক্ষ হওয়া যায়, ইতিহাস-কেতাব লিখে মধ্যবিত্ত অধ্যাপক লেকটাউনে তিনতলা চারতলা বাড়ী বানিয়ে উচ্চ-মধ্যবিত্ত বনতে পারেন কিন্তু ইতিহাস সঠিকভাবে বুঝতে হলে যে শিক্ষিত মন দরকার তা ঐ গান্ধীবাদীরা পাবেন কোথায়? নিজের কলেজে ছাত্র-পরিষদীয় নোংরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হলে মানসিক শিক্ষার দর-কার। সেরকম শিক্ষারই আকাঙ্খা ছিল রবীন্দ্রনাথের। অথচ উল্‌টো রকম শিক্ষা মানে কুশিক্ষা দিয়েই মানুষকে বছরের পর বছর মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন ওঁরা। নিজেদের অজ্ঞানতা, অক্ষমতা, নিস্ক্রিয়তাকে ধামাচাপা দিয়ে রেখে বেশ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে দেশের শিক্ষিত সমাজ। মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল কিছু কথা বলা ও কাজ করা এবং বৈঠকখানায় বসে কিছু উল্‌টো-পাল্‌টা

টেবল-রাজনীতির গল্প করবার মত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে চতুরেরা বেশ বসিয়ে রেখেছে মধ্যবিত্ত সমাজটাকে। যে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ (বিশ্বের আজ এক তৃতীয়াংশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত), সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, কোরিয়া,[৮৩] ভিয়েতনাম নিজদেশে সমাজতন্ত্র আনয়নের পূর্বসর্ত হিসাবে নিরক্ষরতাকে দূরীভূত করে ইতিহাস তৈরী করেছে অবিশ্বাস্যরকম কম সময়ে অথচ ১৯৭৩ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসের বক্তৃতাতেও অজ্ঞ দেশবাসীকে তাদের সমাজতন্ত্র আনয়ন-কারিণী প্রধান-মন্ত্রীর কাছ থেকে ধমক খেয়ে শুনতে হয়েছে 'আপনারা নিরক্ষরতা নিয়ে মাথা ঘামান কেন?' ১৯৭৩ এর ভাষা কি ১৯০৮ থেকে বিন্দুমাত্র পৃথক? এক নম্বর বৃক্ষটি যে নিজের ডালপালা বাড়িয়ে মহীরুহ হয়ে উঠেছেন। এ দেশের অগ্রগতি হবে?

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন: 'দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখেনি; ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে।' 'শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশজুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্য কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সেকথা ভোলেনি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।' জমিদার বংশজাত রবীন্দ্র-নাথ সাধারণ মানুষ চাষী-শ্রমিকদের কথা নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছেন, তাই তিনি লেখেন: 'রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি

৮৩। দক্ষিণ কোরিয়া আজ ট্যাকস্-ফ্রি কানট্রি, আর আমাদের দেশ প্রতি প্রাতঃকালেই একটি করে নতুন ট্যাক্সের সম্মুখীন হচ্ছে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ট্যাক্সের চাপে দিশেহারা অবস্থা এখানকার মানুষের।

খই কম ছিল না, অন্ততঃ তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের দারিদ্রাণাং মনোরথার স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতে ও সাহস পায় নি, এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

এবার আসুন সুভাষচন্দ্রের যাচাই করা যাক। তিনি বলেছেন 'আমাদের অভাব প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) অন্নাদি অভাব (২) বস্ত্রাদির অভাব (৩) শিক্ষার অভাব। আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই।' এ ছাড়া ২৩ বছরের যুবক সুভাষচন্দ্রের কেমব্রিজ থেকে চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে ১৯২০এ লেখা চিঠির কিয়দংশ—"...আমাদের দেশে দুইটা জিনিস খুব বেশী রকমভাবে চাই—(১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার (২) Labour movement [৮৪] স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচী, মেথরের দ্বারাই হইবে। কথাগুলি বড় ঠিক। পাশ্চাত্য জগৎ দেখাইয়াছে—'Power of the people' কি করিতে পারে। তার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত—The first socialist republic in the world অর্থাৎ Russia। ভারতের উন্নতি যদি কোনদিন হয় সেটা আসবে ঐ 'Power of the people' এর ভিতর দিয়া। আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে, সে সব দেশে ঐ 'Power of the people' এর জাগরণ হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারতে' বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাশ্চাত্য জাতের বৈশ্য বর্ণ হচ্ছে Capitalists and Industrialists, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। Labour party হচ্ছে ভারতের শূদ্র বা অস্পৃশ্যজাতি।[৮৫] এরা এতদিন ধরে শুধু কষ্ট করে

৮৪। সুভাষচন্দ্র বসুর 'পত্রাবলী' পৃঃ ১০৬

৮৫। গান্ধীজি নাকি হরিজনদের খুব শুভাকাঙ্খী ছিলেন। অনেক কিছু

এসেছে। তাদের শক্তি এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে। সেইজন্য আমাদের এখন চাই Mass Education and Labour Organisation." সুভাষচন্দ্র আরো বলেছেন: 'Free India will not be a land of Capitalists, Landlords and Castes. Free India will be a social and political democracy.'

সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন সফল হয়নি। তাঁর সাময়িক শারীরিক অনুপস্থিতির ফাঁকে এবং সুযোগে দেশ Capitalistদের হাতেই চলে গিয়েছে। মাত্র ৭৫টি পরিবার আজ ৫৫ কোটি লোকের ভাগ্যবিধাতা। দেশের এ এক অসহনীয় অবস্থা। ১৯৩৯ এ ২৭ পৃষ্ঠার চিঠিই লিখেছিলেন জহরলালকে, অসুস্থ অবস্থায় রোগশয্যায় থেকে চিঠিতে আর টেলিগ্রামে ৪৯ খানাই[৮৬] না হয় পাঠিয়েছিলেন

তাদের জন্য করে থাকবেন হয়তো। না করে থাকলে বলে থাকবেন নিশ্চয় সেই ভারত বিখ্যাত 'হরিজন' পত্রিকায়। তাঁর ঐ ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস্ কদ-মূল্য দিয়ে!

৮৬। 'সর্বসাকুল্যে ৪৯ খানা পত্র এবং টেলিগ্রাম নেতা' (মানে সুভাষ-চন্দ্র—লেখক) 'গান্ধীজিকে লিখেছিলেন। নেতার প্রতি খানা পত্রের ছত্রে ছত্রে আছে সৌজন্য, ধৈর্য ও গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয়।' 'নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' সত্যানন্দ স্বামীর 'হে অতীত কথা কও' এর মাধ্যমে।

'গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অনেক পত্রালাপ হয়েছে এই নিয়ে। গান্ধীজি অনায়াসে যে স্তরে নেমে বলতে পারলেন after all he is not an enemy of the country,' (যা হোক তিনি দেশের শত্রু নন) 'সুভাষচন্দ্র সে স্তরে নামতে পারেন নি, তাঁর মার্জিত বাঙ্গালীর রুচিবোধ ও বিনয়-নম্রতা সুভাষচন্দ্রের চিঠিগুলোকে করে তুলেছিল স্নিগ্ধ।......' ('হে অতীত কথা কও': পৃঃ ৩৭৮-৭৯)।

আরও উল্লেখ্য. ২৮-৩-৩৯এ জিয়ালগোরা, মানভূম থেকে ফুলস্ক্যাপ কাগজে টাইপ করা জহরলালকে লেখা ২৭ পৃষ্ঠার চিঠিটি সুভাষচন্দ্রের জীবনের দীর্ঘতম

অহিংসার পূজারীর কাছে, তার বেশি তো সুভাষচন্দ্র কিছু করেন নি। কিন্তু তার জন্য শাস্তি কি এই ? পূর্বাঞ্চল বিশেষতঃ ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে অন্যায়ভাবে বঞ্চনা করে যে উত্তর ও পশ্চিম ভারতকে গড়া হল, তা কি ভারতের সামগ্রিক অবনতিই এনে দিল না ? উত্তর ও পশ্চিম ভারতকে কি এতেই সন্তুষ্ট করা গিয়েছে, তবে কেন সেখানেও আজ অসন্তোষ যে অসন্তোষের জন্য ২০ বছর আগে বাংলার রাজধানী 'মিছিল নগরী' দুর্নাম কিনলো দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে, 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাম ইনাম পেল দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে যারা বাঙ্গালীদের সারাজীবন ধরে দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঠেলে দিলো প্রদেশটাকে দুভাগ করে ? 'আনন্দভবন' নামক ইতিহাসে স্থান পাওয়া প্রাসাদ যে শহরে অবস্থিত সেই এলাহাবাদ থেকেও যে কংগ্রেস সরকার-প্রধানাকে 'গো ব্যাক ইন্দিরা' স্লোগান শুনে এবং 'কালো পতাকা' দেখে ফিরে আসতে হচ্ছে ! গুজরাট বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে ও যে (৪টি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের খবর ১৬ই জানুয়ারীতে পাবার পর) 'মনটা আমার কেমন কেমন করে' বলে নীরব ক্রন্দন করতে হচ্ছে পুরাতন এবং নব্যদের সম্মিলিত সর্ববৃহৎ সংস্থাকে। যাক্ সে কথা, আশ্চর্য পুরুষ সুভাষচন্দ্র ভাবের ঘরে চুরি জানতেন না। যা যখন করেছেন সেটা সত্য জেনে করেছেন, যা যখন বলেছেন তা সেই মুহূর্তে 'ট্রু টু দি বেষ্ট অব মাই বিলিফ অ্যাণ্ড ট্রু টু মাই নলেজ' ভেবেই বলেছেন। তিনি সমাজতন্ত্রের কথা ভেবেছেন, আবার জহরলাল ও নিজেকে কখন ও সোস্যালিষ্ট কখন ও কমিউনিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু একজনের কথা মুখেরই কথা, আর প্রথমজনের কথা হৃদয়ের আকাঙ্খা সে কথা কে না বোঝে ? হিটলারের কাছে যে সুভাষ গিয়েছেন, তিনিই তো

চিঠি। 'নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৮৫, নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী)।

কি অসম্ভব ধৈর্য !

মহাত্মাকে 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়েছেন, সেই একই ব্যক্তি গান্ধী-জীর বিরাগভাজন যতীন দাসকে অর্ঘ দেন। ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপয়িতা যিনি তিনিই তো নিজের কংগ্রেস ত্যাগের পরে ও কংগ্রেসী নেতাদের 'জয় হিন্দ' বাণী শেখালেন; ওটেন সাহেবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভূতপূর্ব উপাচার্য-বিচারক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে বুকটান করে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি কি ভিন্ন কেউ! যে মুহূর্তে যেটা সত্য বলে বুঝলেন, সেটাই আঁকড়িয়ে ধরলেন। সুভাষচন্দ্র ভাবের ঘরে চুরি করতেন না। তিনি মাস্ এডুকেশন' ও 'লেবার মুভমেণ্ট' সম্বন্ধে বলেছিলেন, বলেছিলেন 'পাওয়ার অফ দি পিপ্‌ল' এর কথা। এ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া নয়, চাষা ধোপা, মুচী, মেথর-হরিজন-দের সম্বন্ধে হৃদয় উজাড় করে মনের ভাব জানিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুকে যেমন জানিয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে: 'হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই... ৮৭।'

১৯১৭ এ রাশিয়া অভিশাপ থেকে মুক্তি পেল জারশাসনকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে আর মাত্র তিন বছর বাদে ২৩ বছরের যুবক তাঁর বন্ধুকে বলছেন The 'first Socialist Republic in the World অর্থাৎ রাশিয়ার কথা। চোখ ও কান কি পর্যন্ত খোলা! Lips are open only when eyes and ears have done their functions properly। একটি যুবক-ছাত্রের ক্লাশের খাতায় রচনা লেখা নয়, সত্যানুসন্ধানীর সত্য খোঁজা কারণ লেখক

৮৭। 'O India !...forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobler, the sweeper, are thy flesh and blood, thy brothers'. Vol IV P. 479-80

যে সুভাষচন্দ্র—'ট দি বেষ্ট অব মাই বিলিফ' না হলে বলবেন না। কিন্তু যাঁর নাম সম্বল করে 'ক্লীবের দেশ' এই ভারতবর্ষটা এতকাল চললো, ১৮৬৯ এর ২রা অক্টোবরে জন্ম সেই পৃথিবীবিখ্যাত দেশ-প্রেমিকের ১৯২২ সনে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বয়স এগিয়েছিল অনেক বেশী. ৫৩ বছরের প্রবীণতা আসবার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'মাস্-এডুকেশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়: 'তাকে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়ে তোমরা কি করতে চাও? তার সুখে কি তোমরা এক ইঞ্চি যোগ দিতে পারবে? তোমরা কি তার কুটিরটি কিম্বা তার ভাগ্যের বিষয়ে তার মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চাও? তা যদি চাও তাহলেও শিক্ষার প্রয়োজন হবে না।'[৮৮] এই আপাতঃ শিক্ষিতের উত্তরসূরীরা দেশের লোককে অশিক্ষিত করে রাখবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর ১৯২৪ সনে ৫৫ বছর বয়সে ইনি যে লেনিনকে 'উপদ্রবকারী' বললেন সে তো এঁর মত 'সবচেয়ে কম পড়া লোক' এর পক্ষেই সম্ভব কারণ লেনিন পড়তে হলে আর পড়ে বুঝতে হলে এলেম দরকার। প্রফুল্ল ঘোষকে ১৯৬৭-৬৮ এতে প্রায়ই বলতে শোনা গিয়েছে 'বিজ্ঞানীর মন নিয়ে রাজনীতি করি' তা কেমিষ্ট্রির ডক্টরেট-বিজ্ঞানীর অজ্ঞানতার সীমাহীনতা ওঁর গান্ধী-ভক্তির ডিগ্রী মাপলেই বোঝা যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের আই. এস. সি ক্লাশের প্রতিভাদীপ্ত ছাত্র যাঁর কেমিষ্ট্রির খাতা দেখে তাঁর শিক্ষক উপরোক্ত ডাঃ ঘোষ উচ্ছ্বাসে একদিন অজ্ঞান হতে চলেছিলেন, সেই ছাত্র অজয় মুখার্জীর বিজ্ঞানী মনটার চেহারাটা জেনে রাখাও ভালো। ইনি নিজেকে গান্ধীর চ্যালা বলে চেঁচিয়ে ভেবিয়ে আমাদের কানে তালা লাগিয়েছিলেন, নামী গান্ধীবাদী 'তমলুক গান্ধী'র জ্ঞানের

৮৮। কৃষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে। কৃষক যেখানে দেশের মানুষের শতকরা ৮০ জন, সেখানে তারাই mass এর সব চেয়ে বড অংশ। তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজির যা ধারণা ছিল, সেটাই সামগ্রিক 'মাস্ এডুকেশন' সম্পর্কে তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তাধারা, এটাই বুঝতে হবে।

পরিধিটা হয়ত নিশ্চয়ই গুরুর লগবগই হবে। ডাঃ বিধান রায় আমাদের কাছে রূপকথার মানুষ ছিলেন বহুদিন ধরে, নাম করা ডাক্তারের রোগী চিকিৎসার বহু কেস সম্বন্ধে আমরা গল্প শুনেছি, সে সব প্রায় কিংবদন্তীর মত—কোন রোগীকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে রোগের দাওয়াই বাতলে দিলেন তাঁর কাছ থেকে বিন্দুমাত্র কিছু না শুনে, কোন রোগীর সিঁড়ি-পদক্ষেপকে পরিমাপ করেই তিনি রোগী ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এরকম বহু গল্প আমরা শুনেছি যে গুলো মোটেই আষাঢ়ে নয়। যাদের জীবনে ঘটেছে এরকম ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনেছি, জেনেছি বন্ধু-আত্মীয়ের মারফৎ। অতবড় ডাক্তার তাঁর প্রফেশন ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, খবর এসেছিল আমাদের কাছে ইউ. পির রাজ্যপালের[৮৯] পদ প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিমবঙ্গ-সেবার পদগ্রহণের। ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী

৮৯। ইউ. পি তখন উত্তর প্রদেশ ছিল না, ছিল ইউনাইটেড প্রভিন্স। সেই সংযুক্ত প্রদেশের রাজ্যপালের পদ অবশেষে দেওয়া হয়েছিল সরোজিনী নাইডুকে— দাতৃবর্গের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ হয়ত গ্রহীতাকে কৃতার্থ করতে পেরেছিল। আমাদের ছোট বেলার বিস্ময়, হায়দরাবাদের নামকরা বাঙ্গালী ডাঃ অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, ওজস্বিনী বক্তৃতাদাত্রী সরোজিনী নাইডুর কবিতা মুখস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা তখন করেছি। বহু ইতঃস্ততার পর ঐ লাইন কটি লিখেই দিলাম— নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে আর লাভ কি! সুভাষচন্দ্র-কষ্টি পাথরে যাচাই করে আজ আর ওকথা বলা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকলো না। যারা আমার চেয়ে অনেক জানেন অনেক পড়েছেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস অনেক বেশী বুঝেছেন, তাঁরা বিচার করবেন ভুল বল্লাম কি না, মিসেস নাইডু সম্পর্কে কথাটা বলে কতটা অন্যায় কর্লাম!

সরোজিনী নাইডুর (১৮৭৯-১৯৪৯) সম্পর্কে আর একটু বিশদভাবে লেখবার লোভটা সংবরণ করতেই হল স্থানাভাবে।

জহরলাল নেহরুকে (১৮৮৯খৃঃ) 'তুমি' বলা-পার্সোনালিটি সেই স্টলওয়ার্ট পুরুষ (১৮৮১ খৃঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি সবই মানুষ দিয়েছে খুবই স্বাভাবিক কারণে। এতকাল পরে হিসেব মেলাতে বসে অবাক লাগে যখন দেখি বিশ্ববিখ্যাত অতবড় বিজ্ঞানী অনায়াসে গান্ধীবাদ-অবিজ্ঞানের ঠুলি চোখে পড়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। যতই আশ্চর্য লাগুক, ঘটনাটা কিন্তু পুরো সত্যি, সব সত্যি, এই দুনিয়ায় হায় ভাই সব সত্যি। অত বড় টেকনোক্রাটের আমলেই তো বুরোক্রাটরা প্রাধান্য পেয়েছেন, টেকনোক্রাটরা নিজেরাও আস্তে আস্তে বুরোক্রাটে কনভারটেড হয়েছেন। যে গান্ধীবাদীদের দ্বারা এই পশ্চিমবঙ্গের জীবন-দীপ নির্বাপণ-যজ্ঞ এতকাল ধরে চলেছে, তাদের সার্থক পদক্ষেপ তো ডাঃ বিধান রায়ের আমলেই হয়েছিল. এই প্রদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতল গহ্বরের দিকে অবতরণ তাঁর সময় থেকেই।[৯০] বাংলার গৌরব ভারতবর্ষের গর্ব (সুভাষ-বিরোধী) এই অসাধারণ ডাক্তারের সাধারণ জ্ঞান আজ এ মনে কিন্তু ভাব এনেছে. সেই লুটিয়ে পড়া শ্রদ্ধার ভাবে ঘাটতি পড়েছে। বিধান রায়ের গান্ধীভক্তিকে আজ আর সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছি না, একথা বলা ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। এই অশিক্ষিতের দেশটায় যে-কজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত আছেন, তাদের একটা বড় অংশেরই শিক্ষার পরিধি সাধারণ লোকের নর্মাল মাইণ্ড দিয়ে মাপা যায় না। বিদ্বান এবং পণ্ডিতে তো গিজ্-গিজ করছে সমাজটা বিদ্যার ঝুড়ি আর পাণ্ডিত্যের

৯০। 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রদেশের যা কিছু হয়েছে তা বিধান রায়ের আমলেই হয়েছে, ক্যালকাটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট, দুর্গাপুর ষ্টীল সবই তাঁর ব্যক্তিত্বেই সম্ভব হয়েছে একথা যখন সকলে বলেন তাতে কোন ডিসপিউট না করে ঘাড় নাড়ালেও মনের কথাটা কিন্তু ওখানেই লিপিবদ্ধ করলাম। মানবো, সবই মানবো— মানস-কন্যা কল্যাণীর সৃষ্টি, দীঘা সৈকতের পরিকল্পনা সবই তাঁর, তবু, তবু ঐ প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজনীয় মনে হল।

খোলা নিয়ে কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানবান এবং সুশিক্ষিত মানুষ খুঁজতে গেলে তো গাঁ উজাড় হয়ে যাবে আজকের দিনে।

অশিক্ষার পূজারীদের কথা বেশীক্ষণ বলতে আর ভাল লাগছে না, মনটা অনেক নিম্নস্তরে নেমে যায় এদের কথা বলতে গেলে। তাই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শিক্ষার পূজারী সুভাষচন্দ্রের কথায় আবার ফিরে যাই। এতক্ষণে নীচে নামা মনটাকে একটু উন্নত করে নি। যে সুভাষ ১৯২০এ লেনিনের The first socialist republic in the world সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সেই একই সুভাষ ১৯৩৫এ অথবা পরে আবার লিখেছেন 'We know, for example, that in Soviet-Russia a new scheme of national (or political) economy has been evolved in keeping with the facts and conditions of the land. The same thing will happen to India. In solving our economic problem, Pigou and Marshall will not be of much help" (The Indian Struggle, 1935-42, p. 72)। যৌবনের উচ্ছ্বাস পরিণত বয়সেও সুর টানলো সেই একই রাশিয়ার। দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের যে আরও পরিণত বয়সে তাঁকে রাশিয়ার বিপক্ষ দলের সাহায্য নিতে হল, দেশের লোক ১৯৩৯-৪০এ যা ব্যথা দিল, অনুরূপ ব্যথা, হয়ত তার চেয়েও বেশী ব্যথা বিদেশে একাকী তিনি বুকে বইলেন, মনে মনে সইলেন রাশিয়াকে স্বপক্ষে না পেয়ে। সমাজবাদ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল, ১৯২৯-৩১এ নানাস্থানে তাঁর কথাবার্তা থেকে সেটা বোঝা যায়। রাশিয়ার বলশেভিক দলের পথ ও পন্থা ভারতেও কার্যকরী হবে কিনা এ সম্বন্ধে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু সর্বোপরি কথা: 'পৃথিবী জুড়ে এখন নানা মতবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোনটা যে টিকে থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই।

ভালো করে দেখে-শুনে তার মধ্যে যা সত্য, যা ভারতের পক্ষে কল্যাণ-কর, তাই আমরা গ্রহণ করব। আগে থেকে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখতে আমরা রাজী নই।' (১৯৩৩)। সুভাষচন্দ্র ছিলেন দার্শনিক, ছিলেন সত্যের আকাঙ্খী। জীবনে পথ খুঁজেছেন, সত্যের পথ। এক জায়গায় গিয়েছেন, পছন্দ হয়নি তো ফিরেছেন অন্যস্থানের সন্ধানে। গুরু খুঁজেছেন, বিভিন্ন স্থানে ছুটে গিয়েছেন অতৃপ্ত মন তাঁকে ঘরে ফিরিয়েছে। রাজনীতিতে জড়িয়েছেন। সেখানেও পথ খোঁজাখুঁজির অন্ত ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মহাকাল বাদ সেধেছে--চিত্তরঞ্জন তিরোধানে হোঁচট খেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজিতে মন দিয়েছেন। পছন্দ হয়নি, দেশ ছেড়েছেন। নানা জায়গায় নানা-জনের কাছে পৌঁছেছেন, রাশিয়া-জার্মাণী-জাপান কোথায় যেতে বাকী থাকলো! সর্বশেষে চালনা করলেন তাঁর সাধের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। রাশিয়ার প্রতি আগ্রহ আছে কিন্তু পুরোপুরি না বুঝে আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক। সমাজবাদে ইচ্ছুক, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সবটা যাচাই ক'রে কতটা রাখবেন কতটা বর্জন করবেন দেশের মাটিতে সইয়ে নেবার জন্য সেটা করবার আকাঙ্খা। দেশ নিজ হাতে গড়বার অদম্য আগ্রহ আছে তাই ভারতের স্বাধীনতার ভগীরথ দেশ গড়বার চিন্তাও করেন ২৩ বছর বয়সে। দেশগঠনের সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি, এ আমাদের লজ্জা—তাঁর প্রতি আমাদের অবহেলার, অমনো-যোগের শাস্তি ও বটে। দার্শনিক-তপস্বী নেতাজীর হাতে দেশ পড়লে দেশকে তিনি গড়তেন যোগ্যমত। Power of the people আনয়নের জন্য যা' করা দরকার তাই তিনি করতেন। সমাজবাদে আগ্রহী অথচ কার্ল মার্কস, লেনিন প্রদর্শিত কর্মধারা দিয়েই ভারতের মাটিতে সমাজবাদ আসবে কিনা তাতে সংশয়— পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে সত্যাশ্রয়ী দেশসেবীর বিবেক যদি বলতো 'হ্যাঁ', নিঃসংশয়ে সেদিকে পুরোপুরি চলতেন, যদি বলতো 'না', তাহলে ধারণা

পাল্টাতেন, সজোরে ছুঁড়ে ফেলতেন ভুল চিন্তাধারাটা। পথ খুঁজতেন, প্রয়োজন হলে তাঁর নিজের সৃষ্ট প্ল্যানিং কমিশন নিজেই পালটাতেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত জ্যোতি বসু আর অটল বাজপেয়ী দুজনের মতামতই গ্রহণ করতেন. যাঁর মতামত পছন্দ হত তারটা গ্রহণ করতেন, পছন্দ না হলে অক্লেশে দুজনকেই রিজেক্ট করতেন। যেতেন দেশের অন্য মানুষের কাছে, তাদের কথা শুনতেন। স্বদেশে তেমন মানুষ না পেলে পাড়ি দিতেন লেনিন স্টালিনের দেশে তাঁদের সমাজবাদকে ঠিকমত বুঝতে, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' কথাটাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেও পৌছতেন গিয়ে মাও-সে-তুঙের কাছে,[২১] তাঁর দেশের কৃষি ও শিল্প দেখতে। নিজের মনের সব প্রশ্নের সদুত্তর তাও যদি না মিলতো দৌড়তেন হো-চি-মিনের এলাকায় ভিয়েতনামে তাঁর অভিনব বিদ্যায়তনগুলির পরিচয় নিতে যাদের সাহায্যে ভিয়েতনাম-স্রষ্টা শতকরা একশত জন নাগরিককে শিক্ষিত করেছেন। পৃথিবীর সব প্রান্তেই ছুটতেন, সব দেশেই যেতেন মিটিং এবং ইটিং এর জন্য নয়, নয় সে দেশের কাছ থেকে পুষ্পস্তবক পাবার আকাঙ্খায় অথবা কিছু গুডম্যান সার্টিফিকেট প্রাপ্তির আশায়। যেতেন শুধু সেই একই চিন্তা নিয়ে, কেমন করে সুষ্ঠুভাবে দেশের উন্নতি করা যায়, People এর হাতে Power দেওয়া যায়। যুবা-অবস্থার সংশয়াচ্ছন্ন সমাজবাদ-প্রীতি প্রবীণত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সংশয়শূন্য হত — কে জানে আজাদ হিন্দ্ সর্বাধিনায়কের 'জয় হিন্দ্' ডাক 'লাল সেলামে পরিণত হত কিনা! নয়নাভিরাম ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা কটকটে লালে চুবিয়ে নিতেন না একথা কে বলতে পারে!

২১। মাও-সে-তুঙ্ সম্পর্কে তাঁর কোন মতামত আমরা শুনিনি কেন না চিয়াং কাই শেকের রাজত্বের অবসান হয়েছে ১৯৪৯এ। আর সুভাষচন্দ্রের কোন কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়নি অফিসিয়ালি ১৯৪৫ এর পরে। 'জগৎ জুড়ে দিচ্ছে নাড়া মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা'য় যাঁর নাড়া খাবার কথা সর্বাধিক তাঁর কথাই অতএব আমাদের কাছে আপাততঃ নেই।

মোট কথা, সব যাচাই করে যেটাকে সবচেয়ে ভালো সার্টিফিকেট তার বিবেক[৯২] তাঁকে দিত সেটাই গ্রহণ করতেন অক্লেশে কেননা 'কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে মস্তিষ্ক বন্ধ রাখতে রাজী' ছিলেন না প্রথম থেকেই, নিজের কষ্টি পাথরে যাচাই না করে। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সব কিছু করাই সম্ভব। আর যখন যেটা করবেন, সাধারণভাবে

৯২। "আইয়ারজী বিদগ্ধ পাণ্ডিত। ...তিনি বলেছিলেন, এখানেই ওঁর চরিত্রের বিশেষত্ব! এই জন্যই তিনি অনন্য' ...একটা ঘটনার কথা বলি। ...এককালে আমি পূর্ব-এশিয়ায় রয়টারের নিজস্ব প্রতিনিধি ছিলাম। সাংবাদিক হিসাবে অনেক বড় বড় লোকের সান্নিধ্যে আসতে হত আমাকে। তখন আমি একটা অটোগ্রাফ খাতায় বিশিষ্ট লোকের কাছ থেকে বাণী সংগ্রহ করতাম। একদিন অবসর সময়ে খাতাখানা নেতাজীকে বার করে দিয়ে বললাম —কিছু লিখে দিন। উনি খাতাখানা উল্টেপাল্টে দেখলেন। একটি পাতায় মহাত্মাজীর একটি বাণী ছিল। ওঁর দৃষ্টি আটকে গেল সেখানে। মহাত্মাজী লিখেছিলেন: 'সহজে কোন প্রতিজ্ঞা কর না। কিন্তু মনস্থির করে যদি কখনও কোন প্রতিজ্ঞা একবার করে বস, তাহলে কখনও তা থেকে বিচ্যুত হয়ো না। মৃত্যু হয় তাও ভাল, নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থেক।'

ঐ কটা লাইন তিনি পড়লেন। ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। কলম বার করে তার পরের পৃষ্ঠায় লিখলেন:

'My knee shall bend, I calmly pray
To God and God alone.
'My life is in the Indian's hand
My conscience is my own!'

(চির-উন্নত বিদ্রোহী শির লোটাবে না কারও পায়ে—
তোমারেই শুধু করিব প্রণাম, অন্তরতম প্রভু!
এ দেহের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়ে যাব দেশভাইয়ে
রহিবে বিবেক! সে শুধু আমার! বিকাব না তারে কভু!)

নামটা সই করতে যাচ্ছেন, আমি হঠাৎ বলে বসি—এটা তো ঠিক আপনার কথা নয়। সুইস্ বীর কবি উইলিয়াম্ টেলের কবিতার শব্দ বদলে দিয়েছেন মাত্র।

বিচার করে সেটা গত কনফিউজিং বলেই মনে হোক, তার জন্য দাগ দেওয়া চলে না অদ্ভুত এই চরিত্রের উপর। যে তাঁকে সন্দেহ করবে, তাকেই পরে পস্তাতে হবে,এ ঘটনা বহুজনের বিভিন্ন সময়ের স্বীকৃতিতে বোঝা গিয়েছে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে যখন যেটা প্রপোজ করেছেন, গান্ধীজিরা চরমভাবে সেটার বিরোধিতা করেছেন—পরবর্তী সময়ে সেটাই নিজেরা করেছেন, নিজেদের অরিজিন্যালিটির বিন্দুমাত্র পরিচয় না দিয়ে। কম্যুনিষ্টদেরও শাস্তি কম জুটলো না এত বছরে।

উনি হেসেছিলেন। তারপর খাতায় লিখেছিলেন, 'জীবনের যে কোন পর্যায়ে যদি বিবেক তোমাকে বলে পূর্ব প্রতিজ্ঞা তোমাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করেছে, তাহলে মূর্খের মত সে প্রতিজ্ঞাকে কখনও আঁকড়ে থেক না! 'জীবন' তুচ্ছ, 'জবান' তার চেয়ে বড়—কিন্তু মনে রেখ তোমার বিবেকের স্থান ঐ জীবন-জবানের অনেক অনেক উর্ধ্বে!"

আমাকে যদি কেউ গান্ধিজি ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে একসাথে একটি রচনা লিখতে বলত আমি শুধু ঐ কথা কটি লিখতাম। কি বলছেন ওগুলো আমার লেখা নয়, নারায়ণ সান্যালের লেখা, তাঁর 'আমি নেতাজীকে দেখেছি'র ২১৩-১৪ পৃষ্ঠা থেকে টোকা? তা ছোটবেলায় M. Sen আর J. L. Banerjee মুখস্থ করে (টুকে) পরীক্ষায় পাশ দেওয়ার সময় যখন কেউ কটাক্ষপাত করেন নি, তা এখনই বা কেন?

নিজের প্রতিজ্ঞার চেয়ে জীবনকে অনেক উপরে স্থান দিতে গান্ধীজিকে একাধিকবার দেখা গিয়েছে, নিজের প্রতিজ্ঞার প্রতি অত সিরিয়াসনেস থাকলে নাথুরাম গডসের আর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ মিলতো না। (ভাগ্যবান পুরুষ একেই বলে—জীবনে কত মালা মিললো, মরণে ও শহীদের সম্মান)। তিনি '১৯২১ এর সেপ্টেম্বরে এমন কথাও বলেন যে, আমি স্বরাজ না এনে ৩১শে ডিসেম্বরের পর নিজের বেঁচে থাকাও কল্পনা করতে পারছি না', (জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অযোধ্যা সিংহ, পৃঃ ৩৬) এর ছাব্বিশ বছর পরে সেই নামকরা স্বরাজটা (ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসটা) এসেছিল আর তা গান্ধীর জীবিতাবস্থাতেই।

সমগ্র সুভাষ-চরিত্রের সারাংশ ঐ লাইন কটি।

নেতাজীকে কেন্দ্র করে কেউ কোন প্রশ্ন করলেই তাদের নীরবে থাকতে হয়েছে, তাঁরা প্রতিমুহূর্তে বুঝেছেন কি ভুল তাদের সেদিনকার পার্টি-নেতৃত্ব করেছিল। রাশিয়া সমর্থনের সাথে সাথে ব্রিটিশ সহযোগিতার প্রশ্নটা এসে পড়ে, কিন্তু যে ব্রিটিশকে উৎখাতের জন্য বহুবছর ধরে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, সুভাষের সহযোগী হিসাবে, হঠাৎ তাদের বৃটিশ সমর্থন বহু প্রশ্ন তাদের বিপক্ষে এনেছিল। বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়া আক্রান্ত হলে 'ফ্যাসিজমের পূর্ণ পরাজয় সাধনে সথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য' তাই এ যুদ্ধ. 'জনযুদ্ধ' তা না হয় বোঝা গেল, তাই বলে 'আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে'র ধ্বনি ভুলে 'অন্যদের' স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার কথাটার মধ্যে যে হাজারো কিন্তু এসে পড়ছে! এ কোন্ যুক্তি যে রাশিয়া সমর্থন করতে গিয়ে বৃটিশের পক্ষে 'অর্থ চাই, ছেলে চাই' বলতে হবে! অবশ্য এটাও বোঝা যায় সেদিনকার কমিউনিষ্ট পার্টি একটি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পড়েছিল। এরকম ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পরবর্তী সময়ে তারা আবার পড়েছে রাশিয়াকে কেন্দ্র করে, বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি লেনিন-স্ট্যালিনের রাশিয়া যখন প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদীদের ক্রীড়াভূমি হয়ে উঠেছিল 'ক্রুশ্চেভ দি গ্রেট' এর আমলে। আজও রাশিয়া সংশোধনবাদীদের কবলে কোসিগিন-ব্রেজনেভদের নেতৃত্বে, তবু আজ মার্কসবাদী পার্টি নিজেদের পজিশন হয়ত অনেকটা ক্লিয়ার করে নিতে পেরেছে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাদের টাইম টু-টাইম বক্তব্য মানুষের কাছে রেখে। আজ যুক্তিবাদী ও সহনশীল মানুষেরা তাদের কথা চট করে এক কথায় উড়িয়ে দেয় না, তাদের যুক্তিগুলো খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। চীন সম্পর্কেও তারা অন্ধ অনুসরণকারী নন, এ জিনিসও আমরা জানি। সে যাহোক, বৃটিশ সহযোগিতার স্বপক্ষে-বিপক্ষে দুরকম যুক্তির অস্তিত্ব থাকলেও 'সুভাষ ফ্যাসিস্ট' তাঁকে 'বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা' করবার কথা ঘোষণা যে তাদের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়, অযৌক্তিক ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় হয়েছে, এ বিষয়ে কোন

কিন্তু থাকতে পারে না। সুভাষ বলে কথা, তাঁকে যারা কাছে থেকে বহুবার দেখেছেন - গান্ধী-কংগ্রেসের নীতিবিগর্হিত ব্যবহারের সময় যার সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে অত্যন্ত সন্নিকট থেকে যাচাই করবার সুযোগ পেয়েছেন —তাদের এই ভুল মারাত্মক ভুল, ঘোরতর অন্যায়, নিজেদের নিবুদ্ধিতার পরিচয়। সুভাষ যে 'আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা...নেই, মধ্যদিনে তাঁর পরিচয় সুস্পষ্ট।' সমাজতন্ত্রবাদী রাশিয়াতে গেলেও তাঁর কোন দোষ নাই, একেবারে বিপরীত শিবির ফ্যাসিজমের ক্রীড়াভূমিতে গেলেও তাঁর পক্ষে অন্যায় কিছু নয়।[৯৩] উদ্দেশ্য তাঁর একটিই—দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি—সাময়িক পথ যেটাই হোক লক্ষ্য একটাই, বৃহত্তর স্বার্থ। তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ১৯৪০এ ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরী করেন, আবার কিছুদিন পরেই ফরোয়ার্ড ব্লককে অনাথ করে সাগরপাড়ে যাত্রা করেন। বিদেশে দেশপ্রেমিক রাসবিহারী বসুর আই. এন. এতে সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাঁর যোগদানের বাসনা থাকলেও রাসবিহারী তাঁর যোগ্য পদ দিয়েই আই. এন. এর কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেন। আজাদ হিন্দ (ফ্রি ইণ্ডিয়া) ফৌজের প্রাথমিক জয়ের পরে ভারতের মাটিতে সিঙ্গাপুরের তটে ১৮।৩।৭৫ এ পৌঁছেন 'তেরঙ্গা ঝাণ্ডা' 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গানের সাথে সাথে 'জনগণমন' ও তিনি ভোলেন না। যাঁকে পরিত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যান ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১, যাঁর আইডিয়া সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে কাবুলে আত্মগোপন করে থাকা-কালীন ফেব্রুয়ারী মার্চে লেখেন[৯৪] 'পার্টলি মেডিয়েভেল (মধ্যযুগীয়)

৯৩। 'আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনি নই, কারো Prototype নই—I am myself' যিনি বলেছিলেন 'নিজের কীর্তির চেয়েও মহৎ' সেই মহাপ্রাণকে স্বচ্ছ সরল ভাবতে না পারার অপরাধ অসমর্থদেরই একমাত্র।

৯৪। 'Fundamental Questions of Indian Revolution. Forward Bloc— Its justification' by Subhaš Chandra Bose.

[১৫] অ্যাণ্ড পার্টলি অ্যান্টি-সোশ্যালিষ্ট' (সমাজতন্ত্র-বিরোধী), তাঁকেই ১৯৪৪এ ডাক দিয়ে বলেন 'জাতির পিতা' 'Father of the Nation'। ঘটনাগুলো আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পুরোপুরি পরস্পর বিরোধী তবু তাঁর উপরে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা কোন মানুষের সমর্থন পাবে না। ১৯৬৭ সনে বহু নেতা কংগ্রেস দল ত্যাগ করে অন্য দল গড়েন হিরো হিরো ভাব নিয়ে, পরবর্তী সময়ে তাদেব মধ্যে অনেকেই পুনর্মূষিক হয়ে গাদার-পার্টিতে ফিবেছেন। কেউ কেউ আবার অন্য দলে গিয়ে ভিড়েন, দুএকজনে[১৬] অবশ্য সেকেণ্ড পার্টিতে টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন নিরূপায় হয়ে প্রথম পার্টির লোকেদের দিকে গোপনে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থেকে, যত সুখ ও সম্পদ এখন ওপারে ওদেরই কপালে একথা এপারে বসে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এরকম বিশেষ বিশেষ নেতা মানুষের কাছে স্টাণ্টবাজ, দলত্যাগী, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বিশেষণে সঠিকভাবেই ভূষিত হয়েছেন। নেতাজী কংগ্রেস ছেড়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন, সেখান থেকে আই. এন. এ-তে যান এবং পুনর্বার তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন। অর্থাৎ একটা থেকে আর একটা তারপর অন্যটা— এইরকম, সবটাই উল্‌টো পাল্‌টা ব্যাপার স্যাপার।[১৭] তবু তাঁকে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী যারা বলেন তাঁদেরই মুখ পোড়ে।

১৫। ১৯৩২ এ কারো সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করেই গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। তাব অব্যবহিত পরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: 'Gandhiji should now be regarded as an old, uselss piece of furniture.'

১৬। সুশীল ধাড়া প্রমুখ।

১৭। নামী 'তমলুক গান্ধী' অজয় মুখার্জীর কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন এবং পুনর্বার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন— কেসটা প্রায় আইডেন্‌টিক্যাল। অবশ্য মুখুজ্যে মশায়ের বিশ্বাসঘাতক-খ্যাতি তাঁর ভেতরের

জনক নন্দিনী সীতা সীতাই ছিলেন, সাধারণ রমণী ছিলেন না। রামচন্দ্র, প্রজা মনোরঞ্জন হেতুই হোক অথবা নিজের মনের আবিলতা-সঞ্জাত সন্দেহ নিবারণেই হোক, তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন ফলে অভিমানিনীর দেহত্যাগ ঘটলো, রাবণ-আবাসে বাস কর্লেও অশোকবনের সীতাকে কোন ক্লেদ স্পর্শমাত্র করে নি। পরবর্তী সময়ে রামচন্দ্রকেই এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে—স্ত্রীবিয়োগ জনিত মানসিক ক্লিষ্টতা এবং হয়তো অনুতাপও তাঁকেই ভোগ করতে হয়েছে। সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্রই, সাধারণ লোক তিনি নন, কোন সাধারণ রাজনৈতিক নেতার সাথে তুলনা করে যারা তাঁকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছিলেন, তাদেরই এদের জন্য মূল্য দিতে হয়েছে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে। সুভাষ-সমালোচকদেরই মানুষের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল, বারে বারে বহু মূল্য দিতে হল—সুভাষচন্দ্র নিষ্কলুষই রইলেন। তবে অভিমানী দেশপ্রেমিকের অভিমান আজও ভাঙ্গল না—দেশে আজও ফিরলেন না। দেশের মাটি তাঁর পদচিহ্ন তৃষায় আজও তৃষিত।

ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়কের সাময়িক অবর্তমানে তাঁর পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক এনলার্জ করেনি যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে। নেতাজীর নিজের পার্টির নেতাদের দোদুল্যমানতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে কয়েক বছর ধরে। ১৯৭২ এর প্রাক-নির্বাচনী ময়দানের সভায়

ক্লেদাক্ত মনটার কারেক্ট অ্যাসেসমেন্ট। অতুল্যে-অতুষ্ট দলত্যাগী কংগ্রেসী নেতা অতুল্য-*৯৮একুসিটের পর কংগ্রেসে ফিরেছেন ১৯৭২ নির্বাচনের কিছু আগে। ১৯৬৭ এর কংগ্রেস বিরোধী লম্বাচওড়া বক্তৃতাগুলো যে কোন নীতিগত চিন্তাধারা-প্রসূত নয়, ব্যক্তিগত ঝগড়া-আক্রোশই যে এর একমাত্র কারণ, তা. ১৯৭১-৭২এ স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন গান্ধীবাদী এই মহামানী দেশসেবকটি।

*৯৮। অতুল্য ঘোষ।

১৯৭১ এর একটি বিশেষ ঘটনাকে[৯৯] উপলক্ষ করে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষের ঢোঁক গেলা কারও দৃষ্টি এড়ায়নি। বস্তুতঃ নেতাজী-অন্যমনস্কতাই এর কারণ। শুধু ২৩শে জানুয়ারীতে নেতাজী-স্মরণ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা দেখলে অবাক হতে হয়, ব্যথা জাগে মনে। একবার এদল আর একবার বিপরীত শিবির হচ্ছে পাঁচ ছয় বছর ধরে কোন নির্দিষ্ট নীতি ও মতবাদকে না মেনে।

নেতাজী যে জেনুইন্ লেফটিষ্টদের সম্বন্ধে ১৯৪১এ লিখেছিলেন, খোদ তাঁর পার্টিই সেই জেনুইননেস রক্ষা করেনি। ১৯৭০ এ যুক্তফ্রন্ট ভাঙায় ফরোয়ার্ড ব্লকের হাত ছিল,[১০০] মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এম এল. এ হলেও পরবর্তী সময়ে ফ্রন্টবিরোধী কাজ করে বস্তুতঃ মানুষের শত্রু শিবির কংগ্রেসকে তাঁরা সাহায্য করেন। এ ব্যাপারে তাঁদের নীতিবোধ কংগ্রেসী-বাংলা কংগ্রেসীদের চেয়ে বিন্দুমাত্র উন্নত ধরণের নয়। ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে ধারণা অজয় মুখার্জীর ও যা, অনেক আইনের বই পড়া ভক্তিভূষণ মণ্ডল[১০১] আর অমর প্রসাদ চক্রবর্তীদেরওতাই—পারলে মুখুজ্যে, মণ্ডল এবং চক্রবর্তীরা একযোগে মিনিফ্রণ্ট তৈয়ারী করে ১৯৭০ এর মার্চে যুক্তফ্রণ্টের বিকল্প মন্ত্রীসভা করে বসতেন কংগ্রেসের সহায়তাতেই, যুক্তফ্রন্টের কনষ্টিটিউয়েণ্ট পার্টি হয়ে জনতার রায়ে নির্বাচিত হয়ে অনায়াসে তাঁরা বিপরীত শিবিরে স্থান নিতেন, ন্যায় নীতি আর আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, এ পরিচয় আমরা পেয়েছি। ১৯৭১এ অষ্টবাম যে সত্যিকারের বামের প্রতিভূ ছিল না এটা প্রমাণ পেয়েছে, দীর্ঘ তিন বছর পরে আবার তারা

৯৯। হেমন্ত বসুর হত্যা।

১০০। 'অনশনের রীলে রেস' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

১০১। এঁরা দু'জনেই আইনমন্ত্রী ছিলেন, এ পি. চক্রবর্তী প্রথম যুক্তফ্রণ্টে, বি. বি. মণ্ডল দ্বিতীয়ে।

১৯৭২এ বামপন্থীফ্রণ্টে যোগ দিয়েছেন ১৯৬৯ এর মত, এতে প্রমাণিত হয় যে নেতারা এর আগে ভুল পথে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা সেটা স্বীকার ও করেন, ১৯৭২ এর প্রাক-নির্বাচনী স্বীকৃতি এর প্রমাণ। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এর পরেও তারা ফ্রণ্ট পরিত্যাগ করে তিন পার্টি তৈরী করেন আর. এস. পি ও এস. ইউ. সির সঙ্গে ২৭শে জুলাই, ১৯৭৩ এর বন্ধ্ এর সময় থেকে। পরবর্তী সময়ে আবার তাঁরা ফিরে এসে নয়বামে যোগদান করেন। কোন একটা স্পষ্ট নীতি চোখের সামনে রাখলে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকতো ফলে এইভাবে লোক হাসানো পরিত্যাগ করতেন নেতারা, এতে মূল শত্রু দক্ষিণ পন্থীরা অর্থাৎ কংগ্রেসীরা[১০২] বামপন্থীদের সুদৃঢ়একতা দেখে ভয় পেত। বস্তুত: ১৯৭৪এ এসেও নয় পার্টি যে কন্‌সোলিডেটেড একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব কেননা তিন পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি ও আর. এস. পি বস্তুতঃ সুযোগ বুঝলেই অর্থাৎ লেফট কনসোলি-ডেশন সুদৃঢ় হবার উপক্রম হলেই যে অ্যান্টি ফ্রণ্ট কাজকর্ম আবার করবেনা একথা জোর করে বলা যায় না।[১০৩] সুভাষচন্দ্র-কথিত অ্যাসিড

১০২। কংগ্রেসের মধ্যে বাম দক্ষিণ আলাদা আলাদা কিছু নেই। দুষ্কৃত-কারীদের শ্রেণী বিভাগ হয় না। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল খোঁজার মত সি. পি. আই এর মনগড়া থিসিসকে মূল্য দেওয়া বড়ই হাস্যকর ঠেকে।

১০৩। ১৯৭২ এ লেফট ফ্রণ্টে এসে নির্বাচনী মঞ্চে দাঁড়ানোয় বহুজনেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন, লেফট কনসোলিডেশন দেখে নতুন করে ভরসা মানুষ পেয়েছিল শক্ত যুক্তফ্রণ্টের। কংগ্রেসের নির্বাচন কেরামতি দেখে মানুষে বুঝেছে যে কংগ্রেস বামপন্থীদের একত্রিত হওয়ার ভয় পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ প্রদেশের লোকের, ১৯৭২ এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকশনে ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রমুখ বামপন্থী দল তাদের প্রতি আবার মানুষের সন্দেহের উদ্রেক করিয়েছে, করিয়েছে এর পরেও। প্রতি বছরের ২৪শে এপ্রিলই অনুরূপ প্রমাণ রাখছেন ভারতবর্ষের 'একমাত্র সাম্যবাদী দল' (?) সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার।

টেস্‌টে ফরোয়ার্ড ব্লক পাশ করেনি সুভাষ-ভক্ত এই 'বঙ্গজ ভারত নাগরিক' অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে সে কথাই বলতে চায়। বস্তুতঃ ভারত-বর্ষের দুর্ভাগ্যই এটি। [ভারতবর্ষ না বলে এটাকে সংকুচিত করে এনে পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য বলাই উচিত কেননা ফরোয়ার্ড ব্লক সর্বভারতীয় পার্টির[১০৪] সম্মান পেতে পারে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।] কেননা দেশের চেয়েও যাঁর নিজের আমি-মার্কা কথাবার্তার দিকে নজর ছিল বেশী, জালিয়ানওয়ালাবাগে হত নিজের দেশের লোকের প্রাণের চেয়ে যাঁর ব্রিটিশ অথরিটি ইরিটেটেড হবার আশঙ্কার ভয়টাই বড় ছিল, এইরকম নীতিহীন রাজনীতিকের পার্টি কংগ্রেস এনলার্জ করে দেশের মানুষের বুকে পা দিয়ে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকলো আর যিনি দেশ ছাড়া কিছু বোঝেন নি, মানুষের প্রতি দরদ ও অন্য মতাবলম্বীদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও অ্যাড্‌জাষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেই স্বচ্ছ চিন্তাধারার মানুষটির পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক মাত্র নাম-কা-ওয়াস্তে পার্টি হয়েই থাকলো।

নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আছে জন্যই বহু বছর ধরে তাঁর পার্টির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু হতাশ হতে হল। এখন লেফট্‌-কনসোলিডেশনের সময় এসেছে, তাঁরা আবার নয়বামে ঝুঁকেছেন,

১০৪। বসু পরিবারের অমিয় নাথ বসু শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ এ 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পরিত্যাগ করে 'আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘে' যোগদান করেছিলেন [হয়ত এটাকে সর্ব-ভারতীয় সংস্থা হিসাবে ভেবে সেদিকেই ঝুঁকেছিলেন। অবশ্য আমি খুব নিশ্চিত নই তিনি সেদিন আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন, না তিনি ও পার্টির স্রষ্টা—যেমন বীর সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখের হিন্দু মহাসভা পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় 'জনসংঘ' নাম পেয়েছিল। হতে পারে তারই অনুকরণ ছিল। সে যাক, সর্বভারতীয় 'আজাদ হিন্দ্‌ সংঘে'র অমিয় বসু ভালোভাবেই হেরেছিলেন যদিও ফরোয়ার্ড ব্লকের (অথবা নির্দলীয়?) পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে ১৯৬৭ সনে নামকরা ব্যারিষ্টার শচীন চৌধুরীকে (ডি-ভ্যালুয়েশন এঁকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ডি-থ্রোনড করেছিল) তিনি অনায়াসে পরাজিত করেছিলেন।]

ভালো কথা, তবে সময় বলবে অগ্নিপরীক্ষায় (অ্যাসিড্ টেষ্টে) তাঁরা উত্তীর্ণ হবেন কিনা। ফরোয়ার্ড ব্লকের আর একটি অংশের নাম ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী), রাম চ্যাটার্জীর এই ছোট্ট পার্টি কিন্তু আজ সাত বছর ধরে তাঁদের দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছে বরাবর এক শিবিরে অবস্থান করে, কাজটা খুব সহজ ছিলনা। যদি মনে করা যায়, সুভাষচন্দ্র স্থাপিত এই পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট) অন্ততঃ বামপন্থী স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে, তবু বলতে হয় এপার্টিও এমন কিছু বড় পার্টি হতে পারেনি যাতে সুভাষ-অনুরাগীর বুক গর্বে ফুলে উঠতে পারে। তবু বলতেই হবে, এই দল যতই ছোট হোক, এঁরা নিজেদের চিন্তা ও কর্মধারাব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

১৯৫৩ সনের ৫ই মার্চ জোসেফ কে. স্তালিন মর্তধাম হতে তিরোহিত হন। এর বছর দুয়েক পরে রাশিয়ার তৎকালীন চালকবৃন্দ বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ এদেশে আসেন, বিপুল সংবর্ধনা পান তাঁরা দিল্লীতে, খোদ কলকাতা শহরেও। আমরাও সে তালে নেচেছি সেদিন এবং পরবর্তীকালেও বহু বছর। সফল প্রচাবকারীদের কর্মদক্ষতায় ৬কে ৯ই শুধু করা যায় না, ৬৬ ছাড়িয়ে ৬৬৬তেও তোলা যায়, এটা বহু পরে হলেও আজ বুঝেছি। নিকিতা ক্রুশ্চেভ পয়গম্বর হিসাবে এই অরাজনীতিক মনের কোণে স্থান অধিকার অনেকদিন ধরে করে বসেছিলেন—সার্থক বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব বাঙ্গালী-ভাবালুতাও এই নিবেদিত-মন সৃষ্টির সহায়ক ছিল। স্তালিনের কবর যেদিন খুঁড়েছিলেন, সেদিন সহজ-মনটার উপর আঁচড় পড়েছিল, কিন্তু ক্রুশ্চেভ বলে কথা, তাতে মজা-মনে খচখচানি হলেও অপ্রিয় প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দিয়েই থেকেছি—অসঙ্গতিটার যুক্তিভিত্তিক বোঝাপড়া নিজের মনের মধ্যে বহুকালই করে উঠতে পারিনি। ক্রুশ্চেভ যেন একটা সংস্কারের মত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সবটাই প্রচারকারীদের হাতযশ আর আমাদের বরাত!

দিন গড়িয়েছে, '৬২ সন এসেছে, '৬৩তে কেনেডির অপমৃত্যু ঘটবার কিছুদিন পরে ক্রুশ্চেভের অপসারণ ঘটিয়ে রাশিয়ার বর্তমান শাসক গোষ্ঠী আমাদের মত সাধারণ লোকের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়েছিলেন এটা আজও মনে আছে। তারপর দিন আরো কেটেছে, ১৯৬৭-৭১ এর মধ্যে ডামাডোলের বাজারে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি বুঝতে গিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সম্পর্কে ও একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। আজ ক্রুশ্চেভের সঙ্গে তাঁর অপসারণকারীদের কোন তফাৎ আর খুঁজি না—সংশোধনবাদীদের মধ্যে কোন গ্রেডেশন করে লাভ নেই। কোসিগিন-ব্রেজনেভ ডুয়েল আর ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন এগু কোং এক পংক্তিরই লোক, একথা দেরীতে হলেও ধরতে পেরেছি। সুভাষচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মন-কাড়া লেনিনের স্বপ্নের দেশ বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার চরম দুর্গতির কারণ ঐ সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ ও কোসিগিনেরা।

লেনিনের তিরোধানের পরে তাঁর আদর্শ অনুসরণকারী স্তালিন দুযুগের ও উপর দেশের ভার বহন করেছেন। তাঁর উনত্রিশ বৎসরের শাসনকালে তিনি লেনিন প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দেশের প্রভূত উন্নতি করেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দেশ রিভিশনিষ্টদের কবলে বাঁধা পড়েছে। তবে শোধনবাদীরা যে তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—এর প্রমাণ মিলেছে।

যে কবির জীবনকালে নিজের কোন কবিতার বই ছেপে বের হয়নি সেই সার্থক কবি সুকান্তের কবিতার সঙ্গে একাত্ম যারা কখনও হয়েছেন তারা জানেন বিংশ শতাব্দীর এই বিপ্লবী কবির কলঙ্কের কথা। যাঁর 'কলম' দিয়ে 'চারাগাছ', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'লেনিন' বেরোয় তাঁর লেখনী দিয়ে গান্ধীজি স্তুতি কেমন করে আসে এ জিনিস বহু দিন ধরে বুঝতে পারিনি। কবি হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথ'কে ছাড়িয়ে মন যখন 'নজরুলে' (মুজফ্ফর আহ্মদ কাজীর বন্ধু ছিলেন) চলেছে, সেই কমিউনিজম ঘেষা নজরুলের গান্ধী-ব্যঙ্গ মন

টেনেছে কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠক কবি 'সুকান্ত ভট্টাচার্যে'র 'মহাত্মাজীর প্রতি' বহুদিন মনের মধ্যে একটা কিন্তু-ভাব এনেছে। সুকান্তর অন্যান্য কবিতা পড়ে শ্রদ্ধায় মাথা যখন নুয়ে পড়েছে. ঠিক সেই সময় ঐ কবিতার দিকে চোখ পড়লেই (প্রায়ই কবিতাটাকে অবশ্য এড়িয়ে চলতে চাইতাম, তবু কখনো সখনো চোখ আটকিয়েও যেতো) কবির প্রতি অভিমান নিজের মনের মধ্যে স্পষ্ট টের পেতাম। বহুদিন ধরে চিন্তা করেছি কিন্তু ধরতে পারিনি কেমন করে এটা সম্ভব হল। একজন মনে-প্রাণে বিপ্লবী কবি কেমন করে নেতিবাচক গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন! (সুকান্ত রবীন্দ্রনাথ প্রশস্তি দিয়ে কবিতা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করতে ও ভালো বাসতেন এমন কি রাবেন্দ্রিক হাতের লেখাতেও আগ্রহী ছিলেন এর প্রমাণ আছে অথচ আশ্চর্য, বিপ্লবী-বিদ্রোহী কবি নজরুল সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্যরকম নীরবতা সুকান্ত-অনুরাগীদের কাছে চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছে, এটা সত্যিই অদ্ভুত। যাহোক, সে অন্য কথা)। এর জবাব হালে পেয়েছি। 'অমানবিক' লেখক 'কৃষ্ণ চক্রবর্তীর [১০৫] 'সুকান্ত স্মৃতিকথা মূল্যায়ন' কিনেছিলাম প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত পরে। তার ২৩ পৃষ্ঠায় আছে : 'মার্কস্‌বাদী বিপ্লবী তত্ত্বকে যারা গান্ধীবাদ দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে চাইছে, সেই সব দলত্যাগী [১০৬]

১০৫। বামপন্থী সংবেদনশীল মন যাঁদের, তাঁদের কাছে 'কৃষ্ণ চক্রবর্তী' একটি নাম আজ যেমন পার্লামেন্টে-রিয়ান হিসাবে 'জ্যোতির্ময় বসু'। এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রাজনীতিক এবং বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সঙ্গে অল্প দিনেরই পরিচয় আমার, তাও সাক্ষাৎ নয়, তাঁর লেখার মাধ্যমেই। সে যাক, আনন্দ-বাজার, যুগান্তর, ষ্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড প্রমুখ পত্রিকার পাঠকেরা হয়ত এঁর নামও শোনেন নি। ঐ সব নামী পত্রিকায় উনি লেখেন না, কৃষ্ণ চক্রবর্তীর লেখার ভার বহন করবার ক্ষমতা কোথায় ওসব পত্রিকার ?

১০৬। এস্থলে কৃষ্ণ চক্রবর্তীর একটু সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক, অনেকেই বলতে পারেন সি. পি. আই থেকে বস্তুতঃ সি. পি. আই (এম)ই

বিশ্বাসঘাতকেরা এই কবিতাটিতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে, কিন্তু আমরা জানি তখনকার কমিউনিষ্ট পার্টির গান্ধীজী সম্পর্কিত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীই এই কবিতাটির জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী।' এই কথা কয়টি আমার যুক্তিবাদী মন গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ এছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। শোধনবাদী নেতৃত্বের কি ক্ষমতা। তারা সুকান্তের মত বিপ্লবীকেও সাময়িকভাবে হলেও নির্জীব করতে পেরেছে, অত উজ্জ্বল স্পষ্ট চরিত্রকে ম্লান করেছে!

একুশ বছরে তিরোহিত সৃষ্টিছাড়া সার্থক কবি সুকান্তকে মাথায় রেখে আমরা তাঁর পার্টিকে আবার বিশ্লেষণ করি।

ঠিকমতো বিচার করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি দৃশ্যতঃ ১৯৬৪ এ দুভাগে বিভক্ত হলেও ভাঙ্গন তাদের মধ্যে বহুদিন আগেই সুরু হয়েছিল—শোধনবাদীদের একটা বড় অংশ দলের মধ্যে অনেক বছর ধরেই কাজ করতো যদিও তাদের আইডেনটিফাই করতে সময় লেগেছে। এ সম্বন্ধে আরও অগ্রসর হবার আগে হৃষি ব্যানার্জির সাহায্য নেওয়াই শ্রেয়। তিনি লিখছেন: "পার্টির উত্থান-পতনের ইতিহাস যারা জানেন, তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হয়েও, অনেক সময় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ নিজেকে কিভাবে সংযত রাখতেন। একটা ঘটনা আজ আমার বেশ মনে পড়ছে। তখন পি. সি. যোশীর[১০১] যুগ।' আমরা তখন 'কংগ্রেস-লীগ এক হও' স্লোগানে রাস্তাঘাটে মুখর। আর সেই সময় তিনি একান্তভাবে পার্টির প্রেসের কাজে নিমগ্ন।

বেড়িয়ে এসেছে, অরিজিন্যাল পার্টি মেম্বার সি. পি. আইদের কেন উনি দলত্যাগী বলছেন! এখানে শোধনবাদীর 'বিচ্যুতি' টাকেই উনি 'দলত্যাগ' বলছেন এটাই বুঝতে হবে।

১০১। কমিউনিষ্ট পার্টির তদানীন্তন জেনারেল সেক্রেটারী, আজ যে পোষ্টটি অলংকৃত করে আছেন রাজ্যেশ্বর রাও। ইনি আবার হালে (জুন, ১৯৭৪এ) 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধি পেয়েছেন রাশিয়া থেকে।

ঐ স্লোগানের কোন অংশে তিনি নিজেকে জড়িয়ে দেন নি। তাঁর ভয়ঙ্কর নীরবতা লক্ষ্য করে আমি তাঁকে ভাব কারণ জিজ্ঞাসা করলে, অনেকক্ষণ পর তিনি উত্তর দেন, 'ওরা হচ্ছে এই মতবাদের শত্রু, ওদের সঙ্গে এক হওয়া কিভাবে সম্ভব[১০৮]?' আমরা সকলেই জানি প্রচারবিমুখ এই কমরেড আহ্মদ জীবনের শেষ দিন (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩) পর্যন্ত মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বহু বছর ধরে সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস যাদের ক্যাপিটাল, চল্লিশ দশকে সেই দলের সংকীর্ণতাবাদী গোঁড়ামি এবং বিচ্যুতি ও দুঃখজনকভাবে লক্ষ্যণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম করেছিল নাবিক-শ্রমিকেরা তাদের ঐতিহাসিক 'নাবিক বিদ্রোহ' এর মাধ্যমে। সংগ্রামী কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে বিদ্রোহীরা যোগ্য সাহায্য স্বভাবতঃই আশা করেছিল কিন্তু ইতিহাস বলছে সেদিনকার নেতৃবৃন্দ তাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা সঠিকভাবে পালন না করে নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'গান্ধী-জিন্না মিলন' ভিত্তিক স্লোগানকে আঁকড়ে ধরে চলার ফলেই এই নিগেটিভ অ্যাটিচুডটার জন্ম নিয়েছিল, এটা মনে করার পেছনে যুক্তি আছে। পার্টিশনের ব্যাপারে কংগ্রেস অসহযোগিতা কমিউনিষ্টরা সেদিন সক্রিয়ভাবে করতে পেরেছিলেন, একথা মনে করতে দ্বিধা লাগে যখন দেখা যায় জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বটা শেষ পর্যন্ত সকলের কাছেই প্রাধান্য পেয়েছিল।

'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' এ স্লোগান অনেক পরের। কিন্তু যেভাবে আজাদী এসেছিল তাতে পুরো অসমর্থন কমিউনিষ্ট পার্টির ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সহযোগিতা এবং পরবর্তী নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, একথা বলা বোধ হয় চলে না।

১০৮ হৃষি ব্যানার্জি—'সত্য সন্ধানী কমরেড মুজফ্ফর আহমদ'। মাসিক বাঙলাদেশ, মুজফ্ফর আহ্মদ সংখ্যা পৌষ, ১৩৮০।

আজাদী আনয়নে সুভাষচন্দ্রের ভাবধারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, এটা লেনিন, ডি. ভ্যালেরা, স্থগলের কথা শোনা সত্ত্বেও আমিও জোরগলায় বলতে পারছি না—বললে সেটা অন্ধ-সমর্থকেরই কাজ হবে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কেউ তাঁকে তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনিও অনুরূপ উত্তরই দিতেন বা দিয়েছেন বলে আমার ধারণা তবু বলবো ওঁদের সকলের তুলনায় ওঁর ভাবধারা অনেক স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তাঁর আন্তরিকতায় ও কর্মপ্রচেষ্টায় বিন্দুমাত্র খাদ ছিল না, এটাই সবচেয়ে বড় কথা এবং এই কারণেই সুভাষচন্দ্র অনন্য। এত বড় একক চেষ্টা আই. এন. এর সর্বাধিনায়ক ছাড়া আর কেউ কখনও করেছেন কিনা জানিনা। জাপান জার্মানীর মত ফ্যাসিবাদী শক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিলেও নিজের মান খুইয়ে তা করেন নি; এটা নিছক ভাবাবেগের কথা নয়, যুক্তির কথা—আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস তাই বলে। জাপানীরা আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের কখনো অসম্মান করতে পারেন নি ১১ বার সেরকম কিছু হলেও তা থেকে ওঁরা পার পাননি সুভাষচন্দ্রের সচেতন আত্ম-মর্যাদাজ্ঞানের জন্য। ব্রিটিশের সঙ্গে ব্যবহারেও তিনি বারে বারে দেশের নেতৃত্বকে বাহিরে থেকে বেতার মারফৎ যে সাবধানবাণী পাঠি-য়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে কংগ্রেস এবং সেদিনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের পক্ষে সঠিক পথদিশারী হতে পারতো। ফ্যাসিবাদী শক্তির সহায়তা লওয়ায় যত কটাক্ষই করে থাকুন, কমিউনিষ্ট পার্টির সেদিন-কার স্ট্যাণ্ডটাকেই বেশী ধোঁয়াটেযুক্ত মনে করবার কারণ আছে। হতে পারে দলের মধ্যে আত্মগোপনকারী শোধনবাদী গ্রুপের অধিক-তর শক্তিই হয়ত কম্যুনিষ্ট পার্টির স্লেটটা ক্লীন রাখতে দেয়নি। আজকের শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নেতৃত্বে ক্রেমলিন থেকে ছাপমারা সি পি.আই ইদানীংকালের মিসেস গান্ধীর কংগ্রেসে প্রগতিশীলতা খুঁজে বের করে তাদের সহযোগিতা করেন; সুদীর্ঘ তিন যুগ আগেও একই এস. এ. ডাঙ্গে তাদের মুখপত্র 'সোস্যালিষ্ট' পত্রিকায় সেদিনের

মিঃ গান্ধীর কংগ্রেস সম্পর্কে লিখেছিলেন : "কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থীদের আমরা পরামর্শ দিই : আসুন আমরা সবাই মিলে কংগ্রেসের মধ্যেই একটা প্রগতিশীল দল গড়ি ও তার নাম দিই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদল।"

সে বিতর্ক আর অনুমানের কথা রেখে বলা যায় আজকের শোধনবাদী নেতৃত্ব বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে বিরাট সমস্যা। লেনিনের উত্তরসূরীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের ফলে বিশ্ব-রাজনীতিতে এর প্রতিফলন এসেছে। মাও-সে-তুঙের চীন এবং কোসিগিন-ব্রেজনেভ নামক সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের[১০৯] রাশিয়ার মধ্যে স্বভাবতঃই মিল হওয়া সম্ভব নয়, এর বিরাট রিঅ্যাকশন এসেছে ভারতের রাজনীতির ওপর। সংশোধনবাদী নেতৃত্ব রাশিয়ার পুরোভাগে থাকায় এখানকার কংগ্রেসী ঘেঁষা সি. পি. আই এখানে সুবিধাভোগী দল। তারা 'গাছেরও খাবো তলার ও কুড়াবো' নীতি ভালই চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের, সাধারণ মানুষের সুখশান্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। এদের নেতৃত্ব সেদিন কমিউনিষ্ট পার্টি চালনা করে থাকলে, এটা অসম্ভব কিছু নয়, যে সেদিনের কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তা ও ভাবধারা এবং কর্মধারা একটু অস্বাভাবিক ঘেঁষা হবে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রীজির দেড় বছর বাদ দিলে ১৫ বছর কাল ভারতবর্ষ নেহরু পরিবারের কাছে গচ্ছিত আছে। আমাদের দেশ এই তুযুগ ধরে সমাজতন্ত্র অথবা তার ধাঁচের দিকে নাকি অগ্রসর হচ্ছে, এই কবছর ধরে পথে-প্রান্তরে সভায়-সমিতিতে মঞ্চে-মণ্ডপে

১০৯। সোশ্যাল ডেমোক্রাটের বাড়া গাল নেই কম্যুনিষ্টদের অভিধানে। তা' এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পীঠস্থান হয়ে পড়েছে আজকের রাশিয়া। বিশ্বের কামিউনিষ্ট অগ্রগতি বস্তুতঃ মার খেল পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের বর্তমান চালকদের বিচ্যুতির ফলে। ভারতবর্ষের রাজনীতির উপরও প্রচণ্ড প্রতিফলন এলো সি. পি. আই ও তাদের সুহৃদদের জন্য।

হাজার হাজার বক্তৃতা এই পরিবারের দুই প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা দিয়েছেন, দিচ্ছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্র বা তার ধাঁচের আঁচটা সম্বন্ধে মানুষকে কিছুই বলেন না। ভারতবর্ষের নাম করা সমাজ তান্ত্রিক (!) ঘনশ্যাম দাস বিড়লার ভাষায় 'আমাদের ধ্বনি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। কিন্তু কেউ জানেনা ঠিক ঠিক এর অর্থ কি'?

সমাজতন্ত্র বা তার ধাঁচ সম্পর্কে ইনট্রোডিউসার প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের কেউই তাঁদের ধারণার সঙ্গে পরিচয় না করালেও এদেশের একদা উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইই বোধ হয় একমাত্র[১১০] সরকার পক্ষীয় লোক যিনি সোশ্যালিজম্ সম্পর্কে কিছু আলোকসম্পাত করেছিলেন। (ইদানীং কালে আরও দু' একজন মন্ত্রী যেন ও সম্বন্ধে বলেছেন সেকথায় এখানে আর যাচ্ছি না।) "In the 1957 and 1962 elections the Congress fought for what is called 'a Socialist pattern of society.' In 1964 the objective was changed to 'Socialism and Democracy.' At no time were these expressions precisely defined. The Congress has always prospered by leaving policies vague The only leader who came to nearest, to defining the party's 'socialism' was Morarji Desai, who, after being thrown out of the Union Cabinet in 1969, said that by the term he meant a society as it existed in the USA, France and Scandinavian States! He seemed to have spoken the truth."[১১১] কিছুদিন আগে 'এশিয়ার মুক্তিদাত্রী' (কিন্তু ভারতবর্ষের নন) বর্তমান

১১০। একমাত্র না বলে প্রথম বলাই এখন ঠিক।

১১১। Ranajit Roy 'The Agony of West Bengal' Page 148.

ইণ্ডিয়ান প্রাইম মিনিষ্টার এক জনসভায় বলেছিলেন তিনি নাকি তাঁর সব প্রতিশ্রুতিই রেখেছেন। কোন্‌ প্রতিশ্রুতি রাখিনি বলুন এ প্রশ্ন মানুষের কাছে তিনি রেখেছিলেন। 'গরীবি হটানো' প্রভৃতি অনেক আশ্বাস প্রতিশ্রুতি তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন—ওঁদের আশ্বাসে বিশ্বাস আজ আর কেউ করে না সে অন্য কথা—কিন্তু সর্বপ্রথম যে প্রতিশ্রুতির কথা তাঁদের মুখ থেকে মানুষ শুনেছিল তার নাম 'Socialism and/or its pattern' তা' ঐ এক নম্বরী প্রতিশ্রুতিটি দেখছি সত্যিই পালন হয়ে গিয়েছে, শুধু অজ্ঞান মানুষেরা বুঝতে পারছে না এই যা। ইউ.এস.এ, ফ্রান্স, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান টাইপের 'সমাজতন্ত্র' এদেশে তো তাঁরা এনেই ফেলেছেন। কত ফুল বেলপাতা দিয়ে এদেশের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সমাজতন্ত্রী বাহিনীর পূজো চলছে, প্রশংসা মিলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমগোত্রীয় দেশগুলোর কাছ থেকে তা থেকেই বোঝা যায় 'মার্কিনী সমাজতন্ত্র' এদেশে কায়েম হয়ে গিয়েছে।

যে কথাটা হচ্ছিল—সমাজতন্ত্রের ধাঁচের আঁচটা সম্পর্কে এরা মানুষকে কিছু বলেন না, ফলে দেশবাসীও ঐ একান্ত কাম্য জিনিসটার স্বরূপ জানতে পারেন নি অথচ দেশটাকে নাকি ঐ পথেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সমাজতন্ত্র কি জিনিস সেটা জানলে জনসাধারণও সে পথে অগ্রসর হবার জন্য সাহায্য করতে পারতো কিন্তু সরকার জনগণের সাহায্য ব্যতিরেকেই সেটা করতে ইচ্ছুক। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা আমাদেরও স্পষ্ট নয় তবে এটুকু জানা আছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশে বেকার থাকে না, নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়, দ্রব্যমূল্যের স্থিতাবস্থা হয়—পুঁজিবাদে দাম বাড়ে, সমাজতন্ত্রে বাড়ে না। আমাদের অজানা নয় যে চীনে চাল, আলু, মাছ, দুধ, ডিম প্রভৃতি জিনিস আমাদের দেশের চেয়ে বহু সস্তা এবং সবচেয়ে বড় কথা ঐ সব জিনিসের দাম ১৯৬৬ থেকে একদম

বাড়েনি ববংচ কোন কোন ক্ষেত্রে কমেইছে।[১১২] আমাদের কাছে এগুলো রূপকথা মনে হয়। তা নয়, সেখানকার মানুষই এসব করেছে তবে চালনা করেছেন মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিনের সার্থক পদাঙ্ক অনুসরণকারী মাও-সে-তুঙ। সদিচ্ছা এবং কর্মক্ষমতা যদি একসাথে যুক্ত হয় তবে অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়। 'সদিচ্ছাবান জনসাধারণ' না থাকাতেই হয়ত আমাদের দেশ থেকে 'দারিদ্র্য হটানো' যাচ্ছে না নচেৎ চেষ্টা তো প্রচুরই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। হ্যাণ্ডিক্যাপও অনেক, প্রতিক্রিয়াশীলরা আছে তারা বড্ড ক্ষমতাবান ও অসৎ প্রবৃত্তির, তারপর তাদের রং ও ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, আজ যে 'গরীবি হটানো'[১১৩] অভিযানের শপথ নেয় কালই

১১২। '১৯৬১-৬২এ জিনিস পত্রের দামের স্তরকে ১০০ ধরলে, ১৯৭১-৭২ এ তা হয়েছে ১৯২'৩, ১৯৭২-৭৩ এ ২১৮'১, ১৯৭৩ এর জুলাই মাসে ২৪৭'৩। সপ্তাহে ১' থেকে ২% হারে দাম বাড়ছে এবং সে হিসাবে এই মুহূর্তে দামের স্তর ২৬০ ছাড়িয়ে গেছে।

(একটী তুলনা)

ভারত ও চীনের দামের স্তর

দ্রব্যের নাম	চীন : ১৯৬৬ ●	ভারত : ১৯৭৩
চাল (১ কেজি)—	৬০ পয়সা	২'৫০-৪'০০ টাকা
আলু ,,	১৫ ,,	১'০০-২০০ ,,
মাছ ,,	৩'০০-৬'০০ টাকা	৮'০০-১২ ০০ ,,
দুধ ,,	৬০ পয়সা	১'৫০-২০০ ,,
ডিম (১ জোড়া)	২৭ ,,	৭০-৮০ পয়সা

●সূত্র : China—Other Communism—K. S. Karol (P. 220)

১৯৬৬ সনের পর চীনে এসব জিনিসের দাম তো বাড়েই নি, উপরন্তু কমেছে'। পৃঃ ১৪৭, অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৪।

১১৩। বৃটিশ আমলের স্পেশাল থার্ড ক্লাশ ট্রেন যাত্রী ব্যারিষ্টার গান্ধীর উত্তরসূরীরা দেশ থেকে দারিদ্র হটাতে চান, চান আকালকে দূরে রাখতে।

সে সরে পড়ে, একলা[১১৪] প্রধানমন্ত্রী অথবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে তো আর অতবড় দুরূহ কাজটা সাত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব নয়!! সবচেয়ে বড় হ্যাণ্ডিক্যাপটির নাম ইমারজেন্সি পিরিয়ড। জরুরী

দারিদ্র যারা জীবনে দেখেন নি, অর্থাভাবে ভাতের থালায় টান জীবনে যাদের পড়েনি তাদের কাছ থেকে গরীবি হটাবার বক্তৃতা ১১৫ শুনতে হচ্ছে এ দেশের আসল দরিদ্রদের। দারিদ্র্য দেখেছে ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর জন লোক, দেখেছি আমরা— ঘরভাঙা ১১৬ বাঙালীরা-মধ্যবিত্তরা-নিম্নবিত্তরা দেখেছি, কি সে দুঃসহ জ্বালা, দারিদ্রের কি দুঃসহ জ্বালা!

উত্তরাধিকার সূত্রে যারা তহবিলদারী জোটালেন তাদের আয় ব্যয়ের বাৎসরিক ব্যালান্স-সীটটা সন্দেহের চোখে দেখতে হবে বই কি— দূরবর্তী অতীত, ঘটমান অতীত ও বর্তমান কোনটাই যখন গৌরবময় নয়।

১১৪। কবে যেন '৭১ এই বোধ হয় 'গরীবি হটাও' নামক একটি স্লোগ্যানের পত্তন হয়েছিল। এই স্লোগ্যান আল্লাযিকা ইন্দিরা গান্ধীর আর একটি বাণীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ (দুই বছরের মধ্যেই) এর খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়। মুখে স্বীকার, আক্ষরিক অর্থে, না করলেও তার এই ভারত-বিখ্যাত আর জগৎ-খ্যাত বাঁধা বুলিটির গঙ্গাপ্রাপ্তি যে ইতিমধ্যেই ঘটেছে তা মনে করতেই হচ্ছে নিম্নোক্ত সংবাদ থেকে—

"প্রতাপগড ১৬।২।৭৩…গরিবী হটাও সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন: এক-জনের পক্ষে দু'একদিনের মধ্যে তা করা সম্ভব নয়। …একজন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে দেশ থেকে দারিদ্র দূর করা সহজ নয়।' তিনি আরো বলেন 'তাঁর ধারণা জনগণ যদি দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে অল্প-কালের মধ্যেই দারিদ্র দূর হয়ে যাবে'। (জনগণ বহুকাল ধরে দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, যুদ্ধ করেই নিজেরা বেঁচে আছে অথবা মরণ-বাচনের মাঝ-খানে আছে। তা সেই যুদ্ধ করবার উপদেশ কি দরিদ্র-সমাজের বাইরের কারো কাছ থেকে তাদের আর দরকার আছে?)

১৯৭১এ সংগঠন কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়াশীলদের দূর করে দিয়েপ্রগতিশীলদের নব কংগ্রেস নামক বিরাট নিজের 'হাত শক্ত করা দল' বানালেন, আবার মাত্র ২ বছরের মাথাতেই প্রধানমন্ত্রীজি/মুখ্যমন্ত্রীরা একলা হয়ে গেলেন!

অবস্থাটা থেকে দেশ আর মুক্তি পেল না কোনদিন, কিসের যে 'জরুরী অবস্থা'[১১৭] এটাই শুধু জানা গেল না।[১১৮] আসলে তা নয়,

(ক্ষমতা আছে বটে!) দল বেঁধে কাজ করে অভ্যস্ত নিয়মতান্ত্রিক (!) গণতান্ত্রিক (?) দলের সভ্য-সভ্যারা, ফলে 'একলা চলরে' তো আর করতে পারেন না! অতএব: হে মূঢ় দরিদ্র ভারতবাসী, তোমরা দলবদ্ধ হও, হয়ে প্রধানমন্ত্রীজির কথামত কাজ করো, তোমাদের দারিদ্র সরে যাবে। তোমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রীদের আর বিরক্ত করো না— তাঁরা এখন নতুন অন্য কোন মনোহরা স্লোগান সৃষ্টিতে ব্যস্ত আছেন।

১১৫। এমনভাবে বক্তৃতা দেন যেন ওঁরা দেশের মানুষের কত আপনার জন। তাঁদের সরকারী মুখপত্র গুলো গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে এমনভাবে লেখে যেন সরকার সত্যিই 'অব দি পিপল, বাই দি পিপল এবং ফর দি পিপল'। ১৯৭২ মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে ওরা কোনটাই নন।

১১৬। ওপার বাংলার বাঙ্গালী ঘর ছেড়ে যারা এপারে এসেছে স্বাধীনতার (!) পরে, ঘরভাঙ্গা বাঙ্গালী বলতে তাদেরই শুধু বোঝাই নি, বাঙ্গালী জাতিকে সমগ্রভাবে বুঝিয়েছি। এপার বাংলার বাঙালীদের ঘর কি খাড়া হয়ে আছে? কারো হেলে পড়েছে, কারো একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে ঘাতে-প্রতিঘাতে। শ্যামবাজার আর বাগবাজার এর বনেদী, আধা বনেদী, সিকি বনেদী, এক শতাংশ বনেদীদের কোন্ ঘরটা আজ অক্ষত অবস্থায় আছে? তবু তাদের নাক সিঁটকানি যায় না।

১১৭। পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে ১৪ দিনের যুদ্ধ ২ বছর ১ মাস আগে শেষ হয়েছে কিন্তু জরুরী অবস্থা জেঁকে বসে আছে। কাশ্মীর আর চীনের কাল্পনিক অর্ধ-কাল্পনিক ইস্যুও বহু বছর ধরে জরুরীত্ব প্রমাণে সহায়ক হয়েছে।

'নয়াদিল্লী ১৬ই নভেম্বর '৭৪—আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জানান দেশ থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের কোন আশু সম্ভাবনা নেই।'

১১৮। বুদ্ধুর দলকে পাওয়া গিয়েছিল বেশ—যা বোঝাও তাই বুঝি, যা করাও তাই করি, সাধক রামপ্রসাদের সার্থক বংশধর এদেশের অনুভূতিশূন্য অতএব সহনশীল মানুষগুলো!

শিক্ষার অভাবই দেশের এই চরম অবস্থার একমাত্র কারণ। শিক্ষা মানে মনের শিক্ষা। আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা অর্থাৎ এই ঘুণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থার স্কুল-কলেজী শিক্ষা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাওয়া শিক্ষা নয়। (এরকম ডিগ্রীধারী লোকে তো সমাজটা ভরে আছে!) এই শিক্ষা দরকার দুই তরফেরই যারা সরকার চালাবেন এবং যাদের চালানো হবে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ধাঁচের ইউনিভার্সিটার ডিগ্রী, ডিপ্লোমা কোন সলিউশন নয় এটা বোঝবার সময় এসেছে। এমন শিক্ষা চাই, শিক্ষিত মন চাই যা এই ঘুণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাপ্ত ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রী-ডিপ্লোমা-সার্টিফিকেটের উর্দ্ধে উঠবে। এই শিক্ষিত মনই নিজেকে পথ দেখাবে, অন্যের পথদিশারী হবে।

যাক্ যে কথা আগে বলছিলাম তাই বলি। সুভাষচন্দ্র অনন্য, চিরতপস্বী এই দেশপ্রেমিকের কোন তুলনা নাই। আর দশজনকে মাপবার মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে মাপা চলে না। তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। দেশে সত্যিকার পাওয়ার অব দি পিপল আনবার জন্য সব কিছুই উনি করতে পারতেন। যিনি নিজের গড়া পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লকের বাঘ মার্কা পতাকা পরিত্যাগ করে অনায়াসে ত্রিবর্ণরঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা পুণঃগ্রহণ করতে পারলেন, মানুষের কল্যাণ কামনায় প্রয়োজন বোধে লাল বাড়ী রাইটার্স বিল্ডিংসের রং মিলিয়ে সত্যিকারের সমাজবাদের পতাকা উত্তোলন করা বিন্দুমাত্র অসম্ভব ছিলনা তাঁর পক্ষে, দিল্লীর রাষ্ট্রপতিভবন১১৭ ও তা থেকে মুক্তি পেত না।

১১৭। আজাদ হিন্দ্ সর্বাধিনায়ক ব্রিটিশ অধিকৃত দিল্লীর লাল কেল্লায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়াতে চেয়েছিলেন, তাঁর দলের সৈনিকরা ভারতের বাইরে থেকে আওয়াজ তুলেছিলেন 'দিল্লী চলো'। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিজে হাতে ওড়াতে পারেন নি, না তাঁর সৈনিকেরা বিজয়ীর বেশে দিল্লী আসতে পেরেছিলেন।

যা হবার তা হয়নি। দেশ সমাজবাদ-আকাঙ্খীর হাতে নেই, কতকগুলো অসামাজিক মানুষের হাতে পড়ে এতবড় মহান দেশটার গঙ্গাপ্রাপ্তি হতে চলেছে।[১২০]

আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ১১-১০-৪৩ এ নেতাজী বলেন: 'বন্ধুগণ ..মনে রাখবেন, স্বাধীনতা অর্জনের উপযুক্ত মূল্য আপনাদের দিতেই হবে। ভিক্ষায় কোনদিন স্বাধীনতা আসে না। আসে শক্তি ও বলের বিনিময়ে। আসে রক্তের বিনিময়ে। আমরা কোন বিদেশীর কাছ থেকে নিশ্চয় স্বাধীনতা ভিক্ষা করব না। যথাযোগ্য মূল্য দিয়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করব ... ।' ১৮ বছরের যুবক সুভাষচন্দ্রই ছে-চল্লিশ বছরের নেতাজীর কথাটার জবাব ঠিক করে রেখেছিলেন: Something cannot come out of nothing [১২১] সুভাষচন্দ্রের অভাবে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব ছিল দিশাহারা, কংগ্রেস পার্টির সেদিনকার অ্যাসেটস্ নাথিং, তাই সেই দলের নেতাদের হাত দিয়ে আসা 'স্বাধীনতা' এবং রাখা শাসনভার এদেশকে সামথিং ও দিল না।

তবু সুযোগ পেলে এবং প্রয়োজন বুঝলে বিবর্তনবাদে পুরো আস্থাশীল নেতাজী তেরঙ্গার বদলে একরঙ্গা লাল কাপড় ওড়াতেন অনায়াসে।

১২০। 'সুরের পিয়াসী' নজরুল বৃটিশ-অসুরের সম্পর্কে বহু বেসুরো কথা বলেছিলেন বিশের দশকে। সেই কাজী নজরুল ইসলাম একথাও বলেছিলেন: 'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তাহারাই হন'।

এই উপ-মহাদেশটির মাটিও আজ সমাজতান্ত্রিক (!) সমাজ বিরোধীদের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২১। 'Something cannot come out of nothing. Man proceeds from Truth to higher Truth. We must pass through inconsistencies. They fulfil life'. ১৬. ৯. ১৯১৫। পত্রাবলী, পৃঃ ৫৯।

সুভাষ চেয়েছিলেন পাওয়ার অব দি পিপল—সেটা কি জিনিষ ভারতবর্ষ আজও তা জানে না। জনদরদী কথা হামেশাই কানে আসে, যদিও আসলে জনগণ পুরোপুরি উপেক্ষিত।

ওরা বলেছিল সুভাষ দেশদ্রোহী, ধরিত্রী জানে তা উনি নন্। তিনি আমাদের দেশগৌরব। দেশের শত্রুতে দেশ আজ ভরে উঠেছে। পৌষের শেষে মাঘের প্রথমে ৩ টাকা কিলো চাল, ১৫ টাকা কিলো তেল আর বায়বীয় বেবীফুড সামনে নিয়ে বোঝা দরকার—সত্যিকার কুইস্‌লিং কে? কারা দেশদ্রোহী?

অষ্টাদশ শতাব্দীর মীরজাফরকে দেখি নি কিন্তু চিনি—ইতিহাস আমাদের চিনিয়েছে। সিরাজদৌল্লা দেখেছিলেন কিন্তু চেনেন নি সময়মত। চিনলে মোহনলালের শেষ নিঃশ্বাসটা হতাশায় পর্যবসিত হত না। বিংশ শতাব্দীর মীরজাফরদের পরিচয় ও আর গোপন থাকলো না। আতঙ্কিত মীরজাফররা মানুষের ক্ষমা পাবে না!

নেতাজী জিন্দাবাদ!

মোহনলাল জিন্দাবাদ।

বিপ্লব... জিন্দাবাদ!

১২২। বিপ্লবের কথাও নেতাজীই বলেছিলেন, ওটা অন্য কোথাও থেকে ধার করা এটা যেন কেউ মনে না করেন।

২৩.১.৭৬ (প্রথম পর্ব মোটামুটিভাবে সমাপ্ত)

[পরিশেষে ঃ স্ফুলিঙ্গ লেখাটি শেষ হয়ে গিয়েছে। টেবিলের উপর পড়ে থাকা ৯ই জানুয়ারীর সংবাদপত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সেটি থেকে বরং চ জুজন এম. পির বিবৃতি পড়ে শোনাই। সংসদ সদস্যা, "প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন: 'সমস্যা মোকাবিলায় বিরোধীরাই১২৩ সরকারকে বাধা দিচ্ছে। বিরোধী দলগুলি সাহায্য করার পরিবর্তে আজকের অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলায় সরকারী প্রয়াসে বাধা দিচ্ছে। ... অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য জনগণকে যে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে সরকার সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু হতাশার কোন কারণ নেই। সার্বিক সহযোগিতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হলে যে বিরাট সাফল্য হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনা।...রাতারাতি গরিবী হটান সম্ভব নয়। এর জন্য বেশ সময় নেবে। সরকার গরিবী হটাতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে পারেন এবং তাই তো করছেন।" (সত্যযুগ ১০.১.৭৪)

এম. পি "শ্রী জ্যোতির্ময় বসু বলেন: 'মানুষ খোরদের এ সরকার মানুষের কল্যাণ করতে পারে না।" গত ৯ঠা জানুয়ারি....এক জনসভায় .. বসু হুঁসিয়ারি দেন ইন্দিরা গান্ধীর সরকার বা তাঁর অধীনের রাজ্য-সরকারগুলি হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি মুনাফাখোর কালোবাজারীদের সরকার। কাজেই এ সরকার যতদিন টিকে থাকবে ততদিন জন-

১২৩। অল্প কজন তো মাত্র বিরোধীপক্ষ টিকটিক্ করছে, না হলে সবটাই তো স্বপক্ষ, বিপক্ষের কি বা অস্তিত্ব আছে! তবু তাদের বাধা দেওয়াতেই নাকি সরকারের সব সদিচ্ছা ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। অপোজিশন মেম্বারদের কথা যদি সরকার কখনও শুনতেন তাহলেও বা একটা কথা ছিল!

সাধারণের কল্যাণ ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।.. "১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের খাদ্যনীতি ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে, আর এই সরকারের খাদ্যনীতি হচ্ছে জোতদার, জমিদার, মুনাফাখোর, মজুতদার মিলমালিকদের বাঁচাবার জন্য।" (সত্যযুগ)

এছাড়া আর ও একজনের বক্তৃতাটা ও তুলে দি। উনি অবশ্য এম.পি অথবা এম.এল. এ নন। ১৯৭১ এর হেমন্ত বসু হত্যা সম্বলিত নির্বাচনে অজয় মুখার্জিকে ১১,০০০ ভোটে হারিয়ে এম. এল. এ হলে ও ১৯৭২এ শিবদাস (না শিবপদ বোধ হয়) ভট্টাচার্য [১২৪] সি. পি. আই এর কাছে ৩৯,০০০ ভোটে পরাজিত (?) হওয়া সাধারণ নাগরিক শ্রী জ্যোতি বসু ১০ই জানুয়ারী বলেন: 'শাসক কংগ্রেস দুর্নীতিতে দেশটাকে ভরিয়ে দিয়েছে। এই সরকারের নীতি জনবিরোধী নীতি। জনবিরোধী নীতির দ্বারা কখন ও দেশের মঙ্গল হয় না।...আজ দেশে দিনের পর দিন সংকট বেড়েই চলেছে। এত সঙ্কট এর আগে কোনদিন ছিল না। প্রতিটি জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, অথচ রোজকার বাড়ছে না। বেকারে বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। মানুষের সমস্যার সমাধান করার সদগুণগুলি কংগ্রেসের নেই। কিন্তু বে-আইনী জোর জুলুম, হামলাবাজী সন্ত্রাস, গণ আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার বদগুণগুলো আছে।...এটা অত্যন্ত সাধারণ কথা যে জিনিসের উৎপাদন বাড়লে তার দাম কমে। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টোটি হচ্ছে।... এই জনবিরোধী সরকার মানুষের কখনও মঙ্গল করতে পারে না। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় এটা বুঝে নিতে হবে যে অবস্থা না পাল্টাতে পারলে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।... দমন-পীড়ন নির্বাচনে কারচুপি ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ দ্বারা বর্তমান সরকার সন্ত্রাসের রাজ কায়েম করতে চাইছেন। বর্তমান কংগ্রেসী এম. এল এ, মন্ত্রী ও অফিসারদের দুর্নীতি ও অসদুপায়ে অর্থোপার্জন সমস্ত কংগ্রেসী আমলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।']

(প্রথম পর্ব পুরোপুরিভাবে সমাপ্ত)

১২৪। ভদ্রলোকের নামটা নিয়ে একটু মসকরা করার কারণটা পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিষ্কার হবে যখন তারা 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই' পড়বেন।

নেতাজী বন্দনা[১২৫]

(শুধু ২৩শে জানুয়ারীতেই নয়)

আমার প্রিয় নেতা সুভাষ, তোমায় নমস্কার। তুমি অনন্য—তাই তুমি নেতা হতে নেতাজী হয়েছো, নায়ক থেকে মহানায়ক, মানব থেকে মহামানব হয়েছো। তোমার জন্মদিনের প্রাক্কালে হে বাঙালী মোহনলাল, তোমায় প্রণাম।

সুভাষ-পাগল বাঙালী আমি, সর্বক্ষণ তোমায় চিন্তা করি। ২৩শে জানুয়ারী বিশেষ দিন হলেও প্রতিদিনই তোমায় স্মরণ করি। তোমার সম্বন্ধে যখন যা বই পাই পড়ি, প্রবন্ধ পড়ি, একই জিনিস বারে বারে পড়ি; তোমার সম্বন্ধে যেখান হতে যা জানতে পারি জেনে নিই। তোমায় বুঝতে চেষ্টা করি, তোমাকে বুঝে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আর সকলকে যাচাই করি। আমি তোমায় মুহূর্তের জন্য ভুলি না।

বাঙালী রাজনীতির বলি—আগে ব্রিটিশের, ১৯৪৭এ ব্রিটিশ-কংগ্রেসের, তারপরে দিল্লী কংগ্রেসের। আমার সেদিন বয়স ছিল ১৯ বছর যেদিন ব্রিটিশ-কংগ্রেস আমাদের ছিন্নমূল করেছিল। ছিন্নমূল হওয়ার নেপথ্য ইতিহাস ইতিহাসের ছাত্র[১২৬] না হয়েও জানতে চেষ্টা করেছি প্রাণের আবেগে। দুঃখের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস,

১২৫। ২২. ১. ৭৩ এ লেখা।

১২৬। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ পর্যন্ত 'ইতিহাস' পড়েছি, তবে সে বহু বছর আগে। এর পরে আর ইতিহাস পড়তে হয়নি বাধ্যতামূলক ভাবে, তাই ইতিহাসের ছাত্র নই বললাম।

লজ্জার ইতিহাস পড়ে যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছি তেমনি গর্বিত হয়েছি তোমাকে জেনে, তোমাকে চিনে। বঞ্চিতের জীবনে সুভাষ লাভ ঘটেছে।

তুমি বাঙালীর প্রতীক। তোমাকে চিনেছি বলেই তোমার (বাঙালীর) লাঞ্ছনাকারী-অপমানকারীদের ও চিনেছি। হে মোহনলাল, তোমাকে চিনি বলেই আজকের বাঙালী-মোহনলালদের ও চিনতে পেরেছি-তোমাকে অনুক্ষণ স্মরণে রাখবার ফলশ্রুতি আমার তাদের যাচাই করবার ক্ষমতা। মীরজাফরকে দেখিনি কিন্তু চিনি। অষ্টাদশ শতকের মীরজাফর বৃটিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে, বিংশ শতকের চল্লিশ দশকের ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ মীরজাফররা মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে কংগ্রেস থেকে অসম্মানজনক ভাবে অপসারণ করেছে, সত্তর দশকে আবার তাদেরই দেখলাম কেমিষ্ট্রীর মাষ্টার প্রফুল্ল ডাক্তার ও তার ছাত্র অজয় মুখার্জীর রূপ নিয়ে মিসেস গান্ধী প্রমুখদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বাংলার মানুষকে প্রতারণা করতে। সত্তর দশকের ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছে। বৈঠকখানা-রাজনীতি করায় অবিশ্বাসী আমি তারউপযুক্ত মূল্যায়ন সময়মত করতে পেরেছি তোমার ইতিহাস জানতাম বলে, তোমায় আমি মুহূর্তের জন্য ভুলিনি বলে। তুমি বাঙালী হলেও প্রাদেশিকতা জানতে না, অখণ্ড ভারত তোমার কাম্য ছিল, আমরাও তাই প্রাদেশিকতা জানিনা। বাঙালীই পারে, হ্যাঁ একমাত্র বাঙ্গালীই পারে বছরের পর বছর নিজেদের কোন রিপ্রেসেণ্টেটিভ না থাকা সত্বেও ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট টীমের ইডেন উদ্যানের খেলা দেখবার মানসে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল কাঁপাতে (টিকিট সহজপথে পায় না তার জন্য হয়ত কাঁপানিটা আরও বেশী হয়) জয় হলে আনন্দে আত্মহারা হতে। 'নো মুস্তাক নো প্লে' হাঁক ছেড়ে যে বাঙালীরা ইডেনের বাতাস কাঁপাত, 'মুস্তাকবিহীন' ইডেনে আজও প্লে দেখতে যায় তাদের উত্তরসূরীরা—উৎসাহে ঘাটতি বিন্দুমাত্র নাই,

ঘুঁটে ব্যানার্জী মন্টু ব্যানার্জী এন চৌধুরী পঙ্কজ রায় এর বংশধরেরা ভারতীয় দলে থাকলো অথবা না থাকলো সেদিকে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে। বাঙ্গালীই পারে নিজের দেশকে ওপারে জলাঞ্জলি দিয়ে এসে ও তা বৃহত্তর (?) স্বার্থের জন্য করা হয়েছে ভেবে প্রাদেশিকতাব হীনমন্যতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, এ যে তোমার কাছ হতে শেখা (তোমার দুঃখের দিনগুলিব সঙ্গী ও গুরুদেব বিশ্ববরেণ্য, বাঙলা বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ও শেখা), তাই ধরতে পারি আঞ্চলিকতায় ওরা কি বোঝায়, তাইতো চিনতে পারি ১৯৬০, ১৯৭২ এর আসামের বাঙ্গালী-নিধন যজ্ঞের হোতাদের স্বরূপটা। তোমাকে চিনি তাই না সেদিনের গান্ধীবাবুর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এর মানে করা নয়, করার জন্য মরা তো নয়ই তাও জেনেছি আর আজকের শ্রীমতী গান্ধীর 'গরীবি হটাও' এর মানে হরিয়ানার চারশো বিশ একরের মধ্যে ২৯৬ একর জমির উপর বসবাস-কারী 'গরীবকে হটিযে' ৭৪০ টাকা মাসিক উপার্জনকারী বিলেতী মোটর কারখানাব অ্যাপ্রেন্টিস পুত্রের মারুতী কোম্পানী বানিযে ১৭ কোটি টাকাব তহবিলদাব বানাবার গোপন আকাঙ্খা, তাও বুঝেছি।[127]

তোমাকে স্মরণ রেখেই বলি, হে বাঙালী, আর অন্যমনস্ক (ইনডি-ফারেন্ট) থেকো না। উত্তরবঙ্গে প্রতিবৎসর হয় খরা না হয় বন্যা, এবং খরা-বন্যা পাশাপাশি (মালদহে), ফরাক্কা ব্যারেজ ৪০,০০০ কিউ-সেক না ২০,০০০ কিউসেক—এ সবই বুঝে নাও। তোমার বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে তাই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির ফ্লাডকে অস্বীকার কোর না, বর্ধমানের সেই সদরঘাটের ব্রিজটাই বা তোমার কলকাতা থেকে

১২৭। লোকসভার সদস্য সি. পি. এম নেতা জ্যোতির্ময় বসু 'সাপ্তাহিক বাঙলাদেশ' এ ঐতিহ্যবান দেশ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর (যিনি নাকি বিশ্বের ১নং মহিলা) পুত্রের মারুতী কোম্পানীর ইতিবৃত্ত ফাঁস করেন। নাগরওয়ালা উপাখ্যান, রামু গোয়েঙ্কার আট লক্ষ পোষ্টার কাহিনী সবই তিনি পর পর বের করেন।

কতদূরে, হুগলী ব্রিজ কবে হবাব কথা আজ হবার ধুঁয়া উঠেছে, এলাহাবাদ, জামশেদপুরের ষ্টেশনও নতুন রূপ পেয়েছে হাওড়া ষ্টেশনের সাবওয়ে হবার পনের বছর আগে, সিরাজদৌল্লার সেদিনের মুর্শিদাবাদ যে ধূলিসাৎ হতে বসেছে তোমাদের অগম্য স্থান হয়ে অথচ উত্তর প্রদেশের অলিতে গলিতে কতদিন আগেকার বাবর-শাহজাহানদের (তারাও দিল্লীওয়ালা তো) ছোট ছোট কীর্তি (তাজমহল বা অনুরূপ বড় বড় ইমারতকে ধরছি না) আজও জ্বলজ্বল করছে (যা দেখতে সকলের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও প্রতি বছর সদল-বলে যাও)—কিন্তু কেন, এসব জিনিস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে কি লাভ হয়েছে তোমাদের যে তোমরা চিরকালই মুখ বুঁজে চোখ বন্ধ করে 'খাও পিও মৌজ কর' এর প্রায়-ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সময় কাটাবে? ফরক্কার জল যে তোমাকেও ডুবিয়ে মারতে চলেছে। ১৩শে জানুয়ারী সেদিন যেদিন ঐসব চিন্তা তোমাদের করতে হবে আর করতে করতে পরের বছরের ১২শে তারিখকে উত্তীর্ণ করতে হবে। কিন্তু দোহাই তোমার, চায়ের কাপে তুফান তুলে বৈঠকখানার রাজনীতিতে আর আটকিয়ে থেকো না।[১২৯]

হে নেতাজী, আমি তোমাকে মনে রেখেছি কিন্তু যাদের সবচেয়ে বেশী মনে রাখবার কথা তারা কিন্তু তোমাকে ভুলেছে (তাই তো আমাদের উপর এত চাপ পড়েছে, মাশুল গুণছি যে আমরা সকলেই) তাই তোমার অনুগামীরা (ফরোয়ার্ড ব্লক নেতারা) অত সহজে তোমার সহচর হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের পরের দিন থেকেই

১২৮। 'ফরক্কা' এখন পশ্চিমবঙ্গের সামনে ফক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২৯। আমি এমন একজন নামকরা লোক নই যার এরকম বক্তৃতা দেওয়া সাজে। স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে যা মানিয়েছে, আমাকে তা মানাবে না। এতে নানান জনের ব্যঙ্গোক্তিই আমার কপালে জুটবার সম্ভবনা। যা হোক, ঐ পুরো প্যারাগ্রাফটি লেখকের স্বগতোক্তি মনে করে কোন গুরুত্ব দেবেন না।

কংগ্রেসীদের সাথে লাফালো আসল হত্যাকারীদের আড়াল দেবার জন্য, এমন কি ওদের ডেমো-কোয়ার অংশীদারও হল মুসলিম লীগের সঙ্গে। তোমায় বিস্মরণ না ঘটলে ওরা সেদিন অত বড় ভুল করতো না। ২৩শে জানুয়ারীতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করলেও প্রতিদিন (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ এও) নেতাজী-স্মরণ অশোক ঘোষরা করেননি, সেই বিচ্যুতির ফলেই অতবড় ঘটনা তাঁরা ওরকম হালকা-ভাবে নিতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ এর নির্বাচনের সময় 'আমাকে রক্ত দাও তোমাকে স্বাধীনতা দিব—নেতাজী —নব কংগ্রেস' দেওয়াল লেখাতেও তাঁরা প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, অসঙ্গতি খুঁজে পাননি এমন কি সমর্থনই করেছিলেন তাদের লেজুর বনে গিয়ে। তাদের সে ভুল পরে ভেঙেছে তবে ভুলের মাশুলটা যে আমাদের পক্ষে বড্ড বেশী হয়েছে ১৯৭১এ এবং ফলে পরবর্তী কালেও।

হে বাঙালী-বীর, তোমার তুলনা নাই। তোমার লাঞ্ছনা সত্ত্বেও লাঞ্ছনাকারীকে 'জাতির পিতা' আখ্যা দেওয়া সে তোমাতেই সম্ভব। তোমার অবর্তমানে ভাবতে আর কোন যোগ্য লোক না থাকায় বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চোখ রেখে সমুদ্রের ওপার থেকে তুমি 'জাতির পিতা' বলে সম্বোধন পাঠিয়েছিলে। তাই তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় আমার, যারা একদিন তোমাকে 'কুইস্‌লিং' বলেছিল তাদের একটা অংশ আজ তোমার আশীর্বাদপুষ্ট, কেন না এ'যে তোমাতেই সম্ভব। সুভাষ-জ্যোতি (জ্যোতি বসু)ই আজ জ্যোতির্ময় (জ্যোতির্ময় বসু) হয়ে বাঙালীর জীবন রক্ষা করুক, এই প্রার্থনা আজকের দিনে।[১৩০]

১৩০। শেষের ৪টি লাইন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কলম থেকে বেড়িয়ে আসে। এর জন্য কোন সচেতন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না।

লেখকের কথা[১৩১]

যে ফাঁকিবাদ আমাদের মত অর্ধশিক্ষিত, ২০০ টাকার ক্ষমতা ২০০০এর আকাঙ্খাযুক্ত, মধ্যবিত্তদের চোখে ঠুলি পড়িয়ে বছরের পর বছর ধরে ঘুমিয়ে দেশটাকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এল, সেই ভুবন বিখ্যাত গান্ধীবাদের সঠিক রূপটার সাথে সত্যিকারের পরিচয় করাবার মানসেই সুভাষ-অনুরাগী 'বঙ্গজ ভারত-নাগরিকে'র এই আন্তরিক অথচ ক্ষুদ্র প্রয়াস। লেখার হাত নয়, হাতের লেখাও নয়, প্রেরণা যোগাল সেই ছোট্ট মনটা যেটার সৃষ্টি হয়েছে দিনে দিনে 'সুভাষচন্দ্রে'র বলিষ্ঠ পরশ পেয়ে।

জীবন থেকে রাজনীতি দূরে নয়, বস্তুতঃ জীবনের সাথে রাজনীতির পুরো যোগ আছে, একথাটা এই অর্ধশিক্ষিত মস্তিস্কটার মধ্যে ঢুকতে বহুকাল সময় লেগেছে। বস্তুতঃ প্রথম জীবনে, (ছাত্রজীবন থেকে), রাজনীতি করে যে বয়সে আখের গুছাবার কথা, ঠিক সেই পরিণত বয়স হবার আগে পর্যন্ত রাজনীতির ক্যাচকেচি থেকে শতহস্তেন দূরেই থেকেছি। আর পাঁচটা স্বল্পবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের মতই ভালো ছেলে ভালো ছেলে ভাব নিয়ে ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ মন্ত্র নিয়ে ছাত্রজীবন কাটিয়েছি, কর্মজীবনেও তা থেকে ইতর বিশেষ ঘটাইনি।

জীবনে একটা সময় এসেছে যখন রাজনীতি ঘেঁষা চিন্তা মনের উপর চেপে বসেছে। বাঙালী রাজনীতির বলি—১৩০ অসুস্থ ও বিকৃত রাজ-

---

১৩১। লেখকের বক্তব্য বইয়ের সর্বপ্রথমে লেখাটাই নিয়ম, কিন্তু গতানুগতিকতাকে না মেনে সেটা 'কুইসলিং' 'প্রথম পর্ব' শেষ হবার পরে লিখতে হল, এ ছাড়া অন্য উপায় না থাকায়। 'লেখকের কথা' পড়লেই পাঠক বুঝবেন যে এই লেখাটি নিয়ম মেনে বইয়ের প্রথমে সংযোজন করলে আসল লেখাটি গুরুত্ব হারাতো।

নীতির বলি বললেই ঠিক বলা হয়—আগে ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-কংগ্রেসের, পরে দিল্লী কংগ্রেসের, এই চিন্তা যে মুহূর্তে মনে বাসা বেঁধেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই জিনিষগুলো সঠিকভাবে জানবার আগ্রহ জন্মেছে। দেশবিভাগ নিজের জীবনে দেখেছি, দেশে নিজের দু ছটাক জমি থাকুক বা না থাকুক, দেশ-গাঁয়ে ছনের বেড়াযুক্ত ঘর অথবা ছোট্ট কোঠাবাড়ী

১৩২। 'A subject race has nothing but politics' বিশের দশকের সুভাষচন্দ্রের কথাটি লেখকের ছোট্ট আধারটিতে বর্তমানে বড়ই ধাক্কা দেয়। ভারত স্বাধীন হলেও আমরা বাঙ্গালীরা এখনও 'সাবজেক্ট রেস', দিল্লী-ওয়ালাদের অধীন প্রজা। রাজনীতির বলি বঙ্গ সন্তানদের আজও তাই 'has nothing but politics'— শুধু রাজনীতি ভালোভাবে বোঝা দরকার এবং সেটা কাজে লাগানো উচিৎ।

সুভাষচন্দ্রের 'সাবজেক্ট রেস্' কথাটি আজ নিজেদের উপরে টেনে নেওয়াকে কেউ কেউ ভালো নজরে নাও দেখতে পারেন। অতএব ঐ কথাটি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

দিল্লী এদেশের রাজধানী— তাতেই প্রকাশ দিল্লী রাজা অন্যান্য প্রদেশ তার প্রজা। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, পৃথিবীর সবস্থানেই একই ব্যবস্থা, দেশ শাসন যে স্থান হতে হয়, দেশের কেন্দ্রস্থল সেটাই, অন্যান্য স্থান তার উপর নির্ভরশীল। সুস্থ জীবন যাত্রার জন্য উভয়েরই কর্তব্য আছে— কেন্দ্রের প্রতি প্রদেশের, আবার প্রতিটি প্রদেশের প্রতি কেন্দ্রের।

বেশ কয়েক বছর ধরে সি. পি এমের একটা স্লোগান মনোযোগ আকর্ষণ করেছে 'পশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্রের উপনিবেশ হতে দেবো না'। প্রথমের দিকে কথাটাকে দুরভিসন্ধি মূলক বলে মনে হত; 'দেশের সংহতি নষ্ট' করার কংগ্রেসী ভাষ্যটাই মনটাকে টানতো। তাহলেও যুক্তিবাদী মন দিনের পর দিন তার কাজ করে যাচ্ছিল— জিনিসটাকে তৌল প্রতিদিনই সচেতন-অবচেতন মন করেছে, ফলে 'উপনিবেশ' কথাটার গভীর তাৎপর্যটা বেশ কিছুদিনের মধ্যেই ধরতে পারা গিয়েছে।

৩০।৩৫ বছর আগের চিত্রগুলো মনে পড়ে। জমিদার প্রধান অবিভক্ত বাঙলাদেশ—ওপার বাংলার বেশীর ভাগ জেলাই জনসংখ্যা হিসাবে মুসলমান

ছিল অথবা না ছিল, দেশ বিভাগের হ্যাঁচকা টান সামলাতে সময় লেগেছে। প্রশ্ন জেগেছে মনে নানাবিধ একজন টিন-এজারের, কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। সময় গড়িয়েছে— ১৯৪৭, ১৯৬৭তে এসে ঠেক খেয়েছে। '৬৭-৬৮-৬৯-৭০ এর ঘটনাপ্রবাহ যুক্তফ্রন্টের ভোটদাতার

প্রধান থাকলেও জমিদারদের একটা বড অংশই হিন্দু ছিল। সেই সব হিন্দু জমিদারের 'আমি হলেম রাজা'র মেজাজটা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বোঝে 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবির মাধ্যমে। মেজবাবুর কবুতর ওড়ানো, উঠতি বড়লোক ছেনী দত্তের সঙ্গে নানা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, ভাণ্ডার প্রায়-শূন্য হলেও বাইজীকে টাকার তোড়া দান এর চিত্রগুলো দেখে জমিদার মেজবাবু আর চিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাস তাদের কাছে একাকার হয়ে গিয়েছেন কিন্তু আমরা—ভূতনাথেরা (নিজেরা উত্তম কুমার না হয়েও) নিজেদের জীবনে জমিদার দেখেছি বহু, বড়, মাঝারী, ক্ষুদে সব রকমই জমিদার দেখেছি। বড দেউড়ীওয়ালা হিন্দু জমিদারদের বৈঠকখানায় প্রজারা যখন আসতো, তখন সব প্রজাই তাদের কাছে এক ব্যবহার পেত না। গরীব হিন্দু এবং গরীব মুসলমান—দু'জনেই যদিও প্রজা, তবুও জমিদার বাবুর ব্যবহারে বিলক্ষণ তফাৎ থাকতো। মুসলমান ও হিন্দু প্রজার বসবার আসনের এবং কায়দার তারতম্য থাকতো, অবস্থানের দূরত্বেও হেরফের ছিল ; চা ও তামাকের ব্যবস্থার মধ্যেও বিলক্ষণ পার্থক্য থাকতো। হিন্দু জমিদার বাবুর কাছ থেকে হিন্দু প্রজা যে ব্যবহার পেত, তা থেকে বহু নিম্নতর তাচ্ছিল্য ভরা ব্যবহার মিলতো মুসলমান প্রজার। অথচ প্রজা তো দু'জনেই !

দিল্লী রাজা— প্রজা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, মাদ্রাজ, হরিয়ানা, আর পশ্চিমবঙ্গ সব প্রদেশই। কিন্তু প্রজাতে প্রজাতে তফাৎ আছে, ২৭ বছরের প্রতিটি দিনে রাজার ব্যবহারে অন্ততঃ তাই প্রকাশ পেয়েছে।১৩৩ প্রথমোক্তরা 'হিন্দু প্রজা' আর শেষোক্ত 'মুসলমান প্রজা'— রাজা যে সেদিনের উন্নাসিক, অবিবেচক, অত্যাচারী, জাত্যাভিমানী-দাম্ভিক সেই হিন্দু জমিদারদেরই পরিবারভুক্তজন। [অবহেলিত উপেক্ষিত মুসলমানদের হিন্দুদের প্রতি পুঞ্জীভূত রোষের বহিঃপ্রকাশ আমরা পরবর্তী সময়ে দেখেছি পূর্ব পাকিস্তানে, সে অন্য কথা। না অন্য কথাই বা কেন, সেটাই তো আমা-

মনে ধাক্কা দিয়েছে, ভীষণ ধাক্কা। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছে, আধ-জান্তা হলে চলবে না, সব-জান্তাদের একজন হলেও চলবে না, জানতে হবে বুঝতে হবে সঠিক জিনিসটা। সেদিন মনে পড়েছে নিজের জীবনের বহু ঘটনা, প্রদেশের, কলকাতা শহরের টুকরো টুকরো ঘটনা যা আগে ঘটতে দেখেছি।

সোজা পথে চলার দুর্নিবার আকাঙ্খা ছিল কিন্তু এই 'অবাক ভারবর্ষের' প্রায় সবটাই যেখানে বক্র পথ, সেখানে পদে পদে হোঁচট খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকলো না। এই ন্যাকাও অতি চালাকদের রাজত্বে আমি বেচারী, শুধু বোকার বোলেই অ্যাকটিনি করলাম। বুদ্ধিমানেরা তাদের আপাতঃ সাকসেসফুল কেরিয়ারের গল্প শুনিয়ে আমার পরিবারের লোকের কাছে বাহবা পাবার চেষ্টায় থাকলো, হয়তো মাঝে মাঝে পেলও বা!

একেবারে কাছ থেকে সরকারী চাকুরীয়াদের দুর্নীতি দেখেছি আর সৎ আকাঙ্খাযুক্ত কর্মীদের মানসিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছি। প্রতিহিংসাপরায়ণ অফিসারের অধঃস্তন কর্মচারীর উপর সীমাহীন অত্যাচার দেখেছি, তাদের মনুষত্ব সম্বন্ধে কিন্তু জেগেছে মনে অথচ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি, গভর্ণমেন্টের ওপর তলার প্রোটেক্-

দের কাছে আসল কথা। পশ্চিম বাংলার সচেতন মানুষগুলো (অচেতন গুলোকে বাদ দিয়েই বলছি) যে রোসে বহ্নিতে ফেটে পড়তে চলেছে দিল্লীর বিরুদ্ধে এটা কিন্তু সেই মুসলমান-প্রজাদেরই মানসিক পরিস্থিতির অনুরূপ অবস্থা]। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের পুরোপুরি 'উপনিবেশ' হয়েই আছে আজও—বাঙ্গালীরা 'সাবজেক্ট রেস' হিন্দু জমিদারের অবহেলিত উপেক্ষিত নিপীড়িত মুসলমান প্রজা অতএব 'রাজনীতি ছাড়া গত্যন্তর নেই', সুভাষচন্দ্রের কথানুযায়ী।

১৩৩। 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধটি পড়লে কথাটার তাৎপর্য ঠিকমতো বোঝা যাবে।

শান তারাই পেয়েছে। নন্দদুলাল (তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারী লাল নন্দ) দের 'সদাচার সমিতি' আর যাই হোক সৎ-কথাটির সঙ্গে পুরোপুরি যোগসূত্রহীন, তা ১৯৬৪-৬৫এ ঘটনাভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক ঘটনার মাধ্যমে নিজের জীবনেই দেখলাম।

বিবেকানন্দ মুখার্জীর সম্পাদনায় 'যুগান্তরে'র ১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলনের[১৩৭] এডিটোরিয়াল পড়েছি, মনে স্থায়ী রেখাপাত করেছে, ১৯৬৬ এর 'দৈনিক বসুমতী'র বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আরও গভীর ভাবে মনটাকে নাড়া দিয়েছেন বসিরহাট বারাসতের খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের কথা তাঁর সম্পাদকীয়তে ভরে। ১৯৫৭-৬২তে যুগান্তরের পাতায় 'নিরপেক্ষে'র 'নেপথ্য দর্শন' পড়েছি অধীর আগ্রহে। যেসব ডিস-অনেষ্ট অফিসার সাধারণ মানুষের টাকার অপব্যবহার করে করে সরকারের বহু ক্ষতি করেছে, তাদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে প্রমাণ সাপেক্ষ অনেক লেখা তিনি লিখেছিলেন কিন্তু সেগুলো প্রায়শই অস্বীকার করে তাদের অনেককেই চাকরী থেকে বরখাস্তের বদলে প্রমোশন, অনেক উচ্চতর পদে নিয়োগ হতে দেখেছি। যুগান্তর পত্রিকার তুষার কান্তি ঘোষ মন কেড়েছেন বিবেকানন্দ মুখার্জী ও অমিতাভ চৌধুরীকে (নিরপেক্ষকে) তাঁর পত্রিকায় স্থান দেবার জন্য, সরকার নামক ইন-অ্যানিমেট পদার্থটিকে কিন্তু মোটেই ভাল লাগেনি। তবু নীরস রাজনীতি আমার মনে রস আনে নি। ১৯৫৭, ১৯৬২তে নির্বাচনকালে পথ চলতে চলতে সংবেদনশীল মনটা শরীরটার গতি রুদ্ধ করেছে কোনো পার্কে বিধান রায়-অতুল্য ঘোষের বক্তৃতা কানে আসায়, আবার আমার জীবনের আপাতঃ নরম অথচ বলিষ্ঠ মনের

১৩৭। ৮০ জন বঙ্গবাসী সেদিন কংগ্রেসী পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন, সেই কংগ্রেস যে খাদ্য দিতে পারে না কিন্তু গুলী দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি। কিন্তু বারবার গোসাঁইরা শুধু অহিংসার বাণী ছড়াতেই অভ্যস্ত, কার্যকলাপ যাই হোক।

সৃষ্টিকর্তা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে যারা কুইস্লিং বলেছিল, সেই কমিউনিষ্টদের কথাবার্তা ও এই রাজনীতি আন-অ্যাটাচ্ড আধারে ধাক্কা দিয়েছে। প্রত্যেকের বক্তৃতাই ভাল লেগেছে যখন শুনেছি, যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলেও কে কি বলেছেন তা' পরমুহূর্তেই ভুলেছি। তবে সর্বশেষে একটি কথা কিন্তু মনের কোণে থেকেছে— ঐ কুইস্লিং-ওয়ালা, চীনের দালালদের ভালো লাগেনি! ওরা আমার নেতাজীকে 'দেশের শত্রু' বলেছিল।

১৯৬৯-৭০এ এসে যুক্তিবাদী মন বলেছে যা আমরা অনায়াসে জানি সেটা বোধ হয় সত্য নয়, সকলে অতি স্বল্প আয়াসে আমাকে যেটা এতকাল বুঝিয়েছে সেটা হয়ত ঠিক নয়। পারিবারিক জীবনে, ব্যবহারিক জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। সরল বিশ্বাসী মন থাকায় বহুজনেই সেটার একসপ্লয়টেশন করেছে—আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সহকর্মীর মধ্যে একাধিক লোক, যাদের খুব ভালো লেগেছে ও আপন মনে হয়েছে, সুহৃদ সেজেছেন— দেরিতে হলেও তাদের স্বরূপ ধরতে পেরেছি। চালাকেরা যখন বুঝেছেন তাদের উপর চালাকিটা আপাতঃ বুদ্ধিহীনের কাছে ধরা পড়েছে, তারা তখন সাবধান হয়েছেন, তাদের ট্যাকটিকস্ পালটেছেন। যতই তারা সুহৃদের ভূমিকায় আরো বেশী সৌহৃদ্য ব্যবহার করে থাকুন, তৃতীয় পক্ষ যতই কিন্তু ভাবুক, হৃদয়হীনদের মধ্যে আর হৃদয় খুঁজতে যাওয়া সম্ভব হয়নি— সরল বিশ্বাসীর মনে অবিশ্বাস এসে তাকে যুক্তিবাদী করে তুলেছে; অবশ্য ট্যাকটিকস্ওয়ালারা তাদের কায়দা চালিয়ে যাবেনই— তাদের ধৈর্যটা একটু অসাধারণ তো! 'নিরপেক্ষ' (?) 'যুগান্তর'কে এর আগে যেরকম মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছি, যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার নোংরামীটা বুঝতে গিয়ে এই অতি সরল-বিশ্বাসী আধারেও তার সম্পর্কে অবিশ্বাস এসেছে; তাঁবেদার পত্রিকাগোষ্ঠীর চেহারা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দক্ষিণহস্ত বামপদদেরও সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করেছি।

তাদের কথাবার্তাগুলোর প্রতিটি তৌল কর্বার চেষ্টা করেছি, তাদের বহু আচার-ব্যবহার অসংলগ্ন মনে হয়েছে। আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটস্ম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, যাদের মানুষের শত্রু বলে পরিচয় করায় তারা হয়ত তা নাও হতে পারেন, 'বেনিফিট অব ডাউট'টা তাই তাঁদের জন্য সেদিন তুলে রেখেছি। দেশের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, কোলমন্ত্রীরা যাদের অনুকূলে সার্টিফিকেট দেন তাদের সন্দেহের চোখে দেখা তখন সুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনাকেই যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে সুরু তখন করেছি।

১৯৪৭-৪৮ এর কোন একটা সময়। শুনলাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করেছেন। বড়বাজারে কয়েকজন ব্যবসায়ী চোরা কারবারীকে বস্তা সমেত (আটার বস্তায় তেঁতুলের বিচির পাউডার সমেত না কি যেন) ধরেছেন— এই নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়েছে। ডঃ ঘোষ নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ওঁর পেছনে লেগেছে, অপমান করেছে ফলে স্ট্রীক্ট প্রিন্সিপল্‌ড লোক তিনি রিজাইন করেছেন। সৎ লোক হিসাবে প্রফুল্ল ঘোষ আমার মনে স্থায়ী আসন নিলেন।

সময়টা ১৯৬৬ হবে। কিছুদিন ধরেই শুনছিলাম অজয় মুখার্জীর সঙ্গে অতুল্য ঘোষের বনিবনা হচ্ছে না। অতুল্য ঘোষকে আমি পছন্দ কর্তাম না কেন না কংগ্রেসকে মোটামুটিভাবে অপছন্দ করা বহুদিন থেকেই আমার সুরু হয়েছে। অতুল্য ঘোষ লোক মোটেই সৎ মন এ খবর শুনেছি, বিশ্বাস করেছি। উল্টোটাও জানি। একটা গেরুয়া রঙের পান্‌জাবী পরা সৌম্য শান্ত চেহারার বৃদ্ধ অজয় মুখার্জীকে আমি দেখি নেতাজী ভবনে ১৯৬৪ সনে ২৩শে জানুয়ারী (আগেও দেখেছি তবে কবে মনে নাই)। ভদ্রলোক আমার মনে ভীষণ দাগ কেটেছেন মনে হয়েছে লোকটি সৎ, শুনেওছি উনি ভাল লোক! বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টটি যে দুর্নীতিগ্রস্থ চক্রের জায়গা

এ খবর কানে এসেছে, মাটি কেটে অথবা অনেকটাই না কেটে পয়সা মেলে।[১৩৫] ঐ কথাতো অনেকেই বলেন কিন্তু বহু বছরের ইরিগেশন মিনিষ্টার অজয় মুখার্জীকে কিন্তু ওসবের মধ্যে জড়াতে মন চায়নি—উনি ভাল লোক।

এল ১৯৬৭ সন। শুনলাম প্রবীণ বয়সে প্রফুল্ল ঘোষ আবার রাজনীতিতে ফিরছেন—অজয় মুখার্জী ও কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেস গড়েছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে শিক্ষক-ছাত্র মিলে পরাস্ত করবেন এটাই আকাঙ্খা। মনটা নেচে উঠলো। দু'জন সৎলোক একজোট হয়েছেন, খুব আশার কথা। তারপর এদল-সেদলে নানান উঠবোস (বৈঠক আর কি), কথাবার্তা চললো। নির্বাচন হল, কংগ্রেসীরা হারলো। বামপন্থীরা দুটো আলাদা আলাদা গ্রুপে নির্বাচনে নেমেছিলেন, নির্বাচনের পরে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হল। এপক্ষের ওপক্ষের অনেকগুলি দলই এক হয়ে যুক্তফ্রন্ট নাম নিয়ে সরকার গঠন করলো। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর ছাত্র অজয় মুখার্জীর মুখ্যমন্ত্রীত্ব মেনে নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী হয়েছেন। অবিবাহিত এই ভদ্রলোককে বহুদিন থেকে শ্রদ্ধা করে আসছি, যিনি প্রায় কুড়ি বছর আগে এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্বভাবতঃই মুখ্যমন্ত্রী হবেন এটি জানা কথা। কিন্তু এই বয়স্ক ব্যক্তিটি তা হলেন না, নিজের ছাত্রের নেতৃত্ব মেনে নিলেন। শ্রদ্ধা আমার আরও বাড়লো, আমার কথায় বার্তায় তার প্রকাশ প্রতিনিয়তই হতে লাগলো। ৩রা মার্চ ১৯৬৭[১৩৬] এ বিধান সভায় গেলাম খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের খাদ্যনীতি ঘোষণা শুনতে। খাদ্যনীতি বলতে

১৩৫। ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার ও তাদের অধস্তনেরা রুষ্ট হবেন না, কারও প্রতি কোনও ইংগিত নেই এখানে। সেচ দপ্তরের বহু সৎ লোককে আমি চিনি। সাধারণ লোকের মধ্যে সদাই চালু কথাটার সম্বন্ধেই বললাম শুধু।

১৩৬। তারিখটা কি ভুল হল, কে যেন বলছিল দিনটা ২৯/৩/৬৭। স্মৃতি থেকে বলা তো ভুল হলেও হতে পারে।

সঠিক কি বোঝায়, তা বুঝি না, বোঝার দরকারও নেই; যোগ্যতম লোকের হাতে দপ্তর পড়েছে, তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে ঘন ঘন হাততালি দিলাম। হৃষ্টমনে বাড়ী ফিরলাম। কথাবার্তা বেশী কোনোদিনই বলি না, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় এবং তার পরেও প্রতিদিন দেশের কাজে আত্মনিয়োগকারী অবিবাহিত খাদ্যমন্ত্রীর গুণকীর্তন সবাবে করতে লাগলাম অর্থাৎ স্বল্পভাষী আমি বাচাল হলাম, যে কম জানে অথবা কিছু জানে না সে যখন বেশী কথা বলে তখন তাকে বাচাল বলে, আমি তাই হলাম। ১৯৫৯, ১৯৬৬ এর কাঁচকলা-মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনটি একেবারেই অখাদ্যমন্ত্রী ছিলেন, খাদ্যের বদলে হৃদয়হীন লোকটি যে সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র গুলীই দিয়েছেন একথা সকলকে বলতে লাগলাম, ঘোষ-এ এবং সেন-এ আকাশ-পাতাল তফাৎ এটা পরিচিত জনদের বোঝালাম, যারা অনুরূপ কথা বল্লেন তাদের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

সময় গেল। জুলাই অথবা আগষ্টের প্রথমদিক হবে, খবরের কাগজে প্রফুল্ল ঘোষের স্টেটমেণ্ট পড়লাম, কেমন যেন লাগলো। পরে জ্যোতি বসু বা প্রমোদ দাশগুপ্তের বিবৃতি দেখে হল, ঠিক যেন উল্টো কথা। ভীষণ বেসুরো ঠেকলো যুক্তফ্রণ্টের দুই নেতার একেবারে দুইরকম কথাবার্তা। রাজনীতি বুঝি না, চুপ করে থাকলাম, মনে কষ্ট পেলাম।

'দৈনিক বসুমতী'র একনিষ্ঠ পাঠক আমি, সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখার্জী আমার বামপন্থী মত সৃষ্টির গুরু। তাঁর 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন যুগান্তরের পাঠক ছিলাম—বিবেকানন্দের যুগান্তর পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 'যুগান্তর' পত্রিকা তার বহুদিনের একটি সৎ ও একনিষ্ঠ পাঠককে হারিয়েছিল।

স্কুলে যখন পড়তাম তখন দুজন ছেলে আমার উপরের ক্লাশে পড়তো, শুনতাম তারা নাকি কমিউনিষ্ট। কমিউনিজম যে কি তা

কিছুই বুঝতাম না আর বুঝবার আকাঙ্খাও ছিলনা। কিন্তু লক্ষ্য কর্তাম ছেলে ছুটি অনেক কিছু জানে, কোনো ছেলে ছুটো কথা বললে ওরা দশটা কথা বলে, প্রায়ই আমি যা বুঝতে পার্তাম না। আমার চেয়ে অনেক বেশী জানবার কারণে ওদের প্রতি শ্রদ্ধা হত কিন্তু পাছে আমার পড়াশোনাটা নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য ওদের সব সময়ে এড়িয়ে চলতাম। ঐ ছেলে ছুটার একজনের সঙ্গেও আমি কখনও আলাপ করিনি। একজনের নাম ছিল ব্রতীশ সেনগুপ্ত আর একজনের নাম স্মরণে নাই। মনে আছে ১৯৪২ সনের আগষ্ট, সেপ্টেম্বরে বহুদিন স্কুলে পিকেটিং হয়েছে ঐ ছেলে ছুটী শুয়ে পড়ে আছে অথবা আমাদের মত স্কুলে ঢুকতে ইচ্ছুক ছাত্রকে অনেক কিছু কথাবার্তা বলে বই খাতাপত্তর সমেত ফেরৎ পাঠাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে ওরা জেলে গিয়েছিল তাও শুনেছিলাম। বয়স আবার বেড়েছে, ১৯৪২ থেকে ১৯৬৭ এর মধ্যে মাঝে মাঝেই ছুজন একজন কম্যুনিষ্ট দেখেছি, খুব কাছে থেকেই দেখেছি, হয়ত ঝোলা কাঁধে চলছে, ঝোলাতে নাকি ওদের বইটই থাকে, পড়াশোনা করে ওরা খুব এটা বুঝি ওদের অনর্গল তুর্বোধ্য কথাবার্তা শুনে! খারাপ কিছু তাদের বড় একটা চোখে পড়েনি। আবার কম্যুনিষ্টরা ছেলেদের মস্তিস্ক চর্বন করে একথা অভিভাবকদের কাছে শুনে বিশ্বাস করেছি, অতএব তাদের পরিহারও করেছি। বয়স বাড়লো, ১৯৫৭ এ কলকাতায় এলাম কয়েক বছর বিহারে কাটিয়ে। রাস্তায় নিরুদ্দিষ্ট যেতে যেতে কোন জায়গায় মিটিং টিটিং হতে দেখলে প্রায়ই আমি সেখানে আটকে যাই, এই অভ্যেসটা বিহারে থাকাকালীন হয়েছিল, আই. এন. টি. ইউ সি লীডার মাইকেল জন এর বহু বক্তৃতা এরকমভাবে আমি সিন্ত্রির মাঠে, জামসেদপুরের বারি ময়দানে (প্রফেসার শহীদ আবছুল বারির নামে শুনেছি। কলকাতায় এসেও সে হ্যাবিট যায়নি। অরুণা সিনেমার পাশের মাঠ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আটকেছি, সেনট্র্যাল এভিনিউয়ের

মহম্মদ আলি পার্কও আমাকে বেহাই দেয়নি। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হাজরা পার্ক, দেশপ্রিয় পার্ক, মনুমেণ্ট ময়দান যেখানে যখন মিটিঙ হতে দেখেছি কিঞ্চিৎ সময় হাতে থাকলে সেখানেই মানুষের ভীড়ে ঢুকেছি। কোন দল সভা করছে, তার দিকে চাইনি—দলটল বুঝতাম না। ভাল লেগেছে, বহু বক্তৃতা ভাল লেগেছে। বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ, সোমনাথ লাহিড়ী, জ্যোতি বোস সকলেরই বক্তৃতা শুনেছি। দেখেছি সেদিনকার দি গ্রেট সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে বিধান রায়ের মন্ত্রী-সভা থেকে পদত্যাগ করে হিরো হিরো ভাব নিয়ে চশমায় বারে বারে হাত দিয়ে গরম গরম বক্তৃতা দিতে, একে ওকে মুগ্ধ-মুগ্ধ ভাব নিয়ে প্রশ্ন করেছি 'স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ব্যারিষ্টার এরকম শিক্ষিত পেয়ারের নাম করুন তো।' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র একজন উঁচুদরের লোক হবেন এতে সন্দেহ কি! সৎ বংশজাত বলে কথা আছে না অভিধানে; সুপুরুষ ইন্দ্রজিৎ গুপ্তও কম মন টলান নি, আই. সি. এস শৈবাল গুপ্তের পরিবার ভুক্ত (অথবা নন) লোকের স্যাক্রিফাইস (!) কল্পনা করে মুগ্ধ হয়েছি। বহুজনের বহু বক্তৃতা শুনেছি, যে যখন যা বলেছেন, মনে হয়েছে ঠিক বলেছেন, আমার মনের কথাটি বলেছেন। সকলের বক্তৃতা ছাপিয়ে সোমনাথ লাহিড়ীকে আমার অদ্ভুত লেগেছে। জ্যোতি বসু, না নিঃসন্দেহে না, সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তৃতা আমাকে যাদুর মত টেনেছে। কিন্তু ঐ বক্তৃতা পর্যন্তই, তার বেশী আমি কোনদিনই এগোইনি। আসল কথা, ওদের বক্তৃতার সাম অ্যাণ্ড সাবস্ট্যান্‌স্‌, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভুলেছি। বিষয় বস্তু নয়, ওদের বাচনভঙ্গী আমার অধিকতর আকর্ষণের বস্তু ছিল সেদিন। খুব কাছে থেকে মাঝে মাঝেই যে দু-চারজন কম্যুনিষ্ট দেখেছি তাদেরও ঐ ব্রতীশ সেনগুপ্তের অনুরূপই লেগেছে, ওদের সাংঘাতিক কোন অসঙ্গতি চোখে পড়েনি, বরংচ মানুষের উপকারী বন্ধু বলেই মনে হয়েছে। এককভাবে তাদের ভাল লেগেছে, দূরে থেকে একটা শ্রদ্ধার

ফিফথ কলামিষ্ট চীনেব দালালদেব, আমি কখনও বিশ্বাস করি নি ; চাইনিজ পেন-এ বাজার ছেয়ে গেলেও বহু বছর কেটেছে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে একটি ইন্‌সান পেন কেনবার আগে।

রাজনীতি না বুঝলেও ভোট আমি সুযোগ পেলেই দিই—১৯৫২তে কংগ্রেসকে দিয়েছিলাম, সাতান্নয় তালে গোলে ভোটার লিষ্টে নাম ওঠেনি, বাষট্টীতে কোন পক্ষে দিয়েছিলাম তা অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। তবে মনে হয় বামপন্থীদেরই দিয়ে থাকবো কেননা অ্যান্টি-কংগ্রেস মন ততদিনে হয়ে গিয়েছিল তবু একেবারে সিওর নই। সকল প্রচারকারীরাও হয়ত পেয়ে থাকতে পারেন একজন অরাজনীতিকের ভোট. সরকার যাই করুক কংগ্রেসের মানে গান্ধীজির নীতি তো খাবাপ ছিল না এই আরগুমেণ্টের ঢেউয়ে। কিন্তু ১৯৬৭স্পষ্ট মনে আছে। ভোট দিয়েছিলাম প্রফুল্ল ঘোষ-অজয় মুখার্জীকে দেখে তাদের সমর্থন পাওয়া প্রার্থীকে। যুক্তফ্রণ্ট তৈরী হয়েছিল, কিন্তু ভেঙ্গেও ছিল অল্পকাল মধ্যেই। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রথম লোক যিনি আমার এই মধ্যবিত্ত-ঘুমিয়ে থাকা মনটাকে চাবুক মেরে জাগ্রত করলেন। যুক্তফ্রণ্টের নেতাদের কথা কাটাকাটি—কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না। তবে এটা ঠিক যুক্তফ্রণ্টের খাদ্যমন্ত্রী যখন মুষ্টিমেয় দলত্যাগী বাংলা কংগ্রেসীদের১৩৭ নিয়ে এণ্টালী সি. আই. টি রোডের বড় বাড়ীর মালিক বাসিন্দা বাঁকা পথচারী আশু ঘোষের সাহায্যে, যে কংগ্রেসকে আগে রিজেক্ট করেছিলেন, তাদের গোপন মদতে ও ক্রমশ: প্রকাশ্য সহযোগে, পি. ডি. এফ এর চিফ মিনিষ্টার বনলেন, তখন দৃশ্যতঃই

১৩৭। নদীয়ার নাম করা শিক্ষাবিদ রাজনীতিক ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখরা রাত্রির অন্ধকারে সৃষ্ট মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের খুব বড পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেদিন, নিজেদেরও মিলেছিল কিছু দপ্তর-টপ্তর। কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেস ফেরতা সান্যাল মহাশয় যুক্তফ্রণ্টে কোন মন্ত্রীত্ব না মেলার ঝালটা ঝাড়লেন পি ডি. এফ এর মন্ত্রীত্ব বাগিয়ে।

এই অরাজনৈতিক আধারে প্রফুল্ল ঘোষ বিরোধী যুক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম মনে হল কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল আছে, যা আমি বুঝতে পারিনি এতদিন যা' এখন বোঝবার প্রয়োজন আছে। ১৯৪৭ সনের অনেষ্ট চিফ মিনিষ্টারকে এতদিন সম্মান দিয়েছিলাম, তাকে মনের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলাম। রাজ্যপাল ধরমবীরের ধাক্কায় মন আরও শক্ত হল। বাঘা বাঘা আইনজ্ঞ-ব্যারিষ্টার উকিলদের মতামত জানলাম সংবিধানের বিধানগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। নিজের মন যাচাই করে ধর্মবীরকে অধার্মিক ও কাপুরুষ (বীর নয়) আখ্যা দিয়ে বর্জন করলাম। স্পীকার বিজয় ব্যানার্জী বিধান সভায় চাবি এঁটে যে স্পীচ দিলেন তাতে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকে সাধুবাদ দিলাম।

'৬৮ পেরিয়ে '৬৯ এল। দীর্ঘ এক-দেড়বছর পরে অনেক অভিজ্ঞতা হল। ১৯৬৭ এর ২রা অক্টোবর সাময়িক বেচাল হওয়া সত্বেও ১৯৬৯ এ আবার যুক্তফ্রণ্ট গড়াতে অজয় মুখার্জীর সৌম্য-শান্ত মূর্তি আরও বেশী শ্রদ্ধা টানলো—যুক্তফ্রণ্ট ভোট পেল ততদিনে রাজনীতি সেমি-অ্যাটাচড মনের। উনসত্তর-সত্তরে যত ঝড় যুক্তফ্রণ্টে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ঝাপটা তার সমর্থকের মনে। সোমনাথ লাহিড়ী-জ্যোতি বসুর কোন পার্থক্য আছে কিনা, থাকলে কি সে পার্থক্য এটা বুঝতে প্রথম মন চাইল। অজয় মুখার্জীকে বুঝতে গিয়ে কুইস্‌লিং-ওয়ালা কম্যুনিষ্টদেরও শেষ পর্যন্ত বুঝতে চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকলো না। 'দৈনিক বসুমতী'র বিবেকানন্দ মুখার্জীর এডিটোরিয়াল এর সাথে অনেক সময়ই থ্রি-লেগেড রেস করে উঠতে পারছিলাম না, স্বভাবতঃই 'কালান্তর' এবং 'গণশক্তি'ও মাঝে মাঝে পড়তে সুরু করলাম।

বহু বাঙ্গালীকে বলতে শুনেছি মাড়োয়ারীরা নাকি অসৎ, ওরা নাকি ব্যবসায় বড়বাজারী-ফাটকাবাজি করে তাই জিনিসপত্রে-ওষুধে

খাদ্যেও দেশময় এত ভেজাল! তাই মাড়োয়ারীর গদীতে, গুজরাটির আড়তে, সিন্ধিদের নিউ মার্কেট আর এসপ্ল্যানেডের নিকটবর্তী ঘড়ির দোকান গুলোতে[১৩৮] যখন কাজে কর্মে গিয়েছি তখন যাচাই করতে মন চেয়েছে; ওদের রাগে গরগর করা মুখগুলো দেখে কখনও সখনও মনে হয়েছে ওদের শত্রু হয়ত আমার শত্রু নাও হতে পারে, ওদের বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্ব খোঁজা হয়ত ঠিক হচ্ছে না। আবার উঁচুতলা-নীচু ধাপের বাঙ্গালী বৈঠকখানায় গিয়েও একই জিনিস মেলাবার চেষ্টা করেছি। অসৎ লোকেদের সাধারণতঃ জেনারেলাইজ আমি করি না —মাড়োয়ারী মাত্রেই কালোবাজারী, গুজরাটি মানেই কালো-টাকার সংগ্রাহক একথা ভাবতে নারাজ তেমনি বাঙ্গালী মাত্রেরই সাতটা খুন মাপ করে তাকে সৎ বলে বিশ্বাস করতেও বসি না। তবু অন্য বাঙ্গালীদের কথাটা নিয়েই সবটার যাচাই করেছি। যারা মাড়োয়ারীদের প্রায়ই মেড়ো বলে কনডেম করেন এরকম বহু বাঙ্গালীর কথার সুর কিন্তু পরবর্তী সময়ে বহু মাড়োয়ারীর অনুরূপই লেগেছে — একথা যদি কখনও তাদের ধরিয়ে দিতে গিয়েছি তারা বিরক্ত হয়েছেন, মাঝে মাঝে বিলক্ষণ উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। কোন মিছিলকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে তাদের সকলকেই রাগতে দেখেছি মিছিলের মানুষগুলোর প্রতি অ্যালার্জিতে যেন ওরা সকলেই হরিহর আত্মা; মিছিলে অংশ গ্রহণকারী মাত্রেই জন্তু-জানোয়ার এবং তারাই এমন সোনার দেশটাকে ছাড়েখাড়ে দিচ্ছে একথা যখন মাড়োয়ারী-গুজরাটী-সিন্ধি ও ঐ বাঙ্গালীরা বুঝিয়েছেন তাতে এই অবুঝ মনটাতে সাড়া বহু সময়ই পাইনি। নিজের ভাতের থালায় টান পড়েছে,

১৩৮। ছোট্ট ছোট্ট দোকানগুলোর মালিক সিন্ধিরা কিন্তু প্রচুর টাকার মানুষ, দৃশ্যমান আটতালা দশতালা বাড়ীর মালিক, এতে যখন অবাক লেগেছে তখন আমার চেয়ে অনেক-জানা বাঙ্গালীদের কাছে জ্ঞান পেয়েছি 'কেন জানেন না, ওসব ছোট ছোট দোকানগুলো আসলে ছোট নয়, ওগুলোতে ঘড়ি স্মাগলিং এর জায়গা।'

তবু ভাত ও থালা দুয়ের কথাই সাময়িক ভাবে জোরজবরদস্তি ভুলে গিয়ে, অস্বীকার করে, 'দুয়ে দুয়ে চার' এর হিসাব মিলাতে বসেছি। কার্জন পার্কের অনশন দেখলাম, ১৫ই মার্চ ১৯৭০ এ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে মার্কসবাদীদের মিটিং এ লাল মশালের আলো জ্বালার উইটনেসও থাকলাম। এক পক্ষ আর এক পক্ষকে দোষারোপ করে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট ডিভাইডেড হল—১৬.৩.৭০ এ যুক্তফ্রণ্ট ভাঙলো। যুক্তিবাদী এই অরাজনৈতিক আধার স্পষ্টরূপ নিল— গান্ধীবাদী অজয় মুখার্জীর সৌম্যমূর্তিতে ও ন্যায়নিষ্ঠা খুঁজে পেলাম না, যাঁকে দেখে একদা যুক্তফ্রণ্টে এসেছিলাম তাঁকে চিরতরে মন থেকে বিসর্জন দিলাম। চরিত্রহীনের (মীরজাফর চরিত্রবান ছিলেন একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না !) প্রতি সজাগ দৃষ্টি সব সময়েই পরবর্তী দিনগুলোতে রাখলাম।

ঘোষ-মুখার্জীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হয়। রাজনীতির প্রতি অনাগ্রহী ছাপোষা মনটার মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার তো তাঁরাই প্রথম করলেন।

কে দত্ত আমার শৈশবের ক্ষত, জ্ঞানোন্মেষের পর ন্যায়-অন্যায়ের অনুভূতিতে যিনি প্রথম আলোড়ন আনেন তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় ভারতবর্ষের ত্রিরিশ দশকের (এবং চল্লিশের দশকের প্রথম দিকেরও) বিখ্যাত গোলরক্ষক কালীধন দত্ত। সেদিনের শিশুর মনে ছিল না কোন ধনের আশা, না ছিল আকাঙ্খা কোন মানের, নয় এতটুকু বাসারও, একটী আকাঙ্খাই সেদিন ছিল— ভালো ফুটবল প্লেয়ার হব, নামকরা গোলরক্ষক হব। খেলা নিয়ে ছোট বয়সে মাতামাতিকে কেউ সুনজরে দেখতেন না তখনকার দিনে, হয়ত এখনও নয়, তবু প্রাণের আবেগে আমি তাতেই জড়িয়েছিলাম। আজ জানি খেলাধুলা করা মানেই উচ্ছন্নে যাওয়া নয় (হয়ত উল্টোটাই—একজন সৎ খেলোয়াড়ের মন বহু শিক্ষিত জনের মনের চেয়ে অনেক উদার)।

গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা বাঞ্ছনীয়>> স্বামীজির এই কথাটি সেদিন জানা ছিল না কিন্তু আজ জানি। তা সত্ত্বেও এবং **all work and no play makes Jack a dull boy** এই ভয়ের কথা আজ জেনেও কোন খেলাই আর খেলি না। আশ্চর্য ঘটনা, যারা কখনও ফুটবলে পাও দেন নি, তারাও খেলা দেখতে যান খেলার খবর রাখেন অথচ আমি কোন সংবাদই রাখি না। একাধিক দিনে রেডিয়োতে রীলে হওয়ার সময় অন্যের কাছে অপ্রস্তুত হতে হয়েছে ইদানীংকালে—কার সাথে কার খেলা হচ্ছে বলতে পারিনি, নিজের সমবয়স্ক অথবা প্রবীণতর দু'একজন দুর্মুখের মুখ থেকে শুনেছি 'আচ্ছা বেরসিক তো মশায় আপনি, কাজ ছাড়া কিছু জানেন না।' অথচ একদিন ছিল যেদিন বিবেকানন্দের বাণী অথবা জ্যাকের বোকা বনবার ভয়ের গল্পটা কোনটাই না জেনেও পাগল ছিলাম এই খেলাকে কেন্দ্র করে। এই তো সেদিন ১৯৬৯-৭০ সালের ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচের সময়—লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনে খেলা দেখবার চেষ্টা করেছি যেদিন ভীড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে ছয়-ছয়টি তাজা ছেলে মারা যায় তার আগের দিন পর্যন্ত।

১৯৩৫, ৩৬ অথবা তারও দু'একবছর পরে আমাদের শহরে খেলতে গিয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব— রাজশাহী শহরের পুলিশ মাঠে খেলা হয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল বনাম রাজশাহী টাউন ক্লাবের। গোলে কে দত্ত, ব্যাকে প্রমোদ দাশগুপ্ত রাখাল মজুমদার, ফরোয়ার্ড লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্গেশ জুটির লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন ইষ্টবেঙ্গল দলে। সেদিনের খেলায় হেরেছিল আমাদের টাউন ক্লাব ২-০ গোলে কিন্তু উচ্চাকাঙ্খী গোল-রক্ষকের মন তাতে অখুশী হয়নি, বহিরাগত ইষ্টবেঙ্গলের গোলকীপার

১৩৯। 'You will be nearer to heaven through football than through the study of Gita... You will understand the Gita better with your biceps, your muscles a little stronger.' (Vol III. P. 242)

কে. দত্তের বিপক্ষে যে একটাও গোল হয়নি এটাই আমার গর্বের বস্তু হয়েছিল। অনেক উঁচুতে একটি লাফ দিয়েছিলেন কে দত্ত, ৫/৭ ফুট উঁচু পর্যন্ত লাফ দিয়ে একটি বল ধরবার সেই অভিনব দৃশ্য আজও মনে আছে। ভবিষ্যতের ভাল গোলরক্ষকের মন হরণ করেছিলেন ইষ্টবেঙ্গল-গোলী, কে দত্ত আমার গুরু হয়েছিলেন। মাঝারি উচ্চতা (অথবা বেঁটেই বলা যায়) বিশিষ্ট মোটা সোটা লোকের পক্ষে অতদূর জাম্প করা সম্ভব এটা না দেখলে কখনও বিশ্বাস হত না।

কে দত্ত হওয়ার আকাঙ্খা একজন স্বপ্নবিলাসী বালককে পাগল করে তুলেছিল—শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ছিল সেই একমদ্বিতীয়ম্ চিন্তা 'বড় গোলী হব' আর তার সাথে ছিল পাগল-পাড়া কার্যক্রম-ছাত্রের তপস্যা অধ্যয়নকে অস্বীকার করে দিনে রাতে ফুটবলে পা দেওয়া। কে. দত্ত পরবর্তী সময়ে ইষ্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানে গেলেন, মোহনবাগান ক্লাবও আমার শহরের টাউন ক্লাবের সাথে খেলতে এসেছিল, জিতেও ছিল কয়েক গোলে—আশ্চর্য ঘটনা, ইষ্টবেঙ্গল-সাপোর্টার সেদিন মোহনবাগানের জয়-আকাঙ্খী হয়েছিল, দলত্যাগী গুরুর সাথে সাথে শিষ্যও দল পালটেছিল, 'গুরু যেখানে আমিও সেখানে—আমার শহরের টাউন ক্লাব গুরুকে গোল দিয়ে পরাভূত কর্তে পারেনি, সেদিনও সেই গর্বই মুখ্য-কথা হয়েছিল।

সময়টা ১৯৪০—মাঠে হবু কে. দত্ত তার টিমের হয়ে খেলছিল, হঠাৎ কে যেন খবর দিল (তখন রেডিয়ো ঘরে ঘরে ছিল না, কে. দত্ত হওয়ার গগনস্পর্শী আকাঙ্খীও বীলে শুনবার ব্যবস্থা করতে পারেনি) আই. এফ এ শীল্ডে মোহনবাগান ৪-১ গোলে হেরেছে। অবিশ্বাস্য খবর—তবু খবরটা সত্যি। আরো খবর মিললো পরে, কে. দত্ত নাকি ঘুষ খেয়ে বল ছেড়ে দিয়েছেন। একটা নয়, দুটো নয়, চার চারটে গোল কে. দত্তের মত গোলরক্ষকের বিপক্ষে—খবরটাতে কেমন যেন সত্যের আভাস, মিথ্যা বলে একদম উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। তবু

সরল বিশ্বাসী আধারে সংশয় পুরোমাত্রায়; নিজের প্রাণ-মন সঁপা গুরু বলে কথা। সেই বিশ্বাসের মূলেও কুঠারাঘাত করলো পরবর্তী সময়ের নানাবিধ খবর—প্রেমলাল নাকি জিনিসটা বুঝতে পেরে লোভী গোলরক্ষককে মাঠের মধ্যেই খেলা শেষে মারতে গিয়েছিলেন, রাইট-আউট এস. গুহ (যিনি একমাত্র গোলটি দিয়েছিলেন) ও নাকি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে প্রহারোদ্যত হয়েছিলেন গোলরক্ষক কে. দত্ত ও ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্তীকে (যতদূর মনে পড়ে বেণী মাধবের রোষ-বহ্নিও নাকি দর্শককুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল)। সে যাহোক, খবরটা রটনা অথবা ঘটনা—নানান যুক্তি, পক্ষে বিপক্ষে নানান কথা, বহুদিন ধরে কাজ করে শিষ্যের মনটাকে শেষ পর্যন্ত কালিমাযুক্তই করে ফেলেছিল—ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায়, অভিমানে গুরু-পরিত্যাগ ঘটলো এ আধার থেকে। এর পরে ইষ্টবেঙ্গল গোলী ডি. সেনের খবর রেখেছি, মহমেডানের ওসমানকে স্মরণ করেছি, বয়স প্রাপ্তির পরে বলাই দে, ভরদ্বাজ, থঙ্গরাজ সকলেরই খবর নিয়েছি কিন্তু না, কে. দত্তের খবর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আর কখনও নিইনি। তিনি মোহন-বাগান ছেড়ে অন্য কোন্ দলে খেললেন, প্রথম ডিভিশনে অথবা দ্বিতীয়তে তাতে আমার কি আসে যায়? গুরু একজন সত্যিকারের নিবেদিত-প্রাণ শিষ্যকে সারাজীবনের মত হারালেন।

কে. দত্তই শেষ কথা হতে পারে না, বলাই চ্যাটার্জীরাও এ সমাজে আছেন। মধ্যবয়সে এই ফুটবল-পাগল মহাপ্রাণের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, খুব কাছে থেকে তাঁকে অনেক কবছর ধরে দেখছি—ফুটবল-জগৎটা, তাহলে একেবারে ক্লেদে ভর্তি মরুভূমি হয়ে যায় নি। পৃথিবীটা সুন্দরও বটে।[১৪০]

১৪০। যাদের বলাই চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়েছে, তারা বুঝবেন কথাটির মধ্যে ভাবাবেগই একমাত্র কাজ করছে না। সারা-জীবন 'আমি ভালো ফুটবলার তৈরী করবো' এই স্বপ্ন নিয়েই কাটালেন

ম্যাগশেসাই পুরস্কার প্রাপ্ত অধুনা আমেরিকা প্রবাসী অমিতাভ চৌধুরী নামক সেই বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর সদালাপী যুবকটির চেহারায় আজ স্বচ্ছলতার স্বাচ্ছন্দ্য সমেত বয়সের ছাপ পড়ে কতটা ভারিক্কি হয়েছেন, তা দেখবার আকাঙ্খা আমার বহুদিন হল গিয়েছে। 'নেপথ্য-দর্শনের নিরপেক্ষ' আর আনন্দবাজারের নিরপেক্ষ (তা) কে আলাদা করে দেখা আমার মত লোকের পক্ষে আজ আর সম্ভব নয়। সেদিনের 'নিরপেক্ষ' তাঁর 'নেপথ্য দর্শন' দ্বারা নিজের পক্ষে ঝোল টেনেছিলেন —লেখাগুলো তাঁর জীবনে স্টেপিং স্টোন হিসাবে কাজ দেবার উপায় মাত্র সেটা অনেক দেরীতে হলেও ধরতে পারা গিয়েছে। যুগান্তরের সেদিনের সহ-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী এবং পরবর্তী সময়ের সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ[১৪১] থেকে মন আমার অনেককালই বিবাউণ্ড খেয়ে ফিরে চলে এসেছে।

১৯৭০ এ ব্যারিষ্টার অশোক সেন-ডাঃ ভূপাল বসুর 'দৈনিক বসুমতী'র ক্লোজার হয়— বিবেকানন্দে দেওয়া মন বহুদিন ধরে খবরের কাগজ প্রায় না পড়েই দিন কাটিয়েছে। এল তারপর 'সাপ্তাহিক বাঙলা দেশ' আর তারও অনেক ক'মাস পরে দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকা। দুটি পত্রিকাই বিবেকানন্দ মুখার্জীর আশীর্বাদ পুষ্ট. শেষোক্তটিতে তিনি 'প্রধান সম্পাদক' এর দায়িত্ব ভারও গ্রহণ করেন। দুটি পত্রিকারই সম্পাদক 'জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাঙলাদেশ' ও 'সত্যযুগ' এর প্রথম দিন থেকে পাঠক আমি – বহু কষ্ট করে তখন গ্রাহকদের কাগজ সংগ্রহ করতে হত প্রতিদিন— যারা করেছেন তারা

সংসারী অথচ সংসারে নির্লিপ্ত মানুষটী। 'সমাজ সংসার মিছে সব মিছে এ জীবনের কলরব' 'ফুটবল তুমিই সত্য তুমি শাশ্বত' এটাই তাঁর জীবন-সত্য ছিল। চুনী গোস্বামীদের গুরুভাগ্য সত্যিই ঈর্ষার বস্তু।

১৪১। এখন এই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় সুকমল কান্তি ঘোষের।

ছাড়া কেউ বুঝবেন না সে সব দিনের অসুবিধের কথা। ('সত্যযুগ' পত্রিকার কদর্য হরফের জন্য বাড়ীর লোকেদের বহু ব্যঙ্গযুক্ত সমালোচনা হাসি ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছে সেদিনের 'সত্যযুগ' পাঠককে)। 'সত্যযুগে'র রীডার আমি 'বিবেকানন্দে'র প্রধান সম্পাদনায় পড়েছি 'সমাজতন্ত্রের বুলি, ফ্যাসিজমের গুলি', পড়েছি আরো অনেক সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য বামপন্থী লেখকদের লেখা প্রবন্ধ।

'বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়' সৃষ্ট বামপন্থী মন আমার বিবেকানন্দ-পরিত্যাগ করেছে ৭-১-৭৩ এ কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাকগ্রাউণ্ডটা অবশ্য অনেক দিনের পুরাণো। বিবেকানন্দ মুখার্জী যে জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর সন্ধান দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ-পরিত্যাগের পরও আমি তাঁকেই ধরে আছি। বিবেকানন্দের দেওয়া দৃষ্টি দিয়ে আমি পেয়েছি প্রভাত গোস্বামী, কল্পতরু সেনগুপ্ত, অধীর চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী (সাপ্তাহিক 'বাঙলা দেশে'র সম্পাদক), দুর্গাদাস সরকার (মাসিক 'বাঙলা দেশ' সম্পাদক), হীরেন বসু ('দর্পণ' সম্পাদক) দের। আপাততঃ আমি এঁদের সকলকে ধরে আছি,[১৫২] ছেড়েছি শুধু তাঁকে যিনি আমার সঙ্গে এঁদের পরিচয়

১৫২। জানুয়ারী, ১৯৭৪এ 'সত্যযুগে' সংঘটিত একটি ঘটনাকে (চীফ রিপোর্টার অধীর চক্রবর্তীর পদত্যাগ অথবা বিতাড়ন) কেন্দ্র করে অধীর চক্রবর্তী ও পত্রিকা সম্পাদক জীবনলাল বন্দোপাধ্যায় এর যে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ অশোক মিত্রের বক্তৃতাকে সামনে এবং অন্য বেশ কিছু ঘটনাকে পেছনে রেখে, তাতে যুক্তিভিত্তিক মন 'অধীর চক্রবর্তীর দিকেই টলেছে। মাস খানেক-দুয়েক পরে কল্পতরু সেনগুপ্তের 'দৃষ্টিপাত' লেখাকে কেন্দ্র করে তাঁর এবং সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর মধ্যে যে বিবাদ বিসংবাদ ঘটে তাতেও পত্রিকা-সম্পাদকের চেয়ে খারিজ করা লেখকের দিকেই মন ধেয়েছে। তবু আজও আমি ওই দুটি পত্রিকার নিয়মিত পাঠক, ঐসব ঘটনা প্রতি মূহুর্তে মনে রেখেই—নির্দলীয় পত্রিকা 'সত্যযুগ' আর 'বাঙলা দেশ,' 'দর্পণ' প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কটি পত্রিকা এই হতাশা ব্যঞ্জিত বঙ্গে,

করিয়েছেন। কেন, তা' আপাততঃ অবান্তর বোধে বলা থেকে বিরত থাকলাম।

যুক্তিবাদী মন আমার যেমন করে অজয় মুখার্জী-প্রফুল্ল ঘোষেদের ছেড়েছে, ঠিক তেমনি করে দেড়যুগ-দু'যুগের শিক্ষক-সাথী সম্পাদককে মনের কোণ থেকে নির্বাসন দিয়েছে। 'দৈনিক বসুমতী'র পুনঃ মুসিক সম্পাদক 'বিবেকানন্দ মুখার্জী'র কোন লেখাই আর জীবনেও পড়বো না আপাততঃ এই প্রতিজ্ঞা। 'অমৃতে'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক লেখা 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ'...টা ইচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে পারলাম না— লেখকের নামটি বাদ সাধলো।

যে মন অজয় মুখোপাধ্যায়-প্রফুল্ল ঘোষকে ছেড়ে জ্যোতি বসু-প্রমোদ দাশগুপ্তের দিকে ধেয়েছে, সেই বিবেকানন্দ-খারিজ করা মনই পরিচয় করিয়েছে সুধাংশু দাশগুপ্ত-সরোজ মুখার্জীর 'দেশহিতৈষী' 'গণশক্তি'র সঙ্গে। যুগান্তর, দৈনিক বসুমতীর একদা গ্রাহক আমি আজ সি. পি. এমের পত্রিকাগুলোর নিয়মিত পাঠক। ভবিষ্যতেও থাকবো কিনা সেটা নির্ভর করে সি. পি. এম দলের উপর, নেতৃত্বের ব্যবহার যদি এ মনে চিড় ধরায়, বলতে দ্বিধা নেই আমি 'গণশক্তি' 'দেশহিতৈষী'কেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবো।[১৪৩]

শোকা-উকির সাংবাদিক-বাহুল্যে তবু এঁরা মূর্তিমান প্রতিবাদ যা কিছু আশার বাণী শোনাচ্ছে। এর তুলনা নাই—এঁরা সকলেই অসাধ্য সাধন করে চলেছেন দিনের পর দিন। বন্দ্যোপাধ্যায়-চক্রবর্তী-সরকার-বসুদের সাধুবাদ জানাবার সাথে সাথে তাঁদের দীর্ঘজীবনের কামনা জানাই।

১৪৩। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।'

আমি নেতা নই, ফলে আমার ডাক শুনে কারো আসবার প্রশ্ন নাই। আমার নেতাদের ডাকে সাড়া দেওয়াই আমার কাজ। তবু যদি আমার সন্দেহ প্রবলতর হয়, যদি বুঝি আমার অধুনা নেতারা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ

এই বইয়ে যে কথাটা আমি বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে নিজের মন সৃষ্টি করার কথা। একটি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মনের বিবর্তনের কথাই এতে লেখা থাকলো। 'যার ৯-এ হয়না তার নব্বই-এও হয়না' এইবাঙালী প্রবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রতিপন্ন করেছে আমার জীবন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত যে কিছুই বুঝতো না, পঁয়তাল্লিশে যে তার দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ হয়ে গেলো এ তো নিজের জীবনেই দেখলাম। যা বুঝেছি তাই লিখেছি, যা জানলাম—টু দি বেষ্ট অব মাই নলেজ অ্যাণ্ড কনশান্‌স্—তাই তো শোনালাম, কারো কাছেই কোন অবলিগেশন না রেখে।

মন যদি যুক্তিবাদী স্বচ্ছতা পায় তবে সেই পারে সঠিক পথ দেখতে, নেতা খুঁজতে। চৌবাচ্চার পুরণো জল আউট-লেট দিয়ে বের করে তবেই নতুন পরিস্কার জলের স্থান হয়, নচেৎ চৌবাচ্চাটি একটি 'ঘোলা, অপরিস্কার জলের আধার হবে। হুম্‌ টু ডিসকার্ড এণ্ড হোয়াই এই জিনিসটি পুরোপুরি যে মন বুঝতে পারবে সেই মনই সময়ে ঠিকমত ধরতে সক্ষম হবে হুম্‌ টু অ্যাকসেপ্ট। নিজের মন সৃষ্টি হলে তবেই কাকে রাখবে, কাকে বর্জন করবে এ চেতনা আসবে। ইদানীংকালে কাউকে কাউকে বলতে শুনি গান্ধীজিম্‌ এযুগে অচল— আমিও বলি গান্ধীজিম্‌ অচল তবে এযুগে নয়, সর্বযুগে। গান্ধীবাদ কখনও একটি সচল ইজ্‌ম্‌ ছিল না। গান্ধীজি সায়েন্সকে পছন্দ

আর করতে পারছেন না, তাদের ডাকে আমি সাড়া না দিয়ে জীবনের বাকী কটা দিন একলাই চলবো। আমার আসল নেতা সুভাষচন্দ্রকে অনুসরণ করে ছোট মুখে বড় কথাটাই সেদিন বলবো 'আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনি নই'। হ্যাঁ দরকার হলে বুকটান করেই সেই দুঃসাহসিক কথাটাও এই সুভাষ নিবেদিতের মুখ থেকে বেরোবে : আমি সুভাষচন্দ্রেরও 'প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনি নই।'

অতএব 'গণশক্তি', 'দেশহিতৈষী', 'পিপলস্‌ ডেমোক্রেসী' ত্যাগ করা অসম্ভব কিসে ?

করতেন না যদিও সে সব তিনি পরীক্ষায় পাশ দিতে গিয়ে পড়েছিলেন, একথা রামমোহন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছি; যিনি বিজ্ঞান পছন্দ করেন না, বিজ্ঞান ভিত্তিক সচল যুক্তিবাদী মতবাদ তাঁর কাছে আশা করা বাতুলতা। সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় যাঁর এলিমেণ্টারি সায়েন্টিফিক ট্রেনিং নাই, তার প্রতি শ্রদ্ধা নাই।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, যা বিশ্বের অন্যতম চিন্তাশীল নায়ক চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অশীতিবর্ষীয় প্রতিষ্ঠাতা মাও-সে-তুঙ তাঁর নিজের দেশ চীনে সার্থকভাবে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীলভাবে চালাচ্ছেন, তাই হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদ যাকে পুঁজি করে তামাম দুনিয়ার ⅓ অংশ লোক তাদের দেশে 'সমাজতন্ত্র' এনেছে। সে সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষের কংগ্রেসী নেত্রী-নেতাদেব বক্তব্য-সর্বস্ব 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'[১৪৪] বা 'সমাজতন্ত্র ধাঁচের মত' নয়— তা লেনিন মার্কস-স্ট্যালিনের সমাজতন্ত্র। মাও-সে-তুঙ 'যুক্ত সরকার সম্পর্কে' ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫এ বলেছেন 'আমরা কম্যুনিষ্টরা আমাদের রাজনৈতিক অভিমত কখনো গোপন রাখি না'। কিন্তু ভারতের সর্ববৃহৎ দল কংগ্রেসের লীডার ও লীডারেসরা তাদের রাজনৈতিক মতবাদ আজ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কখনও স্পষ্ট আকারে মানুষের কাছে রাখেন নি— নিজেদের অজ্ঞতা এবং জানবার আগ্রহের অভাব এব একমাত্র কারণ। যে কাজ জানে না, সে কাজ করে না, করতে পারার মত ক্ষমতা কোথায় তার? যে জানে বোঝে, শেষ পর্যন্ত করতে যদি নাও পারে, করবার চেষ্টায় সে পরাঙ্মুখ হয়ত নাও হতে পারে। সচেতন লোক সৎ হলে অন্যকে ভুল সে বোঝাবে না, নিজের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবে এবং অন্য আর দশজনকে তা বুঝিয়ে দেবে। সৎ প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন তা' নতুন পথ দেখায়। কিন্তু মত যাদের কিছু নাই অন্ততঃ মানুষের কাছে তুলে ধরবার মত মানসিক

১৪৪। গান্ধী জহরলাল প্রমুখের 'সোনার পাথর বাটি।'

শিক্ষা যাদের নাই, তারা কোন পথেই বা নিজে চলবে আর কাকেই বা দেখাবে পথ? তাই স্টাণ্টবাজী তাদের একমাত্র মত ও আবোল-তাবোল কার্যকলাপই একমাত্র পথ। মানুষ তাদের শিকার আর অতিমানুষ-অমানুষরা সাথী, সাঙ্গো এবং পাঙ্গ।

নিজের রাজনীতিক কোন স্পষ্ট চেতনা না থাকলেও সবসময় একটা ঋজুরেখার দিকে নজর রেখে চলায় জীবনের বহু সময়ের খণ্ড খণ্ড স্মৃতিও নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কংগ্রেসী, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এবং কাছাকাছির মধ্যে অনেক দেখেছি। তাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির, পুরো জীবনটা স্বার্থত্যাগ করেছেন, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমার মত অরাজনীতিকের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তাদের ফানডামেণ্টালটা ক্লিয়ার না থাকায়, সারাজীবন তারা ভুল অঙ্ক কষেছেন। ফলে নিজেরা যত না ব্যর্থ হয়েছেন তার চেয়েও বেশী সমাজের ক্ষতি হয়েছে তাদের দ্বারা পরোক্ষে। বস্তুতঃ গান্ধীজির মত কম্প্লেক্স ও অ্যাম্বিগুয়াস চরিত্রটি অনুসরণ করে কংগ্রেস অর্ধ শতাব্দীরও উপর চলেছে ফলে তাদের নেতা থেকে আরম্ভ করে কর্মী পর্যন্ত প্রায় সকলেই উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলা এবং কাজকর্ম করাতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করেছিলেন গমন, সেই পথ ধরেই এঁরাও (ভক্তরাও) প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন। গান্ধী-হেঁয়ালীবাদ প্রায় পুরো বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজটাকে একটা ন্যাকামির আখড়াতে পরিণত করেছে। বৈঠকখানায় আর ড্রয়িংরুমে শতকরা ৮০ জন বাঙ্গালী রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন—বেশীর ভাগই কিছু বিপ্লবী বিপ্লবী গালগপ্প বিড়লার নকশাল হবার মতো। চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা সে সব গাল-গল্পের যুক্তিতর্ক গুলি প্রায়ই গান্ধীজির কথাবার্তার মত। যে যা বোঝেন না তাই বলেন, যা বলেন তা কখনও কর্বার আকাঙ্খা মাত্র রাখেন না, এরকম মানুষই আজ বাঙ্গালী সমাজে বেশী— এরকম ন্যাকা ন্যাকা

মনোভাবের লোকে সমাজ আজ ভরিয়ে দিয়েছে— গান্ধীবাদ এর স্রষ্টা —প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ স্রষ্টা।

কংগ্রেস সরকার যতই মনেপ্রাণে অস্বীকার করা যাক, ভোরের সংবাদপত্র ও সারাদিনের রেডিয়ো মারফৎ, এই সরকারের নামী-বেনামীদের সুনামই সকাল সন্ধ্যা শুনতে হয়। দেশে গাঁয়ে একটা কথা চালু ছিল অমুক লোকের নাম নিবে না— নিলে হাঁড়ি ফেটে যাবে অর্থাৎ অলুক্ষণে নামী লোকটির নাম নিলে সারাদিন খাবার জুটবে না ইত্যাদি। সাধারণতঃ দেখা যেত আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা লোকের মধ্যেই হু-একজনকে এরকম নাম দেওয়া হত। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকলেও কৃপণ অথবা অন্যান্য দিক দিয়ে অসৎ লোককে কেন্দ্র করেই এগুলো বলা হত। কিন্তু নাম করবো না করবো না করতে করতেও অনেক বারই তাঁর নাম করা হত—অনেক সৎ লোকেদের নাম দিনে যতবার নেওয়া হত তার চেয়ে অনেক বেশী বার হয়ত ঐসব স্বনামধন্যদের নাম এসে যেত জিভে। ভারত-বর্ষেও সেই অবস্থা এখন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদেরই নাম করতে ব্যস্ত থাকে লোকে, রাগেই হোক আর ঘৃণায়ই হোক, যাদের নাম একবারও নিতে ইচ্ছা থাকে না। রেডিয়ো খুললেই তাদের নাম, সংবাদ পত্র খুললেই তাদের ছবি ও বাণী।

আগে বলেছি আবারও বলি, সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে লেখা আমার এই বইটি একটি 'মধ্যবিত্ত মনের বিবর্তনের ইতিহাসে'র ফলশ্রুতি মাত্র। সাদা-মাটা সরলবিশ্বাসী মনে যখন অবিশ্বাসের বীজ বপন হল, কে ভাল কে মন্দ—দেশের ফ্রেণ্ড অর ফোদের যাচাইয়ের জন্য মন সেদিন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। এই হিটলারী-মিথ্যার ভারতবর্ষীয় বংশধরদের চিনতে অনেক সময় দিতে হল, অনেক শ্রম অনেক চেষ্টাই করতে হল। মনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র অহোক্ষণ বর্তমান, তাই সেদিনের গান্ধী-জহরলালকে ডিঙ্গিয়ে আজকের অজয় মুখার্জী-

ইন্দিরা গান্ধী-সিদ্ধার্থ রায়-কাশীকান্ত মৈত্রদের চেনাও অসম্ভব হল না। ষাটের দশকের পার্ক হোটেল ডীলটাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বৈঠকখানার বাঙ্গালী জজসাহেবরা যখন এক নিশ্বাসে রায় দিয়ে বসে বসে বগল বাজাতে থাকলেন, এ আইন-অজ্ঞ মনে তখন 'বেনেফিট অব ডাউট' কথাটা যাঁর কল্যাণে অনুপ্রবেশ করলো, তিনি আমার নেতাজী। বস্তুতঃ নেতাজী-সৃষ্ট মনটাই সেই দুর্দিনের 'অসভ্য, বর্বর' (?) মন্ত্রীসভার বিশেষ বিশেষ সদস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনেও সহায়তা করলো।

নেতাজীর দেওয়া মন দিয়ে আজ আমার ভারত-যাচাই পৃথিবী-যাচাই শেষ হয়েছে। আবার সেই একই মন দিয়ে আজও আমার নেতাজী-যাচাই চলছে, তাঁকে নিয়ে গড়াপেটা অনুক্ষণই আমি এখনও করি।

ব্যাঘ্রমার্কা লাল পতাকা বাহকেরা 'নেতাজীর পথই আমাদের পথ', 'নেতাজীর পথই ভারতের মুক্তির পথ' বলে বছরের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে দেওয়াল লিখন লেখেন, নেতাজী-সৃষ্ট সেই ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা তাদের নেতার সত্যিকার অনুগামী একথা নেতাজী-সৃষ্ট এই আধার আর বিশ্বাস করে না। দেশে নেতাজী-ভক্তের অভাব নাই, বিশেষ বিশেষ সমাজতান্ত্রিক নেতা 'নেতাজী-কমিশন' অথবা অনুরূপ কোন ইশ্যু নিয়ে দিল্লীর গোলবাড়ীতে দু-চারটে নামকাওয়াস্তে কথা বললেও তাঁদের কথাতেও নেতাজী-আন্তরিকতার কোন পরশ পাওয়া যায় না। 'নেতাজীর পথে' যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা বছরের পর বছর স্থাণুবৎ কেমন করে থাকেন? সুভাষচন্দ্রের 'বিপ্লব জিন্দাবাদ' কথাটা তো আর দশজন বাণী-বিতরণকারীদের মত কথার কথা হতে পারে না। 'বিপ্লব' কথাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে 'স্পীড', গতি— 'বিপ্লব-গতি'টাকে অস্বীকার করে চুপচাপ ঝিমিয়ে থেকে মাঝে মাঝে 'স্বদেশ আমার, স্বদেশ আমার' করে চেঁচিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ-

কারীদের সাময়িক লাভ হয়ত হতে পারে, তবে দেশের মাটিতে তাতে কোন স্পন্দনই অনুভূত হয়না।

একটা জিনিষ দৃষ্টি এড়ায়নি। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কোন গভীর আলোচনায় যেতে আজও কমিউনিষ্টদের মধ্যে অনেকেই (সি. পি. এম রা) তেমন ইচ্ছুক নন— প্রসঙ্গটা প্রায়ই তাঁরা এড়িয়ে যেতে চান। আমি নিজে অরিজিন্যালি সুভাষ-ভক্ত, তবু কংগ্রেসের এক নম্বর শত্রু সি পি. এম ঘেঁষা মন আজ আমার। সি. পি. এমকে গ্রহণ করেছি সুভাষ-বর্জন করে নয়, সুভাষচন্দ্রকে সর্বক্ষণ মনে রেখে, 'নেতাজীর পথই আমাদের পথ' একথা কোন সময়েই না ভুলে। পথ স্রষ্টার শ্রম তো কম নয়, স্রষ্টা-পথপ্রদর্শক যদি মধ্যপথে শ্রম-ক্লান্তি দূরীভূত কর্বার জন্য পথিপার্শ্বস্থিত কুঁড়েতে বিশ্রাম নেন, তবে আমি অনুগামী কি সেইখানেই মোড়া পেতে বসে পড়ব ? না, তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁর দেওয়া দৃষ্টি ও শক্তি নিয়ে আরো এগিয়ে চলবো ? যাঁরা মনে করেন নেতাজীর দৌড় ঐ মধ্যপথের কুঁড়ে পর্যন্ত, তাঁরা এই হিমালয়-সদৃশ চরিত্রটিকে আজো বোঝেন নি, তাঁর সম্পর্কে তাঁদের নীরব থাকাই শ্রেয়। আবার এও বলি, নেতাজী-ভক্ত বলে নাম ভীষণ কিনেছেন এরকম একাধিক রাজনীতিবিদ, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ, বাঙ্গালী এম. পি দিল্লীতে নেতাজী প্রসঙ্গ নিয়ে যতই সাময়িক হৈচৈ করুন আর বই লিখুন, বাঙলা দেশস্থিত বাঙ্গালীদের কাছে 'সুভাষবাদী' নাম কেনবার চেষ্টা ছাড়া আর বেশীদূর তাঁরা এগিয়েছেন একথা মনে কর্বার কোন কারণ দেখি না। নেতাজীকে ভালোবাসাই শেষ কথা হতে পারে না— নেতাজীতে যদি মতিই থাকে, তবে গতিরুদ্ধ কেন তাঁদের ? নেতাজী হল্‌ট করতে বলেন নি, মার্চ করতে বলেছেন—ফরোয়ার্ড মার্চ।[১৪৫] আন্দামানের সমুদ্রতটে

১৪৫। 'আগে বাঢ়ো' এ কথা যিনি বলেছিলেন তিনি 'কদম কদম' বাড়তেই বলেছিলেন।

ভারতের পানে তাকিয়ে যে ইতিহাস বিখ্যাত বীরের ছবি[১৪৬] তাঁরা দেখেছেন তা কি কোন স্থবিরের তসবির? নেতাজীর দেখানো পথে ফরোয়ার্ড মার্চ করতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কোন সুবিধাবাদী নেতাজী-ভক্তদের, ব্যবহার না করায় সেই পথ যে আগাছায় ভরে গেল—পরিস্কার করে এগোবে কোন্ জন? নামকরা নেতাজী অনুরাগীরা পুরনো দিনের জমিদারী কায়দায় (বাংলাদেশের সবাই ভূতপূর্ব জমিদার[১৪৭] অথবা জমিদারের নায়েব-গোমস্তা তো! আবার শেষোক্ত বাবুদের মেজাজটাও তাদের মনিবের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়) ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সকলকে হস্তনির্দেশে দূরে অবস্থিত 'নেতাজীর পথ'টা দেখান কিন্তু বাক্‌চাতুরী আর হেঁয়ালীতে যে 'ভারতের মুক্তি' কস্মিনকালেও আসবে না, এটা আমার গুরুভাইদের কেমন করে বোঝাই? (তাঁদের মতো অতি-শিক্ষিত তো নই, মন তাঁদের কেমনে পাই?) গান্ধী-শিষ্যরা যা করবেন তাই তাঁদের মানায়—পথের দিশারীর নিজেরই জানা ছিল না কোনো পথ, আগ্রহও ছিল না তাতে, ফলে অনুগামীদের চলার পথ বিপথই হোক আর কুপথই হোক, তাতে আর যাই হোক তাঁদের

১৪৬। এ ছবি সব নেতাজী ভক্তই দেখেছেন তবু ইজি রেফারেন্সের জন্য 'স্মরণে-মননে-সুভাষচন্দ্র' এর তিন পৃষ্ঠা দেখলে সুবিধা হবে।

১৪৭। যে সব জমিদারের ছিল রাজ্যপাট, তাদের জোটেনা আজ পেটের ভাত। তবু বাবুদের টেম্পারটা আজও প্রায় সেই আসল 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'ই তবে ১৯৭৩-৭৪এ যেন বেশ মিইয়ে এসেছেন মেজাজীগণ—চাল, ডাল আর তেল, কয়লা, বিদ্যুৎ সংকট ও ইন্‌ডেনী বুরশেনী গ্যাসের ফাঁসে বাবুরা দিশেহারা প্রায়, মেজাজী কাঠামোতে ফ্রাসট্রেশানের ধরাচূড়াগুলো তাদের একেবারে ধরাশাহী করে ফেলেছে। বেচারীরা!

লাগছে, বাবুদের বড্ড লাগছে যে!

এতকাল ঘুঁটে পুড়েছে, গোবরেরা হেসেছে। এখন রাজবাড়ীর দামী গোয়ালের নামী বলদ-গাই-বাছুর নিঃসৃত সম্ভ্রান্ত গোবরেরও খুবই আতঙ্কে দিন কাটছে, আগুন বুঝি বা সেখানেও পৌছাল!

গুরুদেবের ভর্ৎসনা পাবার কোন ভয় নেই, ভুলের জন্য কোন কৈফিয়ৎই তাঁদের পূর্বসূরীর কাছে দেবার নেই। কিন্তু সুভাষ-অনুরাগীরা কেমন করে অক্লেশে 'অজয়দা-সুশীল ধাড়া কটার সময় রেজিগনেশন দিচ্ছেন যাই ফোন করে জেনে আসি' বলেন ১৬.৩.৭০এ, একথা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। সুভাষচন্দ্রকে ভালবাসবো অথচ কট্টর কমিউনিজম-বিরোধী হব একথা একমাত্র ভারতবর্ষীয় বধিরদের কানের কাছেই বলা যায়। সুভাষে-ভজা মন প্রফুল্ল সেনের জন্মদিবস সভায় উপস্থিত হতে শরীরটাকে পারমিট করতে পাবে কিনা এ প্রশ্নটাও যেন এসে পড়ে।[১৪৮] প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক (এস, এস, পি) নেতা অধুনা কংগ্রেসী (অথবা কে জানে সেখান থেকে এতদিনে বিতাড়িত কিনা অথবা মনের দুঃখে অভিমানে নিজেই ছেড়েছেন কিনা) ক্যালকাটা হাইকোর্টের ঐতিহ্যবান নামী আইনজ্ঞ ভূমিমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র[১৪৯] খানদানী কমিউনিষ্ট বিরোধী—'ম্যাজিক অব লজিক'[১৫০] স্রষ্টার কোন অ্যাকশনেই আমাদের মত সাধারণ লোক (যাদের মধ্যে অনেকেই আইন-অজ্ঞ), পশ্চিমবঙ্গবাসীরা ১৯৭২-৭৩এ লজিক খুঁজে পান নি—এ হেন মৈত্র মহাশয়ের 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বেও প্রয়োগে'[১৫১] শুধু কমিউনিষ্টদেরই নয় ওঁব নিজের দলের (তা যদি এখনও থেকে থাকে) সদস্যদের কাছেও উপহাসের সামগ্রী হয়ে আছে

১৪৮। এ কথাটি লেখবার আগে এবং পরে অনেক চিন্তা কর্তে হয়েছে, বহু ভাবনা ভাবতে হয়েছে। আমি দিনে দিনে অত্যন্ত বায়াসড হয়ে পড়েছি কিনা একথাও মনে এসেছে। তবু শেষ পর্যন্ত লাইন কটাকে বাদ দিতে মন থেকে সায় পেলাম না।

১৪৯। ভূমি অবশ্য এঁর পক্ষে ফাঁসির সামিল হয়েছিল—বহুদিনের আকাঙ্খিত খাদ্যমন্ত্রীত্বটা শেষ পর্যন্ত হারাতেই হল—নিজ সৃষ্ট ভূমির ফাঁস মন্ত্রীজিকে চরম অখুশী করলো।

১৫০। এই নামে একটি বই লিখেছেন তিনি।

১৫১। মার্কসবাদ কি বাত-কা-বাত? অথবা মার্কসকে বাদ দিয়ে কিছু বাত-চিত? এ কথার উত্তর হয়তো মিলবে কট্টর মার্কস-বাদী, মার্কসে বাদী অর্থাৎ মার্কস-বিরোধী বিশেষ পণ্ডিত জনের কাছ থেকে!

নিশ্চয়ই'। অনুরূপে, সুভাষ অনুরাগ যাঁর সত্যিকারের থাকবে তাঁর পক্ষে ঝট করে কমিউনিজম বিরোধী হওয়া অথবা সি. পি. এম বিরোধী ফ্রন্টে যোগদান করে অক্লেশে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে। পশ্চিমবঙ্গের তথা সারা ভারতবর্ষের যে ক্ষতি এই সুভাষ-অনুরাগীদের দ্বারা ঘটেছে তার জন্য জবাবদিহি তাদের একদিন না একদিন করতেই হবে— স্বরাষ্ট্র দপ্তরে দলবাজীর (?) অভিযোগ-বর্ম তাদের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে পাওয়াই দেবে না। যাক যা বলছিলাম— কমিউনিজম ঘেঁষা যে মনের আজ আমি অধিকারী, তার স্রষ্টিকর্তা সুভাষচন্দ্র, তাঁকে বর্জন করে কমিউনিজম-ফ্রন্টে আমার আগমন নয়।[১৫২] তাই মার্কসবাদী-কম্যুনিষ্টদের অনেকেই সুভাষ-প্রসঙ্গকে পাশ কাটাতে চাইলেও এই 'বঙ্গজ ভারত-নাগরিকে'র পক্ষে তা সম্ভব নয়। অতএব, অনেক সি. পি. আই (এম) সদস্য এখনও সুভাষচন্দ্রের যে যে কাজ ও কথাকে অসমর্থন করে তাঁর সম্বন্ধে নীরব থাকেন বলে আমার মনে হয়েছে, সেগুলোর একবার শেষ যাচাই হওয়া দরকার সুভাষে-অনুরক্ত মার্কসে-হেলা এই ছোট্ট আধারটির মধ্যে।

১৫২। জানি কট্টর সুভাষ-অনুরাগীরা, যাদের সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কথাবার্তা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে ছাপা হয়, তারা রুষ্ট হবেন, হয়ে বলবেন জানেন কি কমিউনিষ্টদের কাযকলাপ, শুনেছেন কি তাদের কথাবার্তা পড়েছেন কি তারা বলেছিল—

'The groups which make up the Fifth Column are the Forward Bloc, the party of the traitor Bose, the C.S P & the Trotskyte group.... The Communist Party declare that all these three must be treated by every honest Indian as the worst enemy of the nation and driven out of political life and exterminated? [Communist Party : Facts and Fiction, 'আমি সুভাষ বলছি' ২য় খণ্ডের মাধ্যমে, পৃঃ ৩৫৮]

'অর্থাৎ— সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লক, সি. এস. পি, ট্রটস্কীপন্থী ইত্যাদি সবাই

মণি বাগচী তাঁর 'বেণীমাধবের ধ্বজা'তে লিখেছেন : "ভারতের রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে ভারতবাসীর বৈপ্লবিক মনোভাব বা উদ্যম গান্ধীর অহিংসার বাতাস লেগে কর্পূরের মত উবে যেতো। গান্ধীযুগে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। মাইকেল এডওয়ার্ড মিথ্যা বলেন নি : 'India owes more to him than to any other man'. সুভাষচন্দ্রের কাছে আমাদের এই ঋণ আমরা কখনও যেন বিস্মৃত না হই"।

সুভাষচন্দ্র স্মৃতিতে আছেন কাদের ? স্মৃতিতে আনতে গেলেই তাঁকে স্বীকার করতে হয়, ফলে বিস্মৃতিই বেস্ট পলিসি কংগ্রেসের পক্ষে। থাকলো বাকি তাঁর ভক্তেরা, তা তাঁরা সুভাষ-জীবনীকারের কথা রেখেছেন, তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে স্মৃতি হিসাবে ঠিকই রেখেছেন— বাংলার মাটিতে বাৎসরিক সুভাষ জয়ন্তী হয় না তেইশে জানুয়ারীতে — ছবিতে মালা পরানো উৎসব ? আর টেবিলে বসে ১/৪ দিন টক্ শোনেন না 'নেতাজী কমিশন'কে কেন্দ্র করে ? কাপুরুষ-মহাপুরুষের এই দেশে অতবড় তেজস্বী পুরুষটি সম্পর্কে গবেষণার গতানুগতিক দায়িত্বটা একমাত্র 'নেতাজী রিসার্চ বুরো'র উপর সমর্পণ করে কি সুন্দর বসে থাকেন ওঁরা ?

'কুইসলিং প্রসঙ্গে' সুভাষচন্দ্রের রাশিয়া সম্পর্কে মতবাদের কথা বলা হয়েছে, হিটলার সম্পর্কেও তাঁর মনোভাবের কথা লিখেছি। তবে সেগুলো আংশিক, সেগুলো সমেত বাদ বাকীর মধ্য থেকে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশগুলো নিয়ে এবার আলোচনা করবো।

বিশ্বাসঘাতক। জনসাধারণের উচিত, এই তিনটি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক দলকে তাদের রাজনৈতিক জীবন থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া'।

তার উত্তরে বলবো : হাঁ, জানি, 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'।

সমাজতন্ত্রে আগ্রহী সুভাষচন্দ্রের মন কেড়েছিল The first Republic of Soviet Russia কিন্তু তিনি মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। মার্কস থিয়োরী ভারতবর্ষের মাটিতে প্রযোজ্য নয় এই ধারণা নিয়ে তিনি বলেছিলেন : "The materialistic interpretation of history which seems to be a cardinal point in communist theory will not find acceptance in India, even among those who would be disposed to accept the economic contents of communism." (The Indian Struggle P. 432)

সমাজতন্ত্রের পথেই ভারতের উন্নতি একথা বলতে গিয়ে ১৯৩১ এ কংগ্রেসের এক অধিবেশনে তিনি বলেন : 'I have no doubt in my mind that the salvation of India, as of the world, depends on socialism, India should learn from and profit by the experience of other nations —but India should be able to evolve her own methods in keeping with her own needs and her own environment In applying any theory to practice, you can never rule out geography or history. If you attempt it, you are bound to fail. India should therefore evolve her own form of socialism. When the whole world is engaged in socialistic experiments, why should we not do the same ? It may be that the form of socialism which India will evolve will have something new and original about it which will be of benefit to the whole world'.

উপরোক্ত কথাগুলির যাচাই মুলতুবী রেখে নজরটা এখন একটু অন্য-দিকে ফেরাই। ১৯৩৪এ সুভাষচন্দ্র 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' এ কমিউনিজমের চেয়ে ফ্যাসিজমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, অল্প কিছুদিন পরে তিনি বলেন 'সব মিলিয়ে আমার ধারণা, পৃথিবীতে এর পরে সভ্যতার ভিত্তি হবে কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদীদের একটা সমন্বয়'। সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন আমরাও আজ বুঝি যে এটি অসম্ভব (অবাস্তবও বটে) তবুও সুভাষচন্দ্র সেদিন অনুরূপ একটা অসম্ভব কথাই বলেছিলেন। অবশ্য ১৯৩৮এ ইংলণ্ডে স্বনামধন্য কমিউনিষ্ট নেতা রজনী পাম দত্তের কাছে যা বলে ছিলেন তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মত অনেকটাই পালটেছিল। তিনি বলেছিলেন : 'আমার বইটি লেখার পর গত তিন বছরে আমার মতামত আমি অনেক পরিবর্তন করেছি। যখন আমি বইটা লিখছিলাম, তখনও ফ্যাসিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ প্রকাশ করেনি। আমার তখন মনে হয়েছিল যে ফ্যাসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদ মাত্র। তাছাড়া ভারতে যারা কমিউনিষ্ট, তাদের অনেক কার্যকলাপকেই আমার জাতীয় স্বার্থবিরোধী মনে হয়েছে, বিশেষ করে তাদের জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী বহু কাজকর্ম। তবে এটা এখন স্পষ্ট যে তাদের মতও অনেক বদলেছে। তবে একথা আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে মার্কস ও লেনিন তাঁদের রচনার মারফৎ যে কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রচার করেছেন তার আমি অনুরাগী এবং আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে বরাবরই সমর্থন করে এসেছে।'[১৫৩]

বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী মহানায়ক প্রতিনিয়তই নিজের মনকে গড়া-পেটার মধ্য দিয়ে নিয়ে চলেছেন। ১৯২১ এর সমাজতন্ত্রে আগ্রহী যুবক দীর্ঘ তেরো বছর বাদে ফ্যাসীবাদ-মুখী ভাবধারা প্রকাশ করলেন কিন্তু সে অত্যন্ত সাময়িক। না হলে ১৯৩৫ এই তিনি কেমন করে

১৫৩। সুভাষচন্দ্র বসু : 'সাক্ষাৎকার, ডেইলি ওয়ার্কার' লণ্ডন ২৪-১ ৩৮

শয়তানের প্রতিনিধির সাথে হাত মেলাতে প্রস্তুত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মিসেস্ কুর্তীকে বলতে পারেন : 'It is dreadful but it must be done. British Imperialism there, can be just as intolerable as your Nazism here, I assure you' কি অদ্ভুত গতিশীলতা, মাত্র এক বছর বাদেই ফ্যাসিজম সম্পর্কে ধারণা কতটা স্বচ্ছ করে ফেলেছেন—তাই অক্লেশে দ্বিধাহীন-চিত্তে মার্কস-লেনিনে পূর্ণ আনুগত্যও আরো তিন বছর পরে প্রকাশ করেন। ১৯৩১-৩৪ এর কার্ল মার্কসে সংশয়াচ্ছন্ন মন অনায়াসে ১৯৩৮ এই কুয়াসা-মুক্ত হল অতএব হিটলার-সাহায্যপ্রার্থী ১৯৪২ এ জার্মাণীতে বসেই অনায়াসে বলতে পারেন 'Tell your Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side.' তিনি তো তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লক-ই শিষ্যদের মত জড় নন, ফ্যাসিবাদের একদা সমর্থনকারীকে তাই নিজের ভুল শুধরাতে বিন্দুমাত্র আমতা আমতা করতে হয় না : 'I am opposed to Hitlerism whether in India within the Congress or any other country, but it appears to me that socialism is the only alternative to Hitlerism.'

কমিউনিষ্টদের আজও অনেকেই মনে করেন সুভাষচন্দ্রের 'দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা একান্ত অদূরদর্শিতার ও ইতিহাস-চেতনার অভাবেরই পরিচায়ক'[১৫৪] যদিও সুভাষ-অনুরাগী কমিউনিজমে বিশ্বাসী 'ভারত-নাগরিক' এই ইস্যুতে তার কমরেডদের সঙ্গে একমত নন। এ সম্বন্ধে একটা প্রতি প্রশ্ন রাখি— প্রাক স্বাধীনতা যুগের কমিউনিষ্টরা কি ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন ? কথাটাকে আরো

১৫৪। গৌতম চট্টোপাধ্যায় : 'সুভাষ বসু ও ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন', 'বিচিন্তা' ফাল্গুন ১৩৭৯, বর্ষ ২ সংখ্যা ৬।

একটু এগিয়ে নিয়ে বলতেই হয় পি. সি. যোশীর আর ডাঙ্গে সাহেবের[১৫৫] নেতৃত্বে সেদিনকার গান্ধী-ভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি মোটেই 'দূরদর্শিতা' এবং 'ইতিহাস-চেতনার' পরিচয় দিতে পারেনি—অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সেদিনকার কমিউনিষ্ট পার্টির ঐ ন্যক্কার-বাজীর শরিক ছিলেন না এটাই একমাত্র সাফাই হতে পারে না। সেদিনকার সংকীর্ণতাবাদী কমিউনিষ্টদের যেমন বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের ভুল অ্যাসেস্‌মেনটের জন্য তেমনি আজকের কমিউনিষ্ট পার্টিকেও কুইস্‌লিং অ্যাফেয়ারটার উপর তাদের ভ্রান্তির স্বীকৃতির পরেও 'অদূরদর্শিতা, ও ইতিহাস-চেতনার অভাব' এই ধারণার ফলশ্রুতির জন্য যে একেবারে মূল্য দিতে হচ্ছে না এটা মনে কর্তে পারছি না, সুভাষে-অনুরক্তদের বহুজনেই কমিউনিষ্টদের এই গোঁড়ামীর জন্য ইচ্ছা থাকলেও তাদের দিকে পুরোপুরি ঢলতে পারছেন না, একটা সাইকোলজিক্যাল বেড়িয়ার যেন সৃষ্টি করেছেন তাঁরা।

১৫৫। ইনিও 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধি পেয়েছেন গত ৮-১০-৭৪এ রাশিয়া থেকে তাঁর জন্মদিনে, ৭৫ বৎসর বয়স পূর্তিতে। 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিটা কত চীপ হয়ে উঠেছে লেনিনের উত্তর সূরীদের আমলে!

এ সম্পর্কে আর একটী সংবাদ উল্লেখযোগ্য: নয়াদিল্লী, ৮ই অক্টোবর ১৯৭৪— "সি. পি. আই নেতা এস. এ. ডাঙ্গের ৭৫তম জন্মদিবসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে 'উষ্ণ অভিনন্দন' জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছা পত্রে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আপনার জীবন কর্মে ও ত্যাগে পূর্ণ। শ্রমিক আন্দোলনে আপনি গতি দিয়েছেন। অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন অনেককে। আপনি বহুদিন সুস্থ শরীরে জীবিত থাকুন এই কামনা করি"। (সত্যযুগ) (দাগ দেওয়া বর্তমান লেখকের)।

কয়েক মাস আগে (মে, ১৯৭৪) ঘটা রেলওয়ে ধর্মঘটে সি. পি. আই এর ন্যক্কারজনক ভূমিকাটার কথাই প্রথমে মনে পড়ছে ঐ অভিনন্দন বাণী পড়ে।

হায় পৃথিবী! এখন 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধি মেলে শ্রমিক-কৃষকদের প্রতি অমানবিক-অযৌক্তিক কার্যের স্বীকৃতিতে!

সি. পি. এম ঘেঁষা মন হলেও আজকের নেতৃত্বের উপর পুরো আস্থা যে সব সময়ই রাখা যাচ্ছে তাতো নয়। বহু ব্যাপারে তাঁদের মুল্যায়নের ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর তারিফ করলেও ১৯৭২ এর নির্বাচন একটা বিরাট কিন্তুর সম্মুখীন করিয়েছে। বরানগর, কাশীপুর, শ্যামপুকুর, টালিগঞ্জ, বেলেঘাটা, কসবা প্রভৃতি চল্লিশ-পঞ্চাশটি অথবা তার চেয়েও বেশী কেন্দ্রে নকশাল-কংশালদের অত্যাচারে সি. পি. এম কর্মীরা ঢুকতেই পরছিলেন না, বহুজনে তাদের বাসস্থান ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন—এ খবর সি. পি. এম নেতারা জানতেন বহুদিন ধরে, এটা নিয়ে তাঁরা রাজ্যপাল-প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি সকলের কাছেই ছুটেছেন কিন্তু একথা তাঁরা চিন্তা করতে পারেন নি চল্লিশটি বেড়ে দুশোটি অথবা প্রয়োজন হলে দু'শ আশিটি পর্যন্ত উঠতে পারে। তাই হয়েছে, কংগ্রেস ব্যাপক হারে নির্বাচন জালিযাতি করেছে—এতে ম্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স দেওয়া খুব সহজ নয় এটা মানি কিন্তু তাই বলে নির্বাচন প্রহসনটা সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কিছুই আঁচ করতে পারলেন না সি পি. আই (এম) নেতৃত্ব, এটা কেমন কথা ?

কথায় বলে সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কংগ্রেস তাদের আসল শত্রু ঠিকই চিনেছে। সি. পি. এমের কাছেও তার শত্রুর রূপ অস্পষ্ট নয়। কংগ্রেসরূপী সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বসেছেন অথচ সি. পি. এম-বেদেরা খল সাপের হাঁচিটা বুঝতেই পারলেন না, একথাটাকে সহজভাবে নিতে কিছুতেই মন সরে না। মাঝে মাঝেই অধুনা নেতাদের প্রতি নিজের সন্দেহ আসতে চায়। এতে আরো একটা কথার প্রমাণ হয়—সি.পি.আই (এম) এর এমন একটা সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে যার জন্য গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত খবরগুলো তারা কালেকশান ঠিকমতো কর্তে পারেন নি। অর্থাৎ সরকারী চাকুরীয়াদের মধ্যে বিশেষতঃ ওপরতলার একটা লেভেল পর্যন্ত সি. পি. এম কর্মীরা অনুপস্থিত।

পৃথিবীর সর্বদেশেই বড় বড় রাষ্ট্রনায়করা প্রায় সকলেই পরিণত বয়স পর্যন্ত রাজনীতিতে থেকেছেন। এক কেনেডি ছাড়া প্রায় সকলেই সত্তরের উর্ধ্ব পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং পলিটি-ক্যাল লাইফ লীড্ করেছেন। আমাদের দেশের গান্ধীজি প্রায় আশীর বছরে তিরোহিত হয়েছেন, জহরলাল পঁচাত্তরে—ভিন দেশের হো-চি-মিন পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেছেন. এমন কি মাও-সে তুঙেরও ৮০ বছর পূর্ণ হয়েছে গত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ এ। একমাত্র লেনিনই যা ক্ষণজন্মা ছিলেন, মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এতএব, তাঁদের সকলেরই প্রবীণ বয়সের চিন্তাধারার সাথে মানুষের পরিচয় ঘটেছে তাদের বহু লেখার মাধ্যমে। সুভাষ-চন্দ্রের কোন কথা আমরা তাঁর ৪৮ বছর বয়সের পর থেকে অফিসি-য়্যালি শুনিনি—দেখিনি তাঁর কোন লেখাও। এর মধ্যে পরের দিকের ৪।৫ বছর তো বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়। সুভাষচন্দ্রের আরো পরিণত বয়সের চিন্তা-ধারার সাথে পরিচিত হতে পারলে তাঁর কাছ থেকে আরো স্বচ্ছতর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তা আমাদের বরাতে ঘটেনি—১৯৪৫ এর পর থেকে তাঁর সংবাদ সামনাসামনি আমরা জানিনা। লোক সমাজে থাকলে তাঁর অনেক মূল্যবান দলিলই আমাদের হস্তগত হত।

অনেকে মনে করেন সুভাষচন্দ্রের লেখা পুস্তক-প্রবন্ধ তত সংখ্যায় নাই যা থেকে তাঁর দেশগড়ার সুচিন্তিত পথের নিশানা পাওয়া যায় —এর উত্তরে ঐ বয়সের কথাটার দিকেই আঙ্গুল তুলে দেখাবো। দেশে থাকতে গান্ধী-মহারাজদের সাথে প্রায়-একক যুদ্ধেই দিন কাটাতে হল, বিদেশের মাটিতে রাশিয়া, জার্মানী আর জাপানে ছুটতে ছুটতেই সময় গেল স্বাধীনতা-আনয়নের স্বপ্নকে রূপ দেবার মানসে —সময়টা পেলেন কোথায় শুনি যে দেশের লোককে শোনাবেন দেশগড়া সম্পর্কে তাঁর পরিণত বয়সের সুচিন্তিত মতবাদ? দেশের

জনগণ যদি তাঁকে দেশনায়কের পদে বরণ করে দেশ চালাবার ভার অর্পণ করবার জন্য আন্তরিকভাবে আহবান করতো, সাধ্য ছিল কি দেশপ্রেমিকের অভিমান নিয়ে দূরে বসে থাকা? ভক্তকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কোথায় শিবঠাকুরের? প্রবীণ দেশনায়ক পঞ্চাশের-ষাটের মাথায়, মার্কস-লেনিন আবার পড়ে এমন 'সুভাষবাদ' লিখতেন যা শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই নয়, 'which' would, have been 'something new and original about it which' could have been 'of benefit to the whole world.' মার্কস-লেনিন-মাও-সে-তুঙ সব বাদকেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করতেন, যদি তাঁদের কোন কোন অসঙ্গতি (রাশিয়া কেন এত শীঘ্রই অ সমাজতান্ত্রিক সংশোধনবাদীর কবলে পড়লো, মাও সে-তুঙের জীবদ্দশাতেই ৮০ কোটি মানুষের দেশ চীনে একটিও ভিখারী না থাকলেও সেখানকার শতকরা একশোটি কাজই কেন নীতিগ্রাহ্য যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারছে না এ প্রশ্নগুলো মনে এলে ওঁদের সম্ভাব্য অসঙ্গতি সম্বন্ধে ভাবতেই হয়) থেকে থাকে সেগুলোকে বর্জন করে মার্কসবাদ লেনিন-বাদ-মাও-সে তুঙবাদ-সুভাষবাদের এমন জগাখিঁচুড়ি সৃষ্টি করতেন (জগাখিঁচুড়ি সৃষ্টিই তো তাঁর জীবন এবং জগাদের হাত থেকে খিঁচুড়িটা সময়মত অক্ষতভাবে বের করে নিয়ে আসাটাই তো তাঁর ক্ষমতা) যা অত্যন্ত জ্ঞানী বিচক্ষণ মার্কসবাদীরও কল্পনার বাইরে।

অনেকেই হয়ত বলবেন নেতাজী মোহ এই ভারত-নাগরিক-কে পেয়ে বসেছে তাই অনেক কথাই রং চড়িয়ে ভাবতে বসেছি! কিন্তু না, সবটাই নেতাজীভক্তের ইমোশন নয়, অনেকটাই একজন অধুনা মার্কসবাদীর যুক্তিভিত্তিক নেতাজী-বিশ্লেষণ। এ অধম আজ সুভাষবাদী-মার্কসবাদী।

'Rationalist' সুভাষচন্দ্র 'Sentimentalist' ও বটে। তাই অক্লেশে নিজেকে পাগলও[১৫৩] ভাবতে পেরেছেন। তা আমাদের এই

পাগল সুভাষচন্দ্র কিনা পারতেন ! প্রবীণ বয়সে হয়ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে 'স্তালিন রচনাবলী' লিখতেই বসতেন— সে বইগুলির উপর প্রধান সম্পাদকের নামের স্থানে পীযুষ দাশগুপ্তের স্থলে 'সুভাষচন্দ্র বসু' থাকলে তিনি তা মোটেই তাঁর পক্ষে সম্মান হানিকর মনে কর্তেন না ! 'I could only join an organization to affect its policy and not be affected by it'—আর যাই হোক, এই ডিক্টেটরীসুলভ মনোভাব সুভাষচন্দ্রের ছিল না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকই তিনি হতে চেয়েছিলেন, আই. এন এর পলিসি দ্বারা 'affected' হতেই চেয়েছিলেন, organization টির পলিসি affect কর্বার আকাঙ্খা তো আর ছিল না। দেশপ্রাণ রাসবিহারী কিন্তু তাঁর অরগানাইজেশন এবং অরগানাইজেশন-টির পলিসি সবটা দিয়েই 'সেনিক'কে 'সর্বাধিনায়কে'র সম্মানিত পদে বরণ করে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৫৬। ভাব পাগল এই কর্মবীর নিজের ত্রিশোর্ধ বয়সে তাঁর মেজবৌদি-দিকে লিখেছিলেন: 'পাগল আমি নই তবে যদি মনে করেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। একটু আধটু ছিট না থাকলে চলবে কেন? একেবারে স্থির মস্তিষ্ক হওয়া কি ভাল'। (পত্রাবলী পৃঃ ২৭৩) অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক ফিলসফি অনার্সের ছাত্র তাঁর বন্ধু হেমচন্দ্র দত্তগুপ্তকে ১৬. ৯. ১৫ তারিখে লেখেন: ...'পাগল না হলে কেহ বড হইতে পারে না। কিন্তু সকল পাগল বড হয় না। All mad men do not become great men of genius. কেন? শুধু পাগল হইলে চলে না। আরও কিছু চাই। পাগলামির ভিতর আত্মসংযম হারাইলে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। আবেগের ভিতর আত্মস্থ হওয়া চাই। তাহা হইলে (then and only then) জীবনটাকে একটা Constructive basis এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। Emotion বা আবেগ সংযম করে—দীর্ঘ চিন্তা চাই। আবেগ না থাকিলে চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আবেগ থাকিলে চিন্তার ফল ফলে না। অনেকে আবেগবান কিন্তু ভাবিতে চায় না— অনেকে ভাবিতে জানে না'। (পৃঃ ৫৭-৫৮)।

ওঁরা বলেন, আমার সুভাষচন্দ্র নাকি 'অদূরদর্শী', 'ইতিহাস-চেতনার অভাব' তাঁর! তিনি যদি 'অদূরদর্শী' হবেন, তবে হে ভগবান,[১৫৭] তুমি বলে দাও, পৃথিবীতে আর কোন্ জনকে তুমি এত দূরদর্শিতা দিয়ে সৃষ্টি করেছো, কার প্রতি তুমি পক্ষপাতিত্ব করে আমার নেতার চেয়ে বেশী 'ইতিহাস চেতনা' দিয়ে প্রাণ দিয়েছো! বলো, তোমার ভুবনে আমার অজ্ঞাতে কার জীবন কোরক তুমি ফুটিয়েছো, যাঁর শির আমার 'শিবঠাকুরে'র উচ্চশিরকে ছাড়িয়ে গেলো? জানি, আমি জানি, ওঁরা আমার সুভাষচন্দ্রকে আজও চেনেন নি, তাই ভুল করেছেন—ওঁরা যে শুধুই মার্কসবাদী! আর আমি, এই 'বঙ্গজ-ভারত-নাগরিক', সুভাষবাদী-মার্কসবাদী।

সুভাষকে অস্বীকার করে মার্কসে আমার দরকার নেই। মার্কসকে বাদ দিয়ে সুভাষ-অন্ধতাও আমি চাইনে। মানিনে, আমি মানিনে—আমি নির্মম, নির্ভীক— আমি মার্কসবাদী ঐ মার্কসবাদীদের কথা মানিনে, মানবো না— যুক্তিবাদী মন মানতে দিচ্ছে না।

নেতাজীর কথাটিই অহোরাত্র কানে ঝঙ্কার দিয়ে চলেছে: 'নেতা যদি খুঁজে নাই পাও, তবে কি তোমরা চুপ করে বসে থাকবে? তোমরাই নেতা সৃষ্টি করে নিয়ে কাজে লেগে যাও। নেতা আকাশ থেকে পড়ে না— কাজের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে।'

নেতা-বিহীন অবস্থা আমার এখন নয়, আমার নেতাজীর দেওয়া মন নিয়ে যাচাই করে বহু কষ্টে নেতার দেখা আমি পেয়েছি—মার্কসবাদী প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, জ্যোতির্ময় বসু, সমর মুখার্জি, শশাঙ্ক শেখর সান্যাল, আমার নেতা, "বেকার বাহিনী 'শীর্ণ বাহুর অরণ্য'[১৫৮] এর জ্যোতি ভট্টাচার্য আমার লীডার,

১৫৭। মার্কসবাদী 'ভগবান' ডাকে পিলে পাছে চমকায়, তাই বলি আমি যে সুভাষবাদী!

সুভাষবাদী-মার্কসবাদী রাম চ্যাটার্জী আমার দলপতি, অধুনা তিরে-হিত সুকুমার রায়ের বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসী নেতা আমার পরিচালক। সুভাষচন্দ্র এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়েছেন—দৃষ্টি পুরো খোলা রেখে আজ আমি 'সুভাষবাদী-ভারত নাগরিক' এঁদেরই অনুসরণকারী। এঁদের উপব এখন পর্যন্ত পুরো আস্থা রেখেও তবু বলতে ইচ্ছা করছে: ভারতবর্ষে কমিউনিজমের গতি অত্যন্ত শ্লথ। এই ক'বছরে সি. পি. এম নানা হিটলারী-অপপ্রচার সত্বেও অনেক এনলার্জ করে থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় স্পীড মোটেই র‍্যাপিড নয়—আজকের নির্বাচন-পদ্ধতির প্রতি পূর্ণ অনাস্থা জানাবার পরেও বলবো সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র ২৫টি সীট পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি হবার গৌরব মোটেই প্রশংসনীয় নয়। (এই পার্টির পশ্চিমবাংলা-কেরালার ঝিনুক দিয়ে ভারতবর্ষ-সমুদ্র সেঁচা কতদিনে শেষ হবে?) গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার আজ প্রায় পশ্চিমবাংলার মতই অগ্নিগর্ভ, কিন্তু সেখানকার আন্দোলন মোটামুটিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত - কংগ্রেস বিরোধী সি.পি.এম দল সেখানকার নেতৃত্ব দিতে পারছে না। মানবো, দেশটাকে পৃথিবীর বৃহত্তম অশিক্ষিতের দেশ বানিয়ে কংগ্রেস নিজেকে সব সময়ই সুবিধে জনক অবস্থায় রেখেছে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের একটা বড় অংশই মরফিয়ার অ্যাকশনে নিমিলিত চক্ষু হয়ে 'জানি জানি' ভাব নিয়ে সমাজে বিচরণ করছেন ফলে এঁদের কাছেও ঘেঁষা বড় দুষ্কর তবু বলবো এই পরিস্থিতিটার সাথেই তো যুদ্ধ করে জিততে হবে। ইতিহাস বলনে এরকম ঘটনা তো অন্য দেশেও ঘটেছে— রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ১৯১৭ এর রাশিয়াতে তো মাত্র দশজন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিল. হো-চি-মিনের ভিয়েতনামেও তাই, খোদ চীনে চিয়াং কাইশেকের আমলে জিনিস-পত্রের দামের অবস্থা এরম উর্ধসীমায় উঠেছিল যে একটি প্রবাদই

১৫৮। এই নামে একটি জোরালো প্রবন্ধ লেখেন শারদীয়া সত্যযুগের পাতায়, পরবর্তী সময়ে যা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

চালু হয়ে গিয়েছিল : ব্যাগ-ভর্তি টাকা নিয়ে গিয়ে বাজার থেকে মনিব্যাগ ভর্তি জিনিস আনো। এই তিন দেশের নেতৃত্বই তে.'দেশের দুর্দশা দূর করেছেন। দেশের লোক শিক্ষিত হবে, সবাই কমিউনিজম বুঝবে তারপর লিবারেশন হবে— এ অবস্থা কি হওয়া সম্ভব? সব মানুষ কখনই শিক্ষিত হবে না।— (অন্ততঃ যতক্ষণ কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন ভার আছে) সাত মণ ঘি পোড়া আর রাধার নাচন—দুইই দূর অস্ত্। তবে আশার কথা, কংগ্রেসী ক্যালাস্‌নেস্‌টা ১৯৭২ এর পরে এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে আগুনটা সকলের পিঠই প্রায় স্পর্শ করছে— অনেকেই যেন দেশের দুর্গতির কারণটা কিছু কিছু ধরতে পারছেন।

তা'হক, তবু বলবো, আমার আস্থা নেতাদের উপর থাকলেও তাঁরা যেন নিজেদের উপর সেই পরিমাণ আস্থা রাখতে পারছেন না। দেশের বেশীর ভাগ লোক কৃষক-শ্রমিক, তাদের ভেতর থেকে নেতৃত্ব এলেই বোধহয় ভালো হত কিন্তু আমাদের দেশের নেতৃত্ব মুখ্যতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত—মিডল ক্লাশের ভ্যাসিলেটিং থটস্ কি মধ্যবিত্ত-নেতৃত্বের পায়ে বেড়ী জড়াচ্ছে? তবে শুনেছি 'শ্রেণীহীন সমাজ' এর অ্যাডভোকেট লেনিন নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, কার্ল মার্কসও যেন তাই— আমাদের সুভাষচন্দ্রও এখানকার উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই—তাহলে হ্যাণ্ডিক্যাপটা কিসের? কে জানে, রাজনীতির ক্যাচকেচিটা মাথার মধ্যে ঠিকমত ঢোকে না। এই অ-রাজনীতিক আধারটা দুয়ে দুয়ে চারের হিসাব মিলিয়ে সুভাষচন্দ্রের পেছনে পেছনে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে মাত্র, রাজনীতিক-আধার তৈরী হতে দেরী আছে। যা বলছিলাম, বর্তমান নেতারা যদি সময়ের সাথে পা ফেলতে নাই পারেন ভবিষ্যতে, তাহলে সেকেণ্ড সেট অব লীডারস্ নিজেকেই খুঁজতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে— তার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নাই। তবে এখন পর্যন্ত আশা

করছি এই নেতারাই তাদের কেরালার কমরেড বহুদিনের পুরণো আত্মত্যাগী সংগ্রামী নাম্বূদ্রিপাদ, পি. রামমূর্তি, বি. টি. রণদিভে, পি সুন্দরায়ার সমভিব্যাহারে সমগ্র ভারতবর্ষকে পথ দেখাবেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম যা নিজে বুঝেছি তাই লিখে রাখবো। কে জানে 'এই মহাবিশ্বের কভু কিছু হারায় নাকো প্রভু' কবি বললেও নিজের ভয় হয় সদা-পরিবর্তনশীল এই জগতে অনেক কষ্ট করে গড়া আমার এই মনটাই যদি হারিয়ে যায় অথবা যেতে চায় তখন এ লেখা হয়ত আমাকেই সাহায্য করবে পুরণো মনটা ফিরে পেতে অথবা মানসিক পরিবর্তন কেন হয়েছে, কতটা হয়েছে এর একটা যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেতে। এই কথাটা বললাম এই কারণে যে ইতিপূর্বে আমার মনের ভাবধারা বহুবার ভিন্নমুখী রাস্তায় প্রবাহিত হয়েছে। একদিন যাঁকে পয়গম্বর ভেবেছি, পরবর্তী সময়ে তাঁকে আস্তাকুঁড়ে ফেলেছি সেই 'ম্যাজিক অব লজিক' দিয়েই বিচার করে। এরকম ঘটনা বহুবারই ঘটেছে—তাই এই সাবধানতা।

অনেক-শিক্ষিত জনেদের মাঝে আমি চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাই। বিজ্ঞ-সর্বজ্ঞদের বৈঠকখানা-আসরে আমি অজ্ঞ-সর্বঅজ্ঞ পথ হারাই। আমার অনেক বক্তব্যই থাকে কিন্তু ওদের কথাই শুনি, নিজে কিছু বলতে পারি না। এই বই তাই লিখলাম সেইসব লার্নেডদের ধোঁয়াটে কথাবার্তার আনুসার দেবার চেষ্টা করে।

লেখা আমার নেশা নয়, পেশা তো নয়ই। বাংলাদেশে লেখকের অভাব নেই কোনওদিন থাকবেও না—ভবিষ্যতে তাদের একজন হবার না আছে আকাঙ্খা, না ক্ষমতা। তবু জীবনের এই প্রথম বইটি লেখা নিয়ে বেশ কিছুদিন মেতে আছি। অপটু হস্তের ব্যর্থতা সে একান্তই আমার, তবু তা আমায় লজ্জায় ফেলতে চলছে কিনা জানিনা, তবে আমার পক্ষে তা ধরা সম্ভব নয়, আর না ধরতে পারাটাই নিজের

মনের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর। শরৎচন্দ্রের পাঠশালার বন্ধু আধ-পাগলা গহর পরিণত বয়সেও তাই ছিল। বালক গহরেব কবিতা লেখার সখের ইতরবিশেষ কোন সময়েই হয়নি— রামায়ণ রচনা এবং তা ছাপার অক্ষরে বের কর্বার আকাঙ্খা তার প্রথম থেকেই। কৃত্তিবাসের চেয়েও ভালো রামায়ণ রচনার বাসনা ছিল তার। 'মনে আশা, সংসারে একটা নতুন সাড়া পড়িবে। সে লেখাপড়া বেশি করে নাই, পাঠশালায় ও ইস্কুলে সামান্য একটু বাঙলা ও ইংরাজি শিখিয়াছিল মাত্র।' গহর তার কবি হবার বাসনাকে রূপ দিয়ে বছরের পর বছর ধরে বহু কবিতা নিজের খাতার পাতায় ধরে রেখেছিল। তার অসমর্থ হাত শরচৎন্দ্রের অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি--তবু সে সাহিত্যিকের মন পেয়েছিল। শরৎচন্দ্র স্মৃতিচাবণা করেছেন : 'তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোক-চক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন, গন্ধহীন, কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।' গহর ভাগ্যবান, তার অপটুতাকে সামনাসামনি কটাক্ষ কবে কেউ তাকে লজ্জায় ফেলে নি। 'ভারত-নাগবিকে'র নেতাজী-ভাবালুতায় ভরা মনের সাথে হয়ত তার অপটু হাত পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলো না, কিন্তু সেটাই কি সব? তার তেজে-ভরা নিবেদিত-মনটা কি কেউ দেখবে না? ভদ্রসমাজে অপ্রিয় সত্য বলবার চল নাই—তাই ভরসা, ১মবেদক শবৎচন্দ্ররা আজও হয়ত সুভাষচন্দ্র-রচয়িতা এই 'পাগলা-গহরকে' লজ্জায় ফেলবেন না!

রাজনীতিক আমি নই, না আমি রাজনীতি বুঝি। মার্কস পড়িনি, লেনিন জানিনা, স্ট্যালিন বুঝি না—সুভাষচন্দ্র পড়েছিলেন, আমি শুধু তাঁর সঙ্গে পা-পা চলে ওঁদের আঙ্গিনায় এসে পৌছুলাম। পাছে রাজনীতিবিদেরা এনক্রোচ্‌মেণ্ট মনে করেন, তাই বলে রাখি, আমার লেখা 'কুইসলিং' বইটি কিন্তু কোন রাজনীতির বই নয়— এটা দর্শনের

বই। হাসছেন, কেন সুভাষচন্দ্র দার্শনিক ছিলেন না ?[১৫৯] অরাজনীতিক কেউ যদি 'দার্শনিক সুভাষচন্দ্র'[১৬০] সম্বন্ধে লেখেন তবে তা' রাজনীতির বই হয় না। দর্শনের ? তবে এও কানে কানে বলে ফেলি —দর্শন আমি জানিনা। হেগেল পড়িনি, Kant শুনিনি – সুভাষচন্দ্র পড়েছিলেন— বি. এ ফিলোসফি অনার্স পড়বার সময়ই শুধ্ নয়, তার পরেও। মার্কস-লেনিন না জেনেও আমি যাঁর মুখপানে চেয়ে রাজনীতি-ঘেঁষা মন পেলাম, তাঁরেই মনপ্রাণ দিয়ে অনুসরণ করে দার্শনিকও হলাম।

নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত হতে চেয়েছিল, জীবনের ঘাত প্রতিঘাত তাকে 'দর্শন' শেখালো। 'বাংলায় জন্মা' অল্পবুদ্ধি 'ভারত-নাগরিকে'র

১৫৯। সুভাসচন্দ্র দার্শনিক, উল্টোটাও সত্যি— দার্শনিকই রাজনীতিজ্ঞ হয়েছিলেন।

'Heinrich Karl Marx (1818 1883) —German philosopher and socialist...Communism is based on his philosophy.' এটি কোন রাজনীতির বই থেকে লেখা নয়, কার্ল মার্কস সম্পর্কে কোন রাজনীতি-কের লেখা প্রবন্ধ থেকেও গ্রহণ করা নয়, এটা লেখা আছে সাদা-মাটা বই এ. টি. দেবের ডিকশনারীতে। গান্ধী-পরিচিতি দিতে গিয়ে যেখানে লেখা আছে ২৩ লাইন, সেখানে মাত্র ৮ লাইন আছে মার্কস সম্পর্কে, তারই মধ্যেকার ঐ লাইন কটি। যা হোক, দেখা যাচ্ছে, একজন দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ হতে পারেন আবার একজন রাজনীতিকও দার্শনিক হতে পারেন। জেণ্টল্-ম্যান যদি সাংবাদিক হতে পারেন, তবে সাংবাদিক কেন জেণ্টল্‌ম্যান হতে পারবেন না— 'যাযাবরে'র এই সুন্দর প্রশ্নটির উত্তরে নিশ্চয় বলা যায় সাংবা-দিকও ভদ্রলোক হতে পারেন, সৎ সাংবাদিক মাত্রই ভদ্রলোক। 'সৎ' রাজনীতিক দার্শনিকও বটে, উল্টোটাও ঠিক, 'সৎ' দার্শনিকে'রই একতিয়ার আছে সৎ রাজনীতিবিদ হবার। যদিও নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক, তবু ইনটারেস্টিং লেগেছে আমার কাছে, তাই বলি— আশুতোষ দেব কিন্তু দীর্ঘ ২৩ লাইনের মধ্যে কোথাও এম. কে. গান্ধীকে দার্শনিক বলে উল্লেখ করেন নি।

১৬০। 'রাজনীতি আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয় ; আমি কেবল ঘটনাচক্রে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে এসে পড়েছি'। সুভাষচন্দ্র ১৫. ১০. ২৭।

'কুইস্‌লিং' কেতাবটা হে শিক্ষিত পাঠক, আপনার সাজানো গোছানো লাইব্রেরীতে না রেখে আপনার কাঁচা বয়সী ছেলেমেয়ে এইচ. এস, আই.এ, বি. এ. ক্লাশের ফিলোসফির স্টুডেন্টদের অগোছালো টেবলের উপর ফেলে রাখবেন। আপনার শিক্ষিত-পরিণত-পরিপক্ক মনকে ধাক্কা মারতে পারি ক্ষমতা কই? একবার কোনরকমে পড়া শেষ করে অথবা না পড়েই রাজনীতির মোটা মোটা শক্ত শক্ত বইয়ের মধ্যে সারাজীবন ধরে হয়ত ফেলেই রাখবেন ঘর সাজিয়ে আর কোনদিনও স্পর্শমাত্র না করে, তার চেয়ে বরংচ কাঁচা-অপরিণত হবু-দার্শনিক মনের কাছেই থাক এ কেতাবের আবেদন।[১৬১]

তাই বলছিলাম, দর্শন লিখলাম, সুভাষচন্দ্র-অনুসরণ করে হে পাঠক, আমি দর্শন লিখলাম।

বিপ্লব জিন্দাবাদ।

নেতাজী জিন্দাবাদ।

মার্কস্ জিন্দাবাদ। লেনিন জিন্দাবাদ। মাও-সে-তুঙ জিন্দাবাদ।

নেতাজী জিন্দাবাদ।

বিপ্লব জিন্দাবাদ।

লাল সেলাম।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ **বঙ্গজ ভারত-নাগরিক**

(প্রথম পর্বের 'লেখকের কথা' সমাপ্ত)

১৬১। দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ব সবই এর মধ্যে থাকলো। আগ্রহশীল মন যাদের তারা সব কিছুই পাবেন এতে। শিক্ষিত, নয়া শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত অথবা শিক্ষার আগ্রহই আছে হয়ত হয়নি, তাদের মনের তন্ত্রীতেও আঘাত হানবার চেষ্টা থাকলো এতে।

দ্বিতীয় পর্ব

[দ্রষ্টব্য : 'লেখকের কথা' অবশ্যই পড়বেন আরো একবার আগে]

লেখকের কথা

একটি বইয়ের মধ্যে ছুবার 'লেখকের কথা' শোনাতে গেলে তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে।

'কুইস্‌লিং' বইটি দুটি পর্বে বিভক্ত—প্রথম পর্ব 'কুইস্‌লিং'টি জানুয়ারী মাসে লিখি, নেতাজীর জন্মদিবসে প্রকাশ কর্বার আকাঙ্খা নিয়ে। কিন্তু পারিবারিক একটি বিশেষ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন হেতু দৃষ্টি সেদিকেই ফেরাতে হয়। ফলে বইটা বের হয় না। পরবর্তী কয়েক মাসেও নানা প্রতিবন্ধকতা আসে। জিনিসটা আরো পিছিয়ে যায়।

বই কখনও লিখি নি, স্বভাবতঃই ভয় ছিল। কাগজপত্রের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায আতঙ্ক বাড়ে। ২৩শে জানুয়ারীবের কর্তে না পারায় ঠিক করতে পারছিলাম না কি করবো।

অবশেষে মনঃস্থির কর্লাম 'কুইস্‌লিং' বইটা বের করবো—সুভাষ-জয়ন্তীর তারিখটা রেখেই। দেশের অবস্থা দ্রুত পালটাচ্ছে-প্রতিদিনই মানুষের ধারণা শোধরাচ্ছে—২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ পর্যন্ত আমার যা' ধারণা ছিল, সেটাকে অক্ষত অবস্থাতেই রাখলাম। সমস্যা দাঁড়িয়ে গেলো সেখানটাতেই—বইটা বের হতে হতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের[১৬৩] আগে হবে মনে হচ্ছে না, অথচ লেখা হয়েছে জানুয়ারীতে।[১৬৪] অতএব

১৬৩। ডিসেম্বর ১৯৭৪ এর আগে হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই, জানুয়ারী, ১৯৭৫ এও চলে যেতে পারে।

১৬৪। প্রথম পর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে লেখার নীচে ফুটনোটস্‌ এর মধ্যে বেশ কয়েকটি অবশ্য জানুয়ারী, ১৯৭৪ এর পরে সংযোজিত।

দ্বিতীয় পর্বের ধারণাটা গজাতে হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সেকেণ্ড পার্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্যের প্রশ্নটা এসেই পড়লো।

নিষ্কর্মা লোক আমি গত কবছরে গোটা কয়েক প্রবন্ধ লিখেছিলাম মনের আবেগে। প্রথমে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে লিখলেও পরবর্তী সময়ে আকাঙ্খা জন্মাতে দেখি মনে—'সত্যযুগ' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠিয়েও দি। 'সত্যযুগ' কর্তৃপক্ষ কখানা ছাপান—তার মধ্যে 'যতীন দাস স্মরণে', 'নেতাজী স্মরণ, কি সে কারণ?' 'হেমন্ত বসুর আত্মা কেঁদে কেঁদে ফেরে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'কুইস্লিং' এর দ্বিতীয় পর্ব বস্তুতঃ বিভিন্ন সময়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন মাত্র। সবগুলো লেখাই ইনডিপেন্ডেন্ট, বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে। তবু মূল সুরটার মধ্যে একটা সমন্বয়, পৃষ্ঠাগুলো পর পর উলটিয়ে গেলে, দৃষ্টি গোচর হবে।

১৯৭১ এর নির্বাচনের পরে মার্চ, এপ্রিলে লিখেছিলাম 'দি হিপোক্রিটস্' এবং 'দ্রৌপদীর গোঁসা'। প্রবন্ধ দুটি পড়বার সময় মনটাকে যতটা সম্ভব সেই সময়ে নিয়ে যেতে হবে, প্রবন্ধের নীচে লেখা ফুটনোটস্ তাতে সাহায্য করবে। ১৯৭২ এর ইলেকশন-প্রাক্কালে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী '৭২এ লিখি 'সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ।' 'মুজিবর নিখোঁজ' 'পূর্বদিগন্তে রক্তিমাভা', 'বাঙ্গালী যাহা আজ ভাবে ভারত তাহা কাল ভাবিবে' প্রভৃতি—সে লেখাগুলোও এখানে সন্নিবেশিত হল, পড়তে হবে বায়াত্তুরের প্রাক-নির্বাচনী মন নিয়ে। 'যতীন দাস' সম্পর্কে লিখেছিলাম '৭২ এর শেষে, এ ছাড়া অনেক লেখাই '৭৩ '৭৪ এ। কিছুদিন আগে একটা লেখার মুসাবিদা করেছিলাম: 'আমার এই ভুতুরে শহরে টেলিভিশন আসছে, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রনিকস টেলিকমিউনিকেশন ইনজিনিয়াররা সুদিনের আশায় স্বপ্ন গাঁথো।'

দ্বিতীয় পর্বে সংকলিত প্রবন্ধ কটি ছাড়া আরও অনেক প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম। তার মধ্যে 'জোয়ান অব আর্ক,' 'অরূপের মধ্যে রূপের সন্ধান' 'বাঙালী একটি রকবাজ জাতি !,' 'বাঙালী একটি অসভ্য ও বর্বর জাতি !,' 'রামকৃষ্ণদেব বর্জন', 'জ্যোতির্ময় বসু জিন্দাবাদ' 'শশাঙ্ক শেখর সান্যাল প্রশস্তি', 'সঃ উবাচ', 'খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত ও অবৈধ চাকরীগুলি', 'একই অঙ্গে কত রূপ', 'মীরজাফর সম্পর্কীয়', 'বিষ্ঠা ভক্ষণ', 'দেশটার নাম ভারতবর্ষ, প্রদেশটার নাম পশ্চিমবঙ্গ, আর মানুষগুলো বাঙ্গালী' (এটি একটি ৪৫ পৃষ্ঠার বড় প্রবন্ধ, জোছন দস্তিদারের 'পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ দেখে এসে সেইরাতেই একটি লেখা, মেট্রোতে রিলিজের দ্বিতীয় দিনে দেখা মৃণাল সেনের, 'কলকাতা-৭১' এর অ্যানলাইসিস্, 'যুক্তফ্রন্ট' এবং 'শিক্ষা' সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি প্রবন্ধ। ১৯৭৪ এর এপ্রিলে লেখা 'বিপ্লবী দেখেছেন ?,' লেখাটিও উল্লেখযোগ্য।

বলতে ভুলেছি, এ ছাড়াও একটি ভালো প্রবন্ধ লিখেছিলাম : "বেনেফিট অব ডাউট।" '৬৯ এর তৃতীয় চতুর্থ মাসে লাল শালুতে দেশটা ভরে গেলো, শেষের দিকে শালুর রং ফ্যাকাশে হল, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম আর 'প্রমোদ দাশগুপ্ত জ্যোতি বসু'র বিচারকদের কথার জের টেনে লিখলাম : জ্যোতি বসু জবাব দাও।

স্থানাভাবে এই প্রবন্ধগুলোর কোনটাই এ বইয়ে নিতে পারলাম না।

প্রবন্ধগুলো আলাদা আলাদা সময়ে আলাদা আলাদা ভাবে লেখা, ফলে এক কথার রিপিটিশন অনেক বারই হয়েছে। দু তিনটি কথা প্রায়ই এসে পড়েছে : যেমন অজয় মুখার্জী-প্রফুল্ল ঘোষের কথা, সি. পি. আই এর কথা বা বাঙ্গালী-মধ্যবিত্ত নিয়ে কথা। এতে পাঠকের মনে আসতে পারে : হয়ত মুখার্জী-ঘোষেদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে, তার উত্তরে বলবো সেরকম কিছু থাকবার

কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁদের ও আমার আবর্তনের কক্ষপথ এক নয়-তাঁরা রাজনীতিক, আমি তা নই, হবার সম্ভাবনা নেই, সময় ও আকাঙ্খা দুয়েরই অভাব। পাঠকের মনে দ্বিতীয় যে ভাব আসতে পারে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বস্তুতঃ সেটার উপর আমার দ্বিতীয় পর্বের লেখা-গুলোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কথাটা একটু খুলেই বলি। যেহেতু লেখাগুলো প্রত্যেকটি স্বাধীন, একই কথা বারে বারে এসেছে, তা' এটা পাঠকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি হয়ত ভাবতে পারেন ফ্যানানো আমার স্বভাব, এরকম না ফ্যানালেও চলতো—প্রবন্ধগুলো কাটছাঁট করে অনেক ছোট করা যেতো, অনর্থক বড় করে বইটার পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়েছে। এর উত্তর: (১) এই প্রবন্ধ-গুলো এই বইয়ে সন্নিবেশিত কর্বার আকাঙ্খা নিয়ে লেখা নয়—বস্তুতঃ অত্যন্ত হালে এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে এসেছে। (২) চেষ্টা করলে কিছু কিছু কাটছাঁট করা যেতো কিন্তু লেখার স্পিরিটটাকে অক্ষত রাখবার জন্য বিয়োগের সাথে সাথে কিছু কিছু সংযোজনও প্রয়োজন হত—এ পন্থা দুই কারণে গ্রহণ করা সম্ভব হল না: (ক) বইটা বের কর্তে প্রতিবন্ধকতা এত আসছে বারে বারে আর এত দেরী হয়ে গিয়েছে, যে রিভিশন কর্বার মত সময় ও আবশ্যকীয় মনোযোগ দেওয়া যাচ্ছে না; (খ) যদি তা' করাই হোত, তবে তাতে ও একটা বিরাট অসঙ্গতি এসে পড়ছে, বাদ দেওয়াতে কোন অসুবিধা নাই কতকগুলি লাইন পেন-ত্রু করলেই হল, কিন্তু সঙ্গতি আনতে মাঝে মাঝে নতুন লাইন ইনসারশন আবশ্যিক। ১৯৭২ এর প্রাক-ইলেকশন মনের অবস্থা আর ১৯৭৪ এর মনের অবস্থা এক নয়—পশ্চিমবঙ্গবাসীদেব এই দুই বছরে অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে, ফলে নতুন লাইন সংযো-জনের সময় আজকের মনের ভাবের প্রতিফলন পুরণো দিনের লেখাগুলোর মধ্যে চলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, নিয়মানুযায়ী এটা করা ঠিক নয়। ডেট থাকলো ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ অথচ লাইন সংযোগ

হচ্ছে জুন, ১৯৭৪এ তা কি হয়? অতএব, কোন দিক থেকেই কিছু করা গেল না।

ওপরে রিপিটেশন-ওয়ার্কটা কাটছাঁট কেন করা গেল না সেটা বললাম। ওটাকে নিগেটিভ অ্যাপ্রোচ নাম দিয়ে পজিটিভ অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ রাখাটা উচিত, তাই রাখলাম এই যুক্তির স্বপক্ষে এখন একটু ওকালতি করবো। এটাতেও দুটোই পয়েন্ট আমার: (ক) কারো জ্বর হলে ডাক্তার আসেন, রোগীর জিভ দেখেন, জ্বর পড়েন নাড়ী টেপেন—ওষুধ দেন জ্বর সারার, সাথে সাথে কোষ্ঠ পরিস্কারেরও। টাইফয়েড হলে রোগীর ঔষধ পালটায় কিন্তু দাস্ত যেন ঠিকমত হয় এর দিকে এবারেও লক্ষ্য ডাক্তারের। থাইসীসের ও যত ঔষধই পাতা-ভরে প্রেসক্রাইব করুন আর পথ্যের নাম লিখুন, বাওয়েলস্ জনিত অস্বাচ্ছন্দ্য রোগীর যেন না থাকে এবারেও তার দিকে নজর এড়ায়না, অতএব সেই একই একজিটের কথা—প্রাতঃকালীন ১নং ২নং ঠিক হচ্ছে তো, নাহলে তার ব্যবস্থা। মনে করুন রোগী একই, ডাক্তারও সেই একটাই আর আপনি রোগীর একমাত্র ফ্রেণ্ড ইন নীড্ অতএব সব কবারই অসুখের সময় হাজির। প্রতিবারেই সেই কোষ্ঠ কাঠিন্যের গল্প শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে কি ডাক্তার পালটাবেন লোকটা কিছু জানেন না ভেবে? বোধহয় না, কেন না ডাক্তার তো ঠিকই করেছেন, প্রত্যেকবারই ইনডিপেনডেন্ট অ্যাপ্রোচ এবং প্রতিবারই সেই কমন আইটেম: কোষ্ঠ পরিস্কার। আমারও ঠিক তাই, প্রতিবারই সেই অজয় মুখার্জী আর প্রফুল্ল ঘোষ অথবা অহম্ বঙ্গজঃ মানে বাঙালী মধ্যবিত্তদের নিয়ে নাড়াচাড়া করা। অজয় মুখার্জীর সৌম্যমূর্তিই একদিন আমাদের মনে বিভ্রান্তি এনেছে, ফলে অজয়-প্রফুল্লের বিচার নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে। ভারতের রাজনীতি বাংলার রাজনীতির যে কোন আইটেম নিয়েই ডিল করি তাই ঘুরে ফিরে হাত ধরাধরি করে গুরু-শিষ্যকে একবার ঘোরাতেই হবে—কোষ্ঠ পরিস্কারের ট্যাবলেট্‌টা যে কমন। (খ) এবার যেটি বলবো সে

পয়েণ্টটির গুরুত্ব খুব বেশী। রাইখস্টাগে আগুন কম্যুনিষ্টরা লাগায়নি, লাগিয়েছিল হিটলার-গোয়েবলসের অনুচরেরা। হিটলার বললেন কমিউনিষ্টরা লাগিয়েছে—হাজারো লোক, হাজারো পত্র-পত্রিকা অমনি টেপ রেকর্ডিং চালাতে শুরু করলো, স্বরের তফাৎ, তফাৎ সুরেরও, বয়ান কিন্তু একটাই—ঐ ওরা, ওরা কমিউনিষ্টরা আগুন লাগিয়েছে। বিজ্ঞজনেরা তো প্রোভার্ব সাজিয়েই খালাস: যা কিছু রটে, তা কিছু বটে। কোথায় তা? রটনা যেখানে ১০০% মিথ্যা, ঘটনা তো সেখানে জিরো পারসেণ্ট। যা কিছু রটে, তার বিন্দুমাত্র যে 'বটে' নয় এটা কমিউনিষ্টরা পরবর্তী সময়ে প্রমাণ করতে পেরেছিল। পশ্চিম-বঙ্গের হেমন্ত বসুকে নিয়ে রটনা কি আসল ঘটনার ধার পাশ দিয়ে গিয়েছে? তবু আমার বাংলার শিক্ষক 'রটনা আর ঘটনার' প্রবাদ-টিকে নির্বিবাদে আমার ছেলে মেয়েকেও শেখাতে বসবেন! ভালো মানুষ শিক্ষক মশায়ের দোষ নেই, তাঁর সরলবিশ্বাসী ছাত্রটি যে ইতিমধ্যে সন্দেহবাতিকে ভুগতে সুরু করেছে তা তিনি কেমন করে জানবেন? তিনি স্বাভাবিক লোক তাই সেভাবেই সব কিছু ভাবেন, কিন্তু পৃথিবীটা যে এখন একটা বিরাট অস্বাভাবিকতার মধ্যে দিয়ে চলেছে! দস্যু-দানব চরম অস্বাভাবিক হিটলার মিথ্যা কথা বলতেন, তার অনুগামী গোয়েবলস্, গোয়েরিংকেও শিখিয়ে ছিলেন: মিথ্যা কথা যখন বলবে তখন এত বড় মিথ্যা বলবে যে কেউ সত্যিকার জিনিস একদম আঁচ করতে পারবে না।[১৬৫] ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নায়করাও সেই থিয়োরী নিয়েই চলেন কিন্তু মিথ্যার সমর্থনে হিটলারের ভাষ্যটা যেমন

১৬৫। পার্শ্বচরদের শিক্ষা দিয়েছিলেন হের হিটলার: 'Never tell a little lie; tell a lie so big that people cannot simply beliave that you are lying!' বাকচাতুর্যটাই আসল—রসাল ও উপাদেয় পরিবেশনার ফলে মিথ্যাবাক্য দ্বারা মানুষের বিশ্বাসভাজন ও প্রশংসাভাজন অহরহই হতে দেখা যায় লোক বিশেষকে, শুধু বৈষ্ণবী হাসি ও সদালাপের আবরণটা চাই। ক্ষেত্রমত জুতসই কথা বলার টেকনিকটাই তো মূল কথা মনের ভেতরে যে গরলই থাক! কাজ হয়, তাতে বিরাট কাজ হয়।

আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে. তা এখানকার নায়কদের ঘুপচিতে ঘাপচিতে সাঙ্গোপাঙ্গদের দেওয়া ডাইরেকশনস্ আমাদের কানে অনেক সময়ই পৌঁছয় না; তবে অন্যায় করে তার সমর্থনে, প্রতিবাদ-কারীদের রক্ত চক্ষু দেখিযে অক্লেশে এরা বলেন জানি : ব্র্যাটাণ্ট লাইজ।

ঐ কথাটা কিন্তু ঠিক—মিথ্যা কথা বারে বারে বলতে বলতে অথবা শুনতে শুনতে সত্যির রূপ ধারণ করে। স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমানেদের এবিষয়ে সাকসেস্ ওয়াণ্ডারফুল। অনর্গল মিথ্যা কথা বলছেন তবে সব সময়ই সচেতন এরকম লোক একই মিথ্যা কথা সব জায়গায় বলেন ফলে সেটা সত্যের রূপ নেয়। আর কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ পেলে তো কথাই নাই— নিজে বোম্ ভোলানাথ, বাবাজী সেজে চোখ বুঁজে বসে থাকলেই হল— শিষ্য শিষ্যাদের চোখটা শুধু টিপে দেওয়ার অপেক্ষামাত্র। তারা যা' কর্বার সব করে দেবে— একটু বেশীই করে দেবে।

অরগ্যান অনেক, ফলে মিথ্যা প্রচারটা এমন গগন স্পর্শী হয় যে হিটলারকেও হার মানায়। একই মিথ্যা কথা অল. ইণ্ডিয়া. রেডিয়ো থেকে বেরোয় কম্পনযুক্ত স্বরে, বের হয় 'আনন্দবাজার' থেকে তবে ভিন্ন সুরে, 'যুগান্তর', 'অমৃত', 'মাসিক বসুমতী', 'জনবাণী' আর 'যুগের ডাক' সবেরই পথ ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক— এমন মিথ্যা কথা বলবে যা' কেউ আঁচ না করতে পারে, বেশী জনে বলবে, কারণে অকারণে বারে বারে বলবে। নিজে বলবে, বাড়ীর লোকজনকে দিয়ে বলাবে, ঝি-চাকরকে দিয়ে বলাবে আবার পথ দিয়ে যে মুটেটা যাচ্ছে তাকে দিয়েও কাজ সারতে পারলে ক্ষতি কি, মোটটা বহন না করিয়েও পয়সা দিলে কি সে একটু এগিয়ে ঐ বাড়ীতে গিয়ে বলে আসবে না 'অশ্বত্থামা হত'? অতএব দেখা যাচ্ছে একই মিথ্যা বিভিন্ন মুখ থেকে বিভিন্ন ভাষায় বেরিয়ে আপনার আমার কাছে

আসছে। আনন্দবাজার, যুগান্তর ভারচুয়ালি একই কথা বলে তবে একই ভাষায় নয়, একই দিনে নয়। ভূতপূর্ব 'যুগান্তর' সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষের সম্পাদনায় 'অমৃত' মানুষকে গরলই পরিবেশন করে, 'যুগের ডাক' কখনো যুগোপযোগী মনুষ্যোপযোগী কথাবার্তা বলে না, 'জনবাণী' কোন সময়েই জনগণের বাণী নয়, না জনগণের জন্য বাণী। ভিন্ন ভিন্ন মুখ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় শোনা যাওয়ায় একই জিনিষ হলেও একঘেঁয়েমিত্বটা কানে ধরা পড়ে না আপনার-আমার। ববংচ ঐ মিথ্যা গুলো মনে দাগ কেটে যায়, সত্যের রূপ ধারণ করে।

মুষ্টিমেয় লোকই আছে সমাজে যারা ট্রু-লেফটিষ্ট, পত্র পত্রিকাও সীমাবদ্ধ। ফলে সত্য কথা বলবার লোকও যেমন কম, সত্য প্রচারের মিডিয়ামও তেমনি কড়ে গোনা যায়। ফলে একই লোককে বারে বারে একই মিডিয়ামের মধ্যে একই কথা বলতে হয়। একই কথা একই মিডিয়ামে হলেও টাইমিং যদি আলাদা হয় তবে একঘেঁয়েমী ভাবটা কিঞ্চিৎ কম আসে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কেসটা এমনই যে সব শব্দের আগেই 'একই' আছে— বক্তা একটিই, কথা একই, মিডিয়াম একই এবং সময়টাও একই— অতএব মনোটনাস্ হবেই, আপনি বোরিং মনে করলে আমার প্রথমে চুপ করে থাকা ছাড়া গতি কি? তবে এত কমে রণে ভঙ্গ তো দেওয়া যায় না— পারসিভিয়ারেন্স বলে কথা আছে না! আমি বলবো এই যে মিথ্যা কথা যত সহজে বিশ্বাসযোগ্য হয়, সত্য তত সহজে নয়। মিথ্যার মাহাত্ম্য এই যে রাতদিন শুনতে শুনতে সেটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়, যুগান্তর আনন্দবাজারের পাঠক যদি দুদিন গণশক্তি, দেশহিতৈষী, সত্যযুগ পড়েন তবে তার মাথা ধরবে— শেষোক্তদের কোন কথাই মনের মধ্যে ঢুকতে চাইবে না, আর ঢোকাবার চেষ্টা করতে গেলেই মাথা ঘোরা— এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা। 'দুদিনের বৈরাগী হয়ে ভাতকে অন্ন

বলা' সুরু করেছি তো আমি নিজেই— 'সত্যযুগ' পত্রিকার বয়স তো মাত্র ১ বছর ৫ মাস. চিরকাল তো যুগান্তর, অমৃত বাজার, আনন্দ-বাজারই করে এলাম— 'গণশক্তি' পড়ছি সেও তা অল্প ক'বছর মাত্র। অতএব যা বলছিলাম— সত্য কথা বারে বারে শুনলে তবেই মাথায় ঢুকবে, বিরক্তিকর হলেও একই কথা অনেকবার শুনলে তার রেশ কিছু থেকেই যাবে।

এটা বোঝা দরকার যে ওরা অনেক বলে, নানাভাবে বলে। ওদের কথা কথার কথা, আর আমাদের কথা হৃদয়ের ব্যথা। ব্যথা যেখানে, ভাষা সেখানে অনুপস্থিত। মৌন মূক-বুকই তো ব্যথা বহন করে। কথা বলতে পারিনা, অনেক কথ অনুক্ত থাকলো। যা বললাম তার চেয়ে অনেক বেশী বলবার ছিল।

ওরা যা বলে তা বলে, আমার কথা শুনুন পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে।

৮ই জুন, ১৯৭৪ বঙ্গজ ভারত নাগরিক

THE HYPOCRITES[১৬৬]

Last page of the 'Statesman' dated 23 3 71 gives a news ·· 'Dhavan's assurance to Forward Bloc leaders ·· Dr. Kanai Bhattacharjee, Bhakti Bhusan Mondal and Mr. Nirmal Bose··· Police had failed to arrest those responsible for his (Shri Hemanta Bose's) murder'

Calcuttans have seen and the rest of Bengal and India have heard of the funeral procession through news papers condemning murderers (slogan-shame, shame, CPM) and also the meeting at Saheed Minar where leaders of three Congresses (two Congresses and Bangla Congress) and their counter-parts (Forward Bloc, CPI, S. S. P. etc) unequivocally condemned CPI(M) for murdering Shri Hemanta Bose. While persons 'responsible for murder' could not be arrested even after a month of the occurance, the verdict of the leaders of all the above parties were available immediately after the murder (the next day i e. 21 2. 71 we noticed in the news papers) understandably to achieve a heinous motive. Election is over and the real thing

১৬৬। ২. ৪. ৭১এ লেখা, ইলেকশন শেষ হবার পর পরই। এই লেখাটি ষ্টেটস্‌ম্যান ও অমৃত বাজার পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, এটি ছাপা হয়নি।

comes out of the hypocrites now. They were of the opinion before the election that CP(M) were the assassins and now they accuse the Governor that the murderers are not yet arrested even today. Hypocricy has a limit and those so-called renowned leaders have far exceeded it

Them urder and its allied publicity was a planned thing of the party in power to undermine CP(M) to derive gain in election It reminds me a very nice editorial by the 'Aftab' a couple of years back on Kashmir issue which read as "The main trouble is that the democracy is talked about by the ruling party and their yes-men. If any body else talks about it he is painted black and dubbed an enemy of the country.' My comment, I believe, would be superfluous here.

Shri Hemanta Bose would not come to tell us about the murderers, but his leader (the founder of Forward Bloc) is witness to everything. Let us see how and when our Netaji comes and punishes his hypocrite-followers (An earnest desire and a wishful thinking).

1971 election is not the last election.

The Hypocrite hater.

দ্রৌপদীর গোঁসা[১৬৭]

১৪ই মার্চ ১৯৭১ এ বাংলাদেশে যে ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আমরা আকস্মিকভাবে এক দ্রৌপদীর সন্ধান পাইয়াছি। মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বামী ছিলেন পঞ্চ-পাণ্ডব— কলি যুগের এই

১৬৭। প্রবন্ধটি লিখি ২৫-৩-৭১ এ হেমন্ত বসু হত্যা সম্বলিত ইলেকশন হবার অব্যবহিত পরে। সেই নির্বাচনের ফলাফল হয়েছিল এরূপ : সি. পি. এম ১১৩, কংগ্রেস ১০৫, আর. এস. পি ৭, এস. ইউ. সি ৭. মুসলীম লীগ ৭, বাংলা কংগ্রেস ৩, ফরোয়ার্ড ব্লক ৩, এস. এস. পি ১, ওয়াকার্স পার্টি ১, আর. সি. পি. আই ১, এবং ব্রেজনেভ-কোসিগিন সমর্থিত সি. পি. আই ১৩ [আনলাকি থারটিন, অবশ্য আমাদের পক্ষে আনলাকি হলেও তাদের লাক সে সময় থেকেই আরো বেশী খোলে— সি পি এম এর বিপক্ষে অ-বাম ফ্রণ্ট করায় কংগ্রেসের আস্থা এঁদের উপর বাড়ে এবং তারই ফলশ্রুতি ১৯৭২এ কংগ্রেসের সঙ্গে ডাইরেকট নির্বাচনী ফ্রণ্ট, বেশ কয়েক বছরের ঘোমটা খুলে। সাকসেসও ওয়াণ্ডারফুল — শুধু সে সময় অসামান্য জয়লাভই (এক শিবপদ ভট্টাচার্যই হারিয়েছিলেন (?) জ্যোতি বসুকে ৩৯০০০ ভোটে— অসামান্য নয়? নয়, এর পরেও (১৯৭৪এ) পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ও চেয়ারম্যানের 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধি লাভের বীজটাও হয়ত সেদিনই অঙ্কুরিত হয়েছিল ভালোভাবে. যদিও সূচনা অনেক কাল আগে থেকেই।]

উল্লেখ্য : বাংলা কংগ্রেস ১৯৬৯ এর নির্বাচনে সীট পেয়েছিল ৩৩টি আর পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ এর (অ) নির্বাচনে সি পি. আই তর তর করে একেবারে ৩৫এ উঠেছে. ৪০টি না ৪২টি সীটে দাঁড়িয়ে। প্রবন্ধটি রিভাইজ করি এপ্রিল, ১৯৭১ এর মাঝামাঝি।

আমার 'দ্রৌপদীর গোঁসা'র এবং এর পরের আরো কয়েকটি প্রবন্ধে যেমন 'সুভাষবাদ গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ' 'মুজিবর নিখোঁজ' প্রভৃতির ভাষা ও 'কুইসলিং' প্রথম পর্বের ভাষা ও দ্বিতীয় পর্বের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির ভাষা এক দুঃখ নয়। '৭১-৭২ এ লেখা ভাষা থেকে পরবর্তী সময়ের লেখার ভাষায় তফাৎ আছে, পড়লেই ধরা যায়।

দ্রৌপদীরও স্বামী পাঁচজনই তবে পঞ্চ-কৌরব— এই যা তফাৎ। দ্বাপরের দ্রৌপদী ছিলেন সতী, আর কলির দ্রৌপদীর মত ন্যাকা অসতীর তুলনা মেলা ভার।

'গণ সংহতি সংঘ' নামে একটী বামপন্থী মোর্চা (বাংলাদেশে সবাই বাম, দক্ষিণপন্থী শুধু কাগজের পাতায় ও নেতাদের মুখে) আছে— বাংলা কংগ্রেস ও এস এস. পির মিলনে এর সৃষ্টি। ঘটনাটা অদ্ভুত (কাকতালীয় বললে আমি আপত্তি করবো) —সারা বাংলাদেশে মাত্র ছ'জন (৫ + ১) গণ সংহতি-সংঘী বীর দাঁড়াইয়া আছে (৪ জনই অবশ্য তমলুকি বাবু) —শ' দেড়শ ধরাশায়ী লোকের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে যখন আছে, তখন এরা বীর বই কি ! 'গণ সংহতি সংঘে'র সংসার পঞ্চবীর ও দ্রৌপদীর-স্ত্রীর সমন্বয়ে হিসাব কবে গঠন করেছেন বাংলাদেশের অঙ্ক জানা, মহাভারত-পড়া জনগণ। জিনিসটা বোঝবার, জিনিসটা উপলব্ধি কর্বার। আমি শুধু ভার নিয়েছি 'জনগণে'র সঙ্গে এই পরিবারটির পরিচয় করিযে দেবার।

পঞ্চ-কৌরব— সুশীল[১৬৮] (দুঃশাসন), নদের নিমাই কাশীকান্ত[১৬৯] (দুর্যোধন-বীর, ইলেকশানের আগে যার প্রতি সভাতেই পটকা ফাটিয়াছে) আর তিনজন বাংলা কংগ্রেসী-কৌরবের সুন্দরী (গেরুয়া-ধারীর সৌন্দর্য পাগল বাংলাদেশ !) অজয় মুখার্জী (আমি বলি 'অথর্ব' মুখার্জী – গত দেড বছর এই অথর্বকে লইয়াই আই. এ, বি. এ পাশ বা না পাশ বাঙ্গালীরা অথর্বের রাজনীতিতে মাতিয়াছেন) নাম্নী দ্রৌপদী স্ত্রী।

হ্যাঁ, আমি দ্রৌপদীই বলছি এবং বলবো (১৪.৩.৭১ যখন সেদিকেই আঙ্গুল দেখাচ্ছে)। যখন যে পাত্রে থাকেন, সে পাত্রেব

১৬৮। সুশীল ধাড়া।

১৬৯। কাশীকান্ত মৈত্র।

আকার ধারণ করেন তিনি। যখন যার কাছে থাকেন, তার ভাষা এঁর মুখের বুলি হয়। সুশীল-দুঃশাসনের স্ত্রী (আগষ্ট, ১৯৬৯ থেকে লোকচক্ষুর সামনে, তার আগে আড়ালে), বিপ্লবী কাশীকান্ত ('মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে—দাম ১২ টাকা'[১৭০] এর প্রণেতা বিপ্ল ী বই কি) এরও ঘরণী, আর ত্রয়ী— বাঃ কং[১৭১] বীর-গণের সংঙ্গেও এক ছাদের তলায়ই অবস্থান তাঁর।

১৯৭১ মার্চের ইতিহাস যাহাকে দ্রৌপদীরূপে আমাদের সামনে আনিয়াছে, তাহার পূর্বের ইতিহাসও মিলাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

দ্রৌপদীর ঘরে এক পুরুষ থাকা কালে সদা চঞ্চল মনটি বাইরের অন্য পুরুষের পদধ্বনিতে আনমনা হয়, বহির্মুখী হয়, সুযোগ বুঝিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাইরে যান। আমাদেব এই দ্রৌপদীর ইতিহাসও তাই বলে।

এক যুগেরও বেশী অতুল্যের[১৭২] ঘর তিনি করিয়াছেন। বহু মান-অভিমানের পালার মধ্যে প্রেম জমিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পুরনো ঘর (পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ) ভাঙ্গিল তাঁর সদাচঞ্চল মনের সুযোগ সন্ধানী পরপুরুষেব দ্বারা। তাই মিঃ এম. কে. গান্ধীবাদী নেতা কংগ্রেস ছাড়িলেন। হল যুক্তফ্রন্ট— স্বামী

১৭০। ১৯৭২এ হাতেব মুঠোয় পাওয়া খাদ্যমন্ত্রীত্ব ১৯৭৩এ আঙুল গুলোর ফাঁক দিয়ে গলে যায়। কিন্তু তাব পবেও অভিজ্ঞ কূটনীতিক পশ্চিমবঙ্গবাসীকে 'রাজনীতি বিপ্লব আর কূটনীতি'র গল্প শোনাবার বাসনা প্রকাশ করেন। ১৯৭৪ এ বহুদিন বিজ্ঞাপন দেখেছি নানান পত্রিকায় 'রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি' নামক কুড়ি টাকা মূল্যের বই প্রকাশের খবর দিয়ে। এতদিনে বেরিয়ে থাকবে হয়তো জ্ঞানসম্ভার সম্বলিত সে বইটি।

১৭১। বাংলা কংগ্রেসী।

১৭২। অতুল্য ঘোষ।

শ্রীযুত জ্যোতি বসু (হাসবেন না— যুক্তফ্রণ্টের সবকাজের জন্যই যখন 'জ্যোতি বোস জবাব দাও' তখন স্বামী তো তিনিই)। ১৯৬৭ সনে জ্যোতি বসু-স্বামীর প্রতি তাঁর মনে প্রথম চিড় ধরালো কেমিষ্ট্রির ডক্টরেট পেরফুল্ল ঘোষ (যিনি বিজ্ঞানীর মন নিয়ে রাজনীতি করতেন ! হে ! বিজ্ঞানী, কোথা তুমি ?) ফলে এক রাত্রির জন্য (২রা অক্টোবর,[১৭৩] ১৯৬৭) স্বামী হলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। বাইরের এত প্রলোভন সত্বেও ১৯৬৯ সনে আবার শ্রীজ্যোতি বসুই স্বামী (শক্ত লোক তো, তাই তাঁর প্রতি অনুরাগটা গিয়েও যাচ্ছিল না)। অবশ্য সুশীল-দুঃশাসনও স্বামী, আমাদের চোখের সামনে যদিও ধরা দিলেন আগষ্ট, ১৯৬৯[১৭৪] থেকে। তারপর স্বামী শ্রীজ্যোতি বসুর প্রতি মান-অভিমানের কত রঙ্গই দেখিলাম। কখনও (১.১২.৬৯ থেকে একমাস) তিনি 'তোমার ভাত খাব না' বলে উপোস করে স্বামীর দাওয়ায়(কার্জন পার্কে) গড়াগড়ি যান (সেই দুঃসময়টা অতি কষ্টে তনুরক্ষা হইয়াছিল সুশীল-স্বামী পাশে ছিল বলিয়া, মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীও নাই যে ছাগলের দুধটা যোগান দিবেন), কখনও 'তোমার সংসারে আসিয়া কি পাইলাম— আমি ঠুঁটো জগন্নাথ হইয়া থাকিলাম' ইত্যাদি বিলাপ

১৭৩। আউট অফ অল, কি সিলেকশান ! একেবারে গান্ধী-জয়ন্তীর দিনেই বিট্রায়াল টু ইউনাইটেড ফ্রণ্ট। মোহনদাস করমচাঁদ তাঁর যোগ্য শিষ্যের কাযকলাপ দেখে স্বর্গধামে আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠেছিলেন হয়ত সেদিন।

১৭৪। উত্তরবঙ্গে সম্ভবতঃ জলঢাকা প্রজেক্ট দেখতে গিয়েছিলেন শিল্পমন্ত্রী সুশীল ধাড়া আগষ্ট, ১৯৬৯এ, (সময়টা একটু এদিক ওদিক হলেও হতে পারে) তখন কয়েকজন লোক তাঁকে ঘেরাও করে থাকবে। তাতে তিনি চটে যান এবং সেদিন থেকেই যুক্তফ্রণ্টের বড় শরিক সি. পি. এম এর উপর ক্ষেপে যান। এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। কাগজে কাগজে প্রতিদিন যত না সুশীল চ্যাচান, তত ভ্যাবান তার অজয দাদা। সুশীল যেদিন হইতে মুখ খুলিলেন, সেই রাত্রি প্রভাতে অনুগামী 'তমলুক গান্ধী' এলডার ব্রাদারেরও বাক্য সরতে সুরু হল।

শুনিতে শুনিতে আমাদের, পাড়াপড়শীর, আত্মীয়-স্বজনের কান ঝালাপালা হইল। জ্যোতি বাবুকে অনুরোধ করিলাম তাঁর গৃহিণীকে শান্ত করিতে (সামনাসামনি করি নাই, জ্যোতি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই তবে মনে মনে করিয়াছিলাম নিজেদের-দেশের স্বার্থে)। কিন্তু ক্ষমতাবান (!) সুশীল-স্বামীর একক ঘর তিনি ৬-মাসের উপর নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন—যদিওআমরা, পাড়াপড়শীরা জানি এর মধ্যেও মাঝে মাঝে অন্য পুরুষের আনাগোনা অব্যাহতই ছিল (চঞ্চল মন যে)। কখনও বীর শ্রেষ্ঠ (একমেবাদ্বিতীয়ম্—এস. এস. পি ১) কাশীকান্তের হাত ধরিয়া, কখনও ভূপাল [অশোক সেন[১৭৫]-

১৭৫। বাংলাদেশের একজন নামকরা ব্যারিষ্টার। এঁর নাম শোনেন নি এরকম লোক পাওয়া যাবে না। এঁর শ্বশুর সুধী রঞ্জন দাস আই. সি. এস দিল্লী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন— পরবর্তী সময়ে কবি রবীন্দ্রের বিশ্বভারতীর আচার্যের পদ অলংকৃত করেছিলেন। ব্যারিষ্টার অশোক সেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজ্ঞ হবেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, ভারতবর্ষের 'আইনমন্ত্রী' হওয়াতেও আশ্চর্য্যের কিছু নাই। 'আইনজ্ঞ' 'আইনমন্ত্রী' হলেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে এমন কোন মানে নেই। বরংচ আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার শক্তি অর্জন করায় ঐসব বড় বড় পোষ্ট। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য অশোক সেন 'আট মাস কাল বসুমতী ক্লোজার রেখে কর্মচারীদের দেড় মাসের বেতন না দিয়ে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসাব না দিয়ে শ্রমিকদের পাওনা টাকা আটক করে কি অনাচার' না করেছেন। ('ফ্যাসিজম কিভাবে আসে' কল্পতরু সেনগুপ্ত পৃঃ ২৭। এই বইটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২এ)। পরবর্তী সময়ে এই লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ জালিয়াতির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। অভিযুক্ত হলেই দোষী সাব্যস্ত হবেন এমন কোন কথা নেই অবশ্য। 'আইনের চোখে সকলেই সমান' এটা একটা কথারই কথা— ভারতবর্ষ নামক দেশটায় 'টাকা যার আইন তার'। অতএব দেখা যাবে হয়ত উনি সসম্মানে অভিযোগ মুক্ত হয়েছেন।

সখা দৈনিক বসুমতীর অন্যতম কৃতী (!) ডাইরেকটার ডাঃ ভূপাল বসু, ১৯৪২ এর ডু অর ডাই ফরমুলার নামকরা গান্ধীবাদী নেতা, নিজের কোলে ঝোলটা ভালভাবেই টানছেন বহু বছর ধরে] এর ঘাড়ে চাপিয়া তিনি বাইরের হাওয়া খাইতে গিয়াছেন, কখনও বা আর কাহারও।

যাক সে কথা, হালের খবরটা জেনে রাখা ভালো। 'বসুমতী প্রসঙ্গ। অশোক সেনের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা।

নয়াদিল্লী, ৩০শে মার্চ—কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সি. বি আই) আজ এখানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং হিসাবপত্রের কারচুপির অভিযোগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী এ. কে. সেনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল হয়েছে।

১৮৬৭ সালের প্রেস অ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্টের ১৪নং ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮২ ধারা অনুসারে কলকাতার দৈনিক বসুমতীর মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদারের বিরুদ্ধেও পৃথক অভিযোগ দাখিল করা হইয়াছে।

সি. বি. আই'র অভিযোগে প্রকাশ, শ্রীসেন নাকি গোপনে বেনামীতে বসুমতী সাহিত্য মন্দির ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি মেসার্স বসুমতী (প্রাইভেট) লিঃ নামে একটি কোম্পানী চালু করেন। শেষোক্ত সংস্থা দৈনিক বসুমতী প্রকাশ করতে থাকে।

সি. বি. আই বলেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং হিসাবে কারচুপি ইত্যাদি অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সর্বশ্রী সুন্দর আদ-ভানি, সুকুমার গুহ মজুমদার, পঙ্কজ চোঙদার, ধীরেন দে এবং অন্যান্যদের সংগে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

সি. বি. আই'র পক্ষে আইনজীবী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, আরও বেশী বিজ্ঞাপন সংগ্রহের এবং অতিরিক্ত নিউজপ্রিণ্টের বরাদ্দ আদায়ের উদ্দেশ্যে দৈনিক বসুমতীর ভূয়া স্ফীত প্রচার সংখ্যা দেখিয়ে নিউজপ্রিণ্ট নিয়ন্ত্রক

কলিযুগের এহেন দ্রৌপদীর গোঁসা হইয়াছে। গোঁসা হালের স্বামী সুশীল-দুঃশাসনের প্রতি (ক্ষণে তুষ্ঠ ক্ষণে রুষ্ট এখন রুষ্ট হইয়াছেন)। ১৯শে মার্চের ষ্টেটস্‌ম্যানের খবরে প্রকাশ যে বাংলা কংগ্রেসেব বিপর্য্যয়ে বহু সদস্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া সম্পাদক-মণ্ডলীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। তখন নিরূপায় সভাপতি মহাশয় (সব জায়গাতেই এক নম্বর পদটি তার জন্য। কংগ্রেসে থাকাকালীন সভাপতি, বাংলা কংগ্রেসে সভাপতি, মন্ত্রীও একেবারে মুখ্য। এক নম্বর পদ দিয়া বসাইয়া দিলেই জগন্নাথ ঠাকুর খুশী) সেক্রেটারী সাহেবের (সুশীল ধাড়ার) উপর বিরূপ হইয়া আবোল-তাবোল বকিয়াছেন। এতদিন সুশীল যাহা বোঝাইয়াছে, তিনি তাহাই বুঝিয়াছেন। কিন্তু এখন গোলমাল ঠেকিতেছে (এতদিনের 'মূর্খ'[১৭৬] আজ চালাক হইয়াছেন বাইরের লোকের কথাবার্তায়), তাই

ভারতের সংবাদপত্র সমূহেব বেজিষ্ট্রার, বিজ্ঞাপন এজেন্সী, সংগঠন এবং ব্যক্তিগণকে প্রতারণা করাই ছিল এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য।

আইনজীবী আরও বলেন ভূয়া সরবরাহকারীদের নিকট থেকে লেখার ও ছাপার (রাইটিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং) কাগজ ক্রয় দেখাবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নাকি ভূয়া প্রমাণাদি তৈরী করেন। হিসাবে কারচুপি এবং ভূয়া পরি-সংখ্যানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অবৈধ উপায়ে প্রভূত অর্থ অর্জন করেছিলেন।—ইউ. এন. আই'। সংবাদটা দৈনিক 'সত্যযুগে'র।

আচ্ছা, অশোক সেন কোন্ কংগ্রেসের সদস্য — সনাতন (আদি) অথবা আধুনিক (নব)? প্রতিক্রিয়াশীল অথবা প্রগতিশীল—কোন্ দলের? [শাসক কংগ্রেস পুরনো শোষকদের (সংগঠন কংগ্রেস আর কি) প্রতিক্রিয়াশীল বলেন।]

১৭৬। তিনি নিজেই নিজেকে মূর্খ বলিতেন। অবশ্য ঠিক সেরকমভাবে নয়। 'আমি মুখ্যমন্ত্রী, মূর্খমন্ত্রী নই' এরকম কথাবার্তা প্রায় প্রতিদিনই তাঁর মুখ থেকে বেরুতো। 'আমি মূর্খমন্ত্রী নই' কথাটাতে যেন অদ্ভুত একটা মিল দেখা যায় 'যা হোক সুভাষ দেশের শত্রু নন' এর। না-এর মধ্যে হ্যাঁ-এর উঁকি-ঝুঁকি মারা, একটি অনিচ্ছায় আরেকটি হয়ত বক্তার ইচ্ছারই।

এতদিনের দোসরকে ভৎর্সনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার মোদ্দা কথা হইল এই যে, ধাড়ার ডিক্টেটারী সুলভ মনোভাবের জন্যই বাংলা কংগ্রেসের পতন হইয়াছে, প্রবীণ নেতা শ্রীসুকুমার রায় দলত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি (সুকুমার বাবু অবশ্য সাম্প্রতিক পোষ্ট-ইলেকশন সভায় সুশীল ধাড়া সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি, সুশীলের ঘাড়ে চাপিয়া মাটির স্পর্শ ছাড়িয়া যিনি রাজনীতি করেন সেই অজয় মুখার্জীর প্রতিই তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে।) ভালো কথা যে তিনি এতদিনে এটা বুঝিলেন (আমরা অনেক কাল আগেই জানিতাম)—তবে সুশীলের ডিক্টেশনই তার জীবনে প্রথম ডিক্‌টেশন নয়— ডিকটেশন করেছে তার আগে অনেক লোক—অতুল্য দিয়ে ডিক্টেশনটা হয়ত সুরু। ভবিষ্যতে চলিতে হইবে ইন্দিরার ডিক্টেশনে, সর্বোপরি চলিতে হইবে মিঃ হাসানুজ্জমানের ডিক্‌টেশনে [পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন— এবারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হইয়াছেন মুস্‌লীম লীগের মিঃ হাসানুজ্জমান, সুশীল ধাড়ার জায়গায়। গান্ধী-বাবুও মিঃ জিন্না এবং মুস্‌লীম লীগের দ্বারা ডিক্টেটেড হইয়াছিলেন তার ফল আমরা ভুগছি— এবার গান্ধীবাবুর চেলার খেলা (গান্ধী চেলায় অবশ্য দেশ ভর্তি, আগে মিষ্টারের এখন মিষ্টার ও মিসেস্ উভয়েরই)। গান্ধীবাদ বলিতে তিনি কি বোঝেন ? মিঃ গান্ধী কি নিজেই 'গান্ধীবাদ' বুঝিতেন ? গান্ধী-কংগ্রেসের পুরা ইতিহাস দিনে দিনে পড়িয়াছি, ১৯১৯এর জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা জানি, সুভাষ-গান্ধীর ইতিহাসের কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারি না, নাথুরাম গড়সেকে দিল্লীর জজসাহেবেরা হত্যাকারী বলিলেও শহীদ ক্ষুদিরামের পাশে বসাইব কি তাঁহার মাথার উপরে বসাইব ঠিক করিতে পারি নাই— এইসব হইতে আমি জোর গলায় বলিতে চাই গান্ধীবাদ বলিয়া কিছু নাই অন্ততঃ বাংলাদেশের পক্ষে (বাঙ্গালী ক্লীবেরা যদিও আমার উপর রুষ্ট হইতেছেন) — বস্তুত গান্ধীর নানান লেখা-জোখা পড়লে তাঁর

মনোভাবকে অত্যন্ত ধোঁয়াটেপূর্ণ বলে মনে হয়, সেই কারণে অনায়াসেই বলা যায় ছায়াহীন মায়াবাদ ও হেঁয়ালীবাদের নামই গান্ধীবাদ।]

নানান দৈবদুর্বিপাকে পশ্চিম বাংলার মুজিবর [পূর্ব বাংলার মুজিবর এর বীরত্ব দেখিতেছি ইলেকশনের পরে, কিন্তু এখানকার মুজিবরের বীরত্ব দেখিয়াছি ইলেকশনের আগে, খবরের কাগজের পাতায় (গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল)। (কোথাকার মুজিবর বরানগরের না তমলুকের ?) পূর্ব বাংলার মুজিবর পাকিস্তান সম্রাট ইয়াইয়া খানকে চড় মারিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের নকল মুজিবর বুঝি বর মাগিতেছেন এখানকার ভারত সম্রাজ্ঞীর পা ধরিয়া] আজ ক্ষীণতনু (৩৩ হইতে ৫) হয়ে পড়েছেন— শরীরের ভার বহন কবিতে পারিতেছিলেন না তাই তিনি কর্মজীবনের (দুঃস্কর্মজীবনের বলাই ঠিক) শেষ ভরটা মুসলিম লীগের উপর দিয়া শেষ ভর্ত্তা ইন্দিরা-সখার ঘরণী হইলেন। এ জীবনের শেষ ১নং পদটী পাবার আকাঙ্খা পূরণের মধ্য দিয়েই আপাততঃ একটি চ্যাপটারের যবনিকাপাত হইল।

তবে 'শেষ থেকে স্থুক' আবার হবে। অথর্বেব রাজনীতির ইতি হবে নিশ্চয়ই। দ্বাপরের দ্রৌপদীর ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ, কলির দ্রৌপদীব হবে বানপ্রস্থ। ইন্দিরা-সখাতেও অরুচি ধরিবে—অরুচিটা অবশ্য দুই তরফেরই হইবে। মুখ্যমন্ত্রী আবার বুঝিবেন তিনি মুর্খ বটে, ঠুঁটো জগন্নাথও বটে (স্বামী শুধু পালটাচ্ছে, স্ত্রীতো একই)। আইন শৃঙ্খলা-রক্ষাকারীকে (২রা এপ্রিলের বীরত্ব পূর্ণ ভাষণ) ইন্দিরা-শৃঙ্খলের অক্টোপাশেই বধ করিবে কিন্তু বাংলাদেশের ডাষ্টবিনেও এই ছেঁড়া ন্যাকরার স্থান হইবে না। তা' যা হোক, আমরা জনগণ-সখারা অপেক্ষা করিতেছি। আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো—বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য (জনগণের চাকর, তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন) এর 'নে না দেখিলে অন্যায় হবে। তাই আশ্বাস দিয়া বলি— সেই

দুর্দিনে আমরাই হব ভব-সাথী, অশক্ত শরীর মন লইয়া যেখানে যাইতে চাও, নিয়ে যাব সখী হাত ধরে সেথা। চাও তো তোমার বরানগরের পদযাত্রা তমলুকে শেষ করাইব কে জানে হয়ত সেখানে বরমাল্য দেবার জন্য প্রাক্তন স্বামী ডাঃ প্রফুল্ল (বিরসবদনে) আত্মগোপন করিয়া আছেন। মন যদি সেখানে না বসে, শ্রান্ত পথিক যদি চাহেন তবে আমরা বঙ্গোপসাগরে লইয়া যাইব—ডুবাইতে নয়, [আমরা তাঁর মত অহিংসবাদী (?) নই তাই লাঠি, বটি, খুন্তি লইয়া তাড়া করিব না (তিনি নিজেই গৃহস্থদের উস্কানি বাণী দিয়া বলিয়াছিলেন সি পি. এম দস্যুদের লাঠি, বটি, খুন্তি লইয়া তাড়া করিতে), জলে ডুবাইয়াও মারিব না (এ গোপন আকাঙ্খার কথাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন)]— তাহাব তীবে বসিয়া হাওয়া খাওয়াইতে আব আমাদের দ্রৌপদী সখীর পবিচিত গলায় 'শ্রান্তি আমার দূর কর প্রভু' গান শুনিতে।

সুভাষবাদ-গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ[১৭৭] !! (??)

আমি আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী। মহামতি গোখলের বাণী 'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow,' মনে রাখা গর্বিত বাঙ্গালী। Auto-biography of Mahatma Gandhi পড়িয়াছি, "Indian Struggle by Subhash Ch. Bose" হাতে লইয়া বহুদিন কাটাইযাছি। আমি তাই সুভাষবাদী-গান্ধীবাদী! [Ref : ১৯৭১ মার্চের কলিকাতার দেওয়াল—সুভাষবাদ-গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ— নবকংগ্রেস"।]

ত্যাগ ও বীর্য্যবত্তা দুইই আমার আকর্ষণ। আটহাতি ধুতি ও খড়ম হিংসার প্রতি ঘৃণা জাগায়— ফরসা ধুতি পাঞ্জাবী ও পরে মিলিটারী পোষাক পরা যুবক আমার বিপ্লবী মন সৃষ্টি করেন। পার্ক-ষ্ট্রীটের দিকে তাকানো মূর্ত্তি ও রেড রোডের উপর দক্ষিণমুখী মূর্ত্তি দুইই আমি প্রায়ই দেখি। আমি গান্ধীবাদী-সুভাষবাদী বাঙ্গালী।

শহীদ ক্ষুদিরামের বংশধর আমি নাথুরাম গড়সে (হত্যাকারী না শহীদ !)[১৭৮] কে ভুলি না। জালিয়ানওয়ালাবাগের ইতিহাস প্রতি মুহূর্তে মনে করি, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংবাদ আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। শৈলেশ দে'র 'আমি সুভাষ বলছি' ও সত্যানন্দ স্বামীর 'হে অতীত কথা কও' এর প্রতিটি লাইন মনকে দোলা দেয়।

১৭৭। বাংলাদেশ বিজয় হয়েছে। মুজিবর রহমান কলকাতায় আসবেন ৬.২.৭২-এ, ইলেকশন হবে ১১.৩.৭২। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩১.১.৭২-এ লেখা। লেখাটির প্রতিপাদ্য বিষয় : সুভাষবাদ ও গান্ধীবাদ একসাথে চলে না।

১৭৮। এই প্রবন্ধটি আসলে একটি ইমোশন্যাল রাইটিং। তাই ওকথাটা বেড়িয়েছে কলমের মুখ দিয়ে। বস্তুতঃ নাথুরাম গডসে মিঃ গান্ধীর একজন প্রকৃত বন্ধু—গান্ধী ইতিহাসে 'শহীদ' হিসাবে অমর হয়ে রইলেন এঁর সাহায্যে।

আমি বাঙ্গালী তাই বিপ্লববাদী তাই আমি বামপন্থী। বাংলাদেশে সবাই বামপন্থী (দক্ষিণপন্থীর অস্তিত্ব শুধু খবরের কাগজের পাতায় ও নেতাদের মুখে)। ১৯৭১-এ বাংলাদেশে আমার মতে পার্টি ছিল বারোটি — দ্বাদশবাম (পাঠকগণের হিসাবের সাথে আমার হিসাবের কিছু তফাৎ হতে পারে)। অষ্টবাম, আদি, অনাদি (গরিবী হটাও), বং কং আর "শেম. শেম, সি. পি. এম"। সুভাষবাদী-গান্ধীবাদী আমি ১০ই মার্চ ১৯৭১-এ ভোট দিযাছিলাম— দ্বাদশ বামের এক বামকে।

এই সেদিন ২৩শে জানুযারী ও আমার বাঙ্গালী নেতার পুণ্য জন্মদিনে তাঁর ছবির পাশে "আমাকে রক্ত দাও, তোমাকে স্বাধীনতা দেব— নেতাজী — নবকংগ্রেস" দেখিয়াছি। আমি সুভাষ-পন্থী বাঙ্গালী তাই শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর হত্যাকারীকে ঘৃণা করিয়াছি—২০।২।৭১ এর গ্লানিময় ঘটনার পরে ২১।২।৭১ এবং তাহার পরে স্বর্গীয় নেতার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করিয়া বৈঠকখানার রাজনীতি করিয়াছি। হেমন্ত বসু আজ পুরনো খবর— তাই হত্যার তদন্ত চাপা দেওয়ার মধ্যে আপাততঃ বিশেষ কিছুই খুঁজিতেছি না।

বামপন্থী নেতাদের বামপন্থী ভোটার আমি আজ বিপদগ্রস্ত। নেতাজীর উত্তর সূরীরা আমার বিপদের কারণ। অধুনালুপ্ত অষ্টবামের অন্যতম ফরোয়ার্ড ব্লক নেতারা আমাকে পথে বসাইয়াছেন। শুনিতেছি তাহারা হেমন্ত বাবুর হত্যাকারীদের (?) সাথে হাত মিলাইতেছেন— তারা উলফ্ (ULF) হইতেছেন। বাংলাদেশের দেওয়ালে কি তবে আমার প্রিয (!) স্লোগান 'গান্ধীবাদ-সুভাষবাদ জিন্দাবাদ—নবকংগ্রেস' দেখিতে পাইব না! আমি তবে কোন্ পথে যাই? পথ যে খুঁজে না পাই।

আপাততঃ তাই ৬ই ফেব্রুয়ারীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছি। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের জনসমুদ্র মানসচক্ষে গণিতে আরম্ভ

করিয়াছি। ভাবিতেছি বিপ্লবী বাঙ্গালী আমি ঐদিন হইতে মুজিব-বাদী-গান্ধীবাদী (ইন্দিরা-গান্ধীবাদও তো গান্ধীবাদই) হইব।

আমার নেতার সহচরের মৃত্যুর তদন্ত চাপা দেওয়া হইয়াছে—আমি আপাততঃ মুখ বুজিয়া বসিয়া আছি। তবে ঠিক করিয়াছি ১৯৭২ এর নির্বাচনে উলফেরা জিতিবার পরে[১৭৯] আমি একাই একশ লোক জোগাড় করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংস্ ঘেরাও করিব। আমার অনেক শ্লোগানের অন্যতমটী হইবে—"জ্যোতি বসু, জবাব দাও, হেমন্ত বসুর মৃত্যুর তদন্ত চাপা দেওয়া হল কেন" ?

১৭৯। ধরিয়া লইয়াছি উলফেরা (ULF) জিতিবে

বাঙলা যাহা আজ ভাবে, ভারত তাহা কাল ভাবিবে[১৮০]

'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস্ টুডে, ইনডিয়া থিঙ্কস্ টুমরো'—এটা হাজার বছর আগের কোন কথা নয়। কয়েক দশক আগেকার একজন মনীষীর কথা। এ' কথায় আই. এ, বি. এ পাশ বা না পাশ বাঙ্গালীরা যেমন গর্ববোধ করেন, আবার দেখি কথাটা আলোচনায় তুললে অনেকেই বলেন—সে সব বাঙ্গালী এখন কোথায়? বাঙ্গালীর এই 'নিগেটিভ ষ্ট্যাণ্ড' আমার অসহ্য মনে হয়। আমি বলিতে চাই যেসব বাঙ্গালীকে উপলক্ষ করিয়া গোখলেজী উপরোক্ত কথাটা বলিয়াছিলেন সে সব বাঙ্গালীরা আজও বিদ্যমান। ১৭৫৭ সনে যাহারা ছিল মোহনলালের রূপ ধরিয়া, বিংশ শতকে তাহাদিগকেই দেখিয়াছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহানায়ক সুভাষচন্দ্র, সূর্য্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখের রূপ ধরিয়া। অষ্টাদশ শতকে মোহনলালের পরাজয় ঘটিয়াছিল মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়; বিংশ শতকেও সূর্য্য সেনেরা 'সন্ত্রাসবাদী' নাম পাইয়াছিলেন গান্ধীবাদীদের কাছে, সুভাষচন্দ্রও 'বখাটে ছেলে' আখ্যা পাইয়াছিলেন কংগ্রেসীদের ১নং নেতার কাছ থেকে। ১৯৬৭-৭১এ এই বাঙ্গালী মোহনলালদেরই বঙ্গোপসাগরে ডুবাইবার স্পর্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল বেইমান[১৮১] অজয়

১৮০। ১৯৭২ এর ইলেকশনের আগে ৩-৩-৭২এ লেখা।

১৮১। নিজের খাতার পাতায় ১৯৭২ এর প্রথমদিকে অজয় মুখার্জীর নামের আগে 'বেইমান' যোগ করেছিলাম। সেই কথাটীর সমর্থন পাওয়া যাবে পরবর্তীকালের 'সাপ্তাহিক বাঙলাদেশে'র পৃষ্ঠায়। ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ এর বাঙলা দেশ লিখছে: 'বিধান নগরে বেইমানের কণ্ঠস্বর। এবারকার বিধান নগর কংগ্রেস অধিবেশনে প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর দুঃখের কথা বলতে গিয়ে নিতান্ত বেঁফাস ভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী

মুখার্জী ও তাঁর দামু ভাইয়ের সাঁকরেদদের কথায় বার্তায়। তাই বলিতে-ছিলাম—আজও সেই বাঙ্গালী বিদ্যমান যাহাদের লইয়া বাংলাদেশ আবার সেই গর্ব অনুভব করিতে পারে।

থাকাকালীন তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন একথা নিজ মুখে স্বীকার করেছেন।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে সখেদে বলেন, অন্য বামপন্থী দলগুলি তাঁর মত বেইমানী করতে রাজী না হওয়ায় তাঁকেই পদত্যাগ করে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে বনবাসে যেতে হয়েছে।...

.. অজয়বাবু গান্ধীবাদী বলে দাবি করে যে মিথ্যা শঠতা এবং চক্রান্তের জাল সৃষ্টি করেছিলেন, তা শুনলে স্বয়ং মাহাত্মা গান্ধীও শিউরে উঠতেন বলে কয়েকজন গান্ধীভক্ত নেতা উল্লেখ করেছেন'।

আরো পরে ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৩ এর 'সত্যযুগ' "নিস্তব্ধ সভা, নীরব 'বিশ্বস্ত কুকুর!' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিল "পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের একটি সজাগ 'বিশ্বস্ত কুকুর' আছে বলিয়া আমরা জানিতাম স্বয়ং ঘোষিত ঐ 'কুকুর' একটু প্রবল বাতাস বা শুষ্ক পাতার মর্মর ধ্বনি শুনিবামাত্র ঘেউ ঘেউ শব্দে সারা ভারত মাথায় করিয়া তুলিত। কিন্তু আজ গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি হওয়া তো দূরের কথা দিনের পর দিন ডাকাত পড়িতেছে —কিন্তু 'কুকুরটি' ঘেউ ঘেউ করা তো দূরের কথা, একটু লেজও নাড়িতেছে না। মেদিনীপুরের সেই গোপাল ভাঁড়ের সগোত্র ভদ্রলোকটি"র নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় যাকে 'সত্যযুগ' 'বিশ্বস্ত কুকুর' হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে। একদিন যিনি "জঙ্গলের শাসনে' অতিষ্ঠ হইয়া, 'বর্বর অত্যাচারে' বিরক্ত হইয়া রাজ্য ও রাজ্যপাট উল্টাইয়া দিয়াছিলেন" তিনি কংগ্রেসী রাজত্বে মেদিনীপুরে নারী নির্যাতনের নারকীয় ঘটনা বিধান সভায় শুনিবার পরও মুখে কুলুপ আঁটিয়া বসিয়াছিলেন ২৮শে আগষ্ট, ১৯৭৩-এ।

পাঠক, অজয় বাবুর রাজ্যপাট আজ গিয়েছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কবলে। এখন মণি-হারা ফণী হয়ে বসে আছেন তাই ১৯৬৯-৭০ এর ফোঁস ফোঁসানী আর শোনা যায় না। ১৯৭৪এ ইনজিনিয়ার-ডাক্তার নামক টেকনোক্রাট না

১৯৭১-এ সকল প্রদেশেই ইন্দিরাজীর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া জয়টীকা পাইয়াছিল শুধু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া সে ঘোড়া গাধা বনিয়াছিল—এটী একজন বড় বলিষ্ঠ রাজনীতিকের[১৮২] উক্তি। ১৯৭২ এর নির্বাচনে সেই ঘোড়া নাকি পশ্চিমবঙ্গও জয় করিবে, একথা অনেক বাঙ্গালীর মুখ হইতেই শুনিতেছি। তবে কি বুঝিতে হইবে ১৯৭১এ সারা ভারত যাহা ভাবিয়াছে, ১৯৭২এ বাংলাদেশও তাহাই ভাবিবে? হোয়াট ইনডিয়া থট ইয়েষ্টার ডে (ইন ১৯৭১), বেঙ্গল উইল থিঙ্ক টুডে (ইন ১৯৭১)? আমি বলিব—কভি নেহি। বাংলাদেশ ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১এ যাহা ভাবিয়াছে তাহাই আরো অনেক বলিষ্ঠ ভাবে ভাবিতেছে ১৯৭২-এও। তাহারই প্রতিফলন আমরা দেখিব আসন্ন নির্বাচনে। তফাৎটী হইবে যে ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১-এর গাধাটী এবার এখানে প্রাণ হারাইবে কোন বংশধর না রাখিয়াই। শেষ কথা বলি—'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস্ টুডে (১৯৭১), ইণ্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো'—এ কথাটীর সত্যতা আবার প্রমাণিত হইবে। ১৯৪৭ এর রাজনীতির বলি খণ্ডিত বাংলার বাংগালীরা যেন এইকথা মনে রাখেন যে বাংলাদেশের আজকের বামপন্থী রাজনীতি শুধু বাংলাকে পথ দেখাইয়া প্রাণবন্ত করিবে না, অন্যান্য অনগ্রসর প্রদেশেরও চোখ খুলিয়া দিবে। এই ইলেকশনে বামপন্থী ফ্রন্ট ২০০টিরও অধিক আসন পাইয়া 'আপসেট' আনিবে। ফলে শক্তিশালী স্থায়ী ও বজ্রকঠিন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে। এই ফ্রন্টই প্রফুল্ল-অজয়-সিদ্ধার্থ-বিশ্বনাথ প্রমুখ বেইমানদের বাংলার মাটিতে মোকাবিলা করিবে, দিল্লীর দিকে ধাবমান হইয়া নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইবে এবং বাংলাদেশকে নতুন করিয়া যোগ্য ভাবে গড়িবে।

বাংলার ইতিহাস কংগ্রেসী বঞ্চনারই ইতিহাস। কংগ্রেস বাংলাদেশের সমস্যা, সমাধান নয়—এটা ১৯৭২ এর এই চরম মুহূর্ত্তে বাঙ্গালীরা বুঝুন, এই ঐকান্তিক প্রার্থনা

বুরোক্র্যাটদের অভাব অভিযোগ শোনার 'হাত পা বাঁধা হর্তাকর্তা বিধাতা' হয়েছেন, খবরের কাগজে মাঝে ২ 'অজয় কমিশনে'র নাম ওঠে। ১৯৭৩ এর শেষের দিকেও একটি কমিটির চেয়ারম্যানশিপ মিলেছিল 'হেমন্ত বসুর হত্যা'কে কেন্দ্র করে।

১৮২। সি. পি. এম এর প্রবীণ নেতা বি. টি. রণদিভের উক্তি।

পুর্ব্বদিগন্তে রক্তিমাভা[১৮৩]

আমি গত ২।৪।৭১ এ কলকাতার দুটী বিখ্যাত পত্রিকাতে (ষ্টেটসম্যান ও অমৃত বাজার) হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া 'দি হিপোক্রিটস' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। বলাই বাহুল্য তাহা ছাপা হয় নাই। সে যাহোক, তাহাতে আমার শেষ কথা ছিল '১৯৭১ এর ইলেকশনই শেষ ইলেকশন নয়।'

একদা কংগ্রেসী বাবুরা বাংলার দামাল ছেলে সুর্য্য সেন, বিনয়-বাদল দীনেশ প্রমুখ বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৯১৯ এর[১৮৪] জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে ব্রিটিশের ঘৃণ্যতম কলঙ্কময় ইতিহাস বলা হয়, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যে সেদিনের গান্ধী-টুপি কংগ্রেসীদেরও কলঙ্কের ইতিহাস তা আমরা অনেকেই ভুলিনাই। মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতেও বাংলার মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের চরম অপমান

১৮৩। ১৯৭২এর ইলেকশনের আগে ২৩. ২. ৭২এ লেখা।

১৮৪। '১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল নববর্ষের দিন (বৈশাখী) ছল। এই দিন হাজার হাজার লোক অমৃতসরে জড়ো হয়ে থাকেন। বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিলেন ওখানকার জালিয়ানওয়ালাবাগে। সেখানে বক্তৃতা চলছিল। এই বাগের চারিদিকে পাকা প্রাচীর। যাতায়াতের পথ মাত্র একটি। হঠাৎ ব্রিটিশ সামরিক অফিসার জেনারেল ডায়ারের পরিচালনায় ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা সমবেত জনমণ্ডলীর উপরে গুলি চালাতে লাগল। ষোল শ' রাউণ্ড গুলি চালানোর পরে গুলি ফুরিয়ে যায়। জেনারেল ডায়ার বুক ফুলিয়ে বলল, গুলি না ফুরিয়ে গেলে আরও গুলি চালানো হতো। লোকেদের বেরুবার পথ ছিল না। প্রায় চারশ' লোক হত হলেন, আর আহত হলেন বারশ' লোক। এটা সরকারী হিসাব। আসলে আরো অনেক বেশী লোক হতাহত হয়েছিলেন।' ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি' পৃঃ ১৫, মুজফ্ফর আহ্মদ)।

ঘটিয়াছিল 'বখাটে ছেলে' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া। দিনের পর দিন ভাবিয়াছি, 'সেই 'বখাটে ছেলে'র পার্শ্বচর হেমন্ত বাবুর মৃত্যু লইয়া কংগ্রেসীদের এত শোক তাপ কেন? কেন এত আগ্রহ তাঁর হত্যাকারাকে হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেশবাসীর কাছে পরিচয় করাইবার? ১৯৭২এ আসিয়া উত্তর পাইলাম। কংগ্রেস ১৯৭১এ রাজনৈতিক 'ফয়দা' উঠাইয়াছিল হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের দ্বারা। ১৯৭২এ অবশ্য বুমেরাং হয়ে সে তীর ফেরৎ যাচ্ছে তাদের বুকই বিদীর্ণ করিবার জন্য।

গত বছর বিশেষ কয়েক দিন যেসব কাগজ হেমন্ত বাবুর কথা নানাভাবে একই কথা লিখিয়াছে, ১৯৭২ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী তাদের অন্যতম একটী (ভারতবর্ষের সর্বাধিক প্রচারিত) কাগজে হেমন্ত বসুর নামগন্ধও ছিল না।[১৮৫] ২১শে তে অবশ্য ভেতরের পৃষ্ঠায় হেমন্ত বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের একটী নাম মাত্র খবর ছিল তাও বিশেষ একটী ফয়দা উঠাইবার কায়দা সমেত। বুঝিলাম, ১৯৭১ এর হেমন্ত বসু তাহাদের কাছে আজ ১৯৭২এ সত্যই মৃত। 'সত্যযুগ'ই একমাত্র প্রাতঃকালীন দৈনিক পত্রিকা যেখানে ঐদিন 'জননায়ক হেমন্ত বসুকে হত্যা করেছিল কারা' এই প্রশ্ন এবং তার সম্ভাব্য উত্তর

১৮৫। কৃত্তিবাস ওঝা 'মাত্র দশদিনেব মধ্যে' "আমাকে মারছো কেন?..." 'নিঃশত্রু নায়ক হেমন্ত বসু' নামক ১৪ টাকা মূল্যের ২৯১ পৃষ্ঠার বই শেষ করেন। সে বইয়ের 'ভূমিকা' লেখেন বয়স্ক অত্যন্ত নামী সাংবাদিক আর 'প্রারম্ভ' বেরোয় স্বনামধন্য বরুণ সেনগুপ্তের কলম থেকে। ২০শে ফেব্রুয়ারী হেমন্ত বসু মারা যান আর ১০ই মার্চ ঐ কেতাবটী প্রকাশিত হয়। মাত্র কুড়ি দিনের মাথায় একটা বই লেখা শুধু নয়, ছাপাও হয়ে গেল— 'হেমন্তদা' সম্পর্কে কত আগ্রহ, কত আন্তরিকতা, কত ব্যাকুলতা, হত্যাকারীর প্রতি কত ঘৃণা প্রকাশ অথচ এর পরে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে – হত্যার তদন্তটা পরিকল্পিত উপায়ে চাপা দেওয়া হচ্ছে তবু ঐসব নামকরা সাংবাদিকের কলম নীরব। গোষ্ঠীস্বার্থে কাজ করা এরেই বলে।

দিয়েছেন। কংগ্রেসের প্রযোজন ফুরাইলেও আমাদিগকে এর সঠিক উত্তর জানিতেই হইবে।

১৯৬৯এ ইউ. এল. এফ ও কংগ্রেস মোট ভোট দাতার যথাক্রমে ৫০% ও ৪০% ভোট পাইয়াছিল। ফুটবল খেলার ফলাফল যেমন অঙ্কের হিসাবে মেলে না তেমনি ভোটের analysis ও অঙ্ক দিয়ে সম্ভব নয় জানি। তবু আমি অঙ্ক কর্বার একটা মজার চেষ্টা সেদিন করে-ছিলাম। সেটা এই—ভোটগুলি যদি সব কেন্দ্রে একই হারে পড়তো (যা' অবশ্য অসম্ভব) তবে ইউ. এল. এফ সীট পেতেন ২৮০ × ৫০%= ১৪০টী আর কংগ্রেস পেত ২৮০ × ৪০%=১১২টী। তফাৎ এ থেকে ১০টী/২০টী হলেই সামঞ্জস্য থাকতো—কিন্তু তা' থাকেনি—ইউ. এল. এফ উঠেছিল ২১৮তে এবং কংগ্রেস নেমেছিল ৫৫তে। ঘটনাটা একটু অদ্ভুত নয়? আমি বন্ধুবান্ধবকে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলাম— ১৭৫৭এ মৃত মোহনলালের আত্মা মীরজাফরদের গত দু'শ বছরের অধিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সেই অতৃপ্ত আত্মাই Super-natural force হইয়া ১৯৬৯এ প্রতিটি ভোট বাক্সে গিয়া এলোমেলো করিয়া দিয়াছে নিপীড়িতের পক্ষ লইয়া, তাই ভোটের ফলাফল ২১৮ এবং বিংশ শতাব্দীর মিরজাফরদেব ৫৫। আজও আবার সেই কথাই বলি—হেমন্ত বসুর আত্মা গত একবছর ধরিয়া অতৃপ্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ১৯৭২ এর ১১ই মার্চ সেই আত্মা বা লাদেশের ভোটের ফলাফলে আবার 'আপসেট' আনিবে। সেদিন যাহারা ফয়দা উঠাইয়াছিল তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিয়া বামপন্থীদের কবলে ২০০টীরও অধিক সীট আনিয়া দিয়া সেই আত্মা মুক্ত হইবে।

১৯৬৭ এতে যে মহান ইতিহাসের সৃষ্টি বাংলাদেশে হইয়াছে ১৯৭২এ তারই একটী অধ্যায়ের শেষ হইবে। আমরা বাঙ্গালী মোহনলালেরা আবার নতুন অধ্যায় সুরু করিব, পূর্ব দিগন্তে নতুন আলোর সন্ধানের জন্য প্রাণপাত করিব। ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়া ৪৪ কোটি[১৮৬] (৯%) লইয়া ১৯৪৭এর রাজনীতির বলি খণ্ডিত বাংলার অতৃপ্ত আত্মা আর তৃপ্ত থাকিবে না।

১৮৬। ১৯৬৯-৭০ সনের হিসাব।

মুজিবর নিখোঁজ[১৮৭]

লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে ৬ই ফেব্রুয়ারী ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়াছিলাম। মুজিব দেখিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় মুজিবকে খুঁজিলাম। কোথাও তাঁহার হদিস মিলিল না। বাঙ্গালী ইমোশনাল জাতি, তাই এক (পূর্ব্বের) মুজিবকে লইয়া নাচিবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক (পশ্চিমের) মুজিবকে ভুলিয়াছে।

১৯৬৯ হইতে ১৯৭১ এর এপ্রিল, মে পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় যাঁর জন্য একটা বিশেষ স্থান রাখা হইয়াছিল, অদৃষ্টের ফেরে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সেই মুজিবরের কোন খবরই কিন্তু বড় বড় কাগজওয়ালারা পর্য্যন্ত ৭ই ৮ই ফেব্রুয়ারী ছাপিল না। তিনি জীবিত আছেন জানি তবে অত বড় ঐতিহাসিক সেই বীর পুরুষ (?) পশ্চিমবঙ্গের মুজিবরের অনুপস্থিতি ময়দানে অথবা খবরের কাগজে অনেককে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেও আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি। বাংলাদেশের মুজিবর যখন আমাদের সম্মুখে আসিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুজিবর তখন কোথায় মুখ লুকাইলেন? কে জানে তিনি হয়ত এখন বরানগর হইতে পদযাত্রা[১৮৮] সুরু করিয়া তমলুকে গিয়া অবস্থান করিতেছেন অথবা বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হইয়াছেন?

১৮৭। ১১.২.৭২ এ লেখা।

১৮৮। পদযাত্রা কথাটা শুনলেই অজয় বাবুদের নেতা গান্ধীজির কথা মনে আসে। নোয়াখালীতে পদযাত্রা, সবরমতীর পদযাত্রা—এসবগুলোর কথা আর কি? ১২ই মার্চ, ১৯৩০এ সবরমতী আশ্রম থেকে 'গান্ধীজী তাঁর পদযাত্রা শুরু' করেন 'উনআশি জন আশ্রমবাসী সঙ্গে নিযে'। (পৃঃ ৩৯০, প্রথম খণ্ড, আমি সুভাষ বলছি)।

অজয় মুখার্জির একদা সখা ও চালক (ফ্রেণ্ড, ফিলোসফার অ্যাণ্ড গাইড বোধ হয) সুশীল ধাড়া ১৯৭৩এ ক্যালকাটা টু আসাম ৬০ দিনের পদযাত্রা-

শ্রীঅজয় মুখার্জী কোথায় 'মুজিবরের মত জিতিব' ভাবিয়াছিলেন জানি না। যদি ভাবেন বরানগরের, তবে বলি ১৯৭১এ হারিলেই ১৯৭২এ চেষ্টা করা যাইবে না এটা কোন কথা? গান্ধীবাদী নেতা তো আবার গান্ধী-পার্টিতেই ঘুরিয়াছেন: বরানগরে দাঁড়াইবার আবদার তিনি এবারও ধরিলে পারিতেন। ধরিয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে এটুকু জানি, বরানগরের সীটের জন্য তাঁহাকে দাঁড়াইতে না দেওয়া হইলেও তিনি তাঁর হাতিয়ার 'অনশন' করেন নাই।

বাঙ্গালী সততার জন্য যেমন বিখ্যাত অসৎ বাঙ্গালীও তেমনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মোহনলালের সততা ও নির্ভীকতাকে ম্লান করিয়াছিল, পরাজিত করিয়াছিল মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা। সেই বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য বাঙ্গালী দিয়াছে, সারা ভারতবর্ষ বহু বছর ধরিয়া তাহার ফলভোগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। সওয়া দুইশত বছর ধরিয়া আমরা অসৎ বাঙ্গালীদের হাতে মার খাইতেছি, ১৯৬৭ হইতে সেই যূপকাষ্ঠ হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা চলিতেছে। আশা রাখি ১৯৭১এ তার এক অধ্যায়ের গৌরবময় পরিসমাপ্তি

সফর করেন—আসামে বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচারে প্রাণটা কেঁদে উঠেছিল, তাই খবরের কাগজের ১৯৬৯-৭১এর হীরো পরবর্তী সময়ের উপেক্ষিত নায়ক কাগজে নামটা উঠাবার ইস্যু সৃষ্টি করেছিলেন, আসাম সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এরকমই কি যেন একটা বলা ছিল পদযাত্রার কারণ হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গের একদা মুখ্যমন্ত্রী গান্ধীবাদী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনও মাঝে মাঝে পদযাত্রা করেন এখান থেকে ওখানে, হালে ১৯৭৪এ আজকের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি আরামবাগ, খানাকুল, পরশুড়া প্রভৃতি স্থানে পদযাত্রা করেন। এর আগে ১৯৭২ এও আসামে তাঁর পদযাত্রার কথা আমরা শুনেছি। খবরটা এরকম: 'আসামের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে বাঙ্গালীদের উপর যে আঘাত এসেছে তা প্রতিরোধ করতে এবং তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও গান্ধীবাদী নেতা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন শীঘ্রই আসামে পদযাত্রা শুরু করবেন'। (সত্যযুগ ১.১২.৭২)

ঘটিবে। নতুন উদ্দীপনায় বাঙলা আবার বাঁচিবে। অজয় মুখার্জীর মত একজন অথর্ব (ঠুঁটো জগন্নাথ তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন) ও বিশ্বাসঘাতককে বাঙ্গালা সমাজের একটা বড় অংশ কয়বছর ঘাড়ে করিয়া নাচিল, তার মুল্য পশ্চিমবঙ্গ দিতেছে। বরানগরের ১৯৭১ সালের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে তিনি জয়ী হইলে, বাঙ্গালী ক্লীবেরা তাহাকে লইয়া আবার নাচিত এবং বরানগরের নাম 'অজয় নগর'[১৮৯] রাখিত এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আপাততঃ তিনি নিখোঁজ হইলেও ইলেকশনের আগে ২।১০ বার খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার দেখা পাব নিশ্চয়ই। তবে এবারকার মার্চের মাঝ বরাবর দেখাই শেষ দেখা হবে কেমিষ্ট্রীর ডক্টরেট মাষ্টার মহাশয়ের মত। শাসক গোষ্ঠী যাহাকে খাড়া করে তাহার আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ থাকে ইতিহাস তাহাই বলে। পলাশীর যুদ্ধে জয়ের পর ইংরাজের ইতিহাস সুরু, কিন্তু রবার্ট ক্লাইভের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী হাতের পুতুল মীরজাফরের অবলুপ্তিও সেইদিন হইতেই। ১৯৬৭ এর ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ১৯৬৯ এর অজয় মুখার্জী, ১৯৭১-৭২ এর বিশ্বনাথ মুখার্জী ও চারু মজুমদারেরা—সকলেরই খবরের কাগজে অবস্থানের আয়ুষ্কাল খুবই সাময়িক— শাসক গোষ্ঠীর যতদিন প্রয়োজন, ততদিনই। তারপরে সকলকেই ঠিকানাবিহীন অবস্থায় আস্তাকুঁড়েই যাইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মুজিবরকেও ১৯৭২ এই রাজনীতির ভণ্ডামীপূর্ণ জীবনের জলাঞ্জলি দিয়া জীবিত থাকিয়াও সারাজীবনের মত নিখোঁজ হইতে হইবে।

১৮৯। বরানগরের নাম কিন্তু 'জ্যোতিনগর' বাবুরা দেয়নি যদিও 'বঙ্কিম নগর' নাম পেয়েছে পার্কষ্ট্রীট-চৌরঙ্গী জংশনে অবস্থিত পুকুর পাড়ের মাঠটি সি. পি. আই নেতা বঙ্কিম মুখার্জীর নামানুসারে আর আলীপুরের বেকার রোডের নাম করা বাড়ী অ্যাণ্ডার্সন হাউসও পরিচিত হল ভবানী ভবন নামে, কংগ্রেস সুহৃদ সি. পি. আই এর নেতা ভবানী সেনের নামকে স্মরণে রেখে।

ইলেকশন আসিতেছে। আবার ঘটনাবহুল প্রাক্-নির্বাচনী ফেব্রুয়ারী আসিয়াছে—হেমন্ত বসু মহাশয়ের হত্যাও হইয়াছিল বিশেষ একটি নোংরা উদ্দেশ্য লইয়া এই ফেব্রুয়ারীতেই। একবছরেও কে হত্যাকারী তাহা জানা গেল না (যদিও কে হত্যাকারী নয় তাহা আমরা জানিয়াছি)—হত্যার তদন্ত চাপা পড়িল কেন—এই প্রশ্নের উত্তর 'তাহাদের' নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না জানি। তাই উত্তরটা মনে মনে ঠিক পাঠকগণই যেন করেন এই অনুরোধ তাহাদের কাছে রাখিলাম।

বার বার তিনবার—১৯৭২এ তৃতীয়বার আবার উলফের রাজত্ব আসিতেছে—শাসক গোষ্ঠীর যতই সুযোগ সুবিধা হাতে থাকুক না কেন। রাজনীতিতে পোলারাইজেশন হইতেছে বাঙ্গলার মোহনলালেরা জীবন দিয়াও এইটাই সারা ভারতবর্ষকে জানাইবে। ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়া মিলিবে মাত্র ৪৪ কোটি (৯%) টাকা এবং সাথে থাকিবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ভবিষ্যতের গালভরা লম্বাচওড়া প্রতিশ্রুতি —এ' ব্যবস্থা আমরা আর কিছুতেই মানিতে রাজী নই। দু'বছরের মধ্যেই ৪০ লক্ষ[১৯০] লোকের চাকরি হইবে (কোথায় গেল Food

১৯০। ফুড কর্পোরেশনে বহু লোক নেবে, দু'লক্ষ না কত, এরকম প্রচার ১৯৭১এ শোনা গিয়েছে। এর জন্য দরখাস্ত পড়েছিল কয়েক লক্ষ, সেগুলো বস্তা বন্দী হয়ে পচছে কয়েক বছর ধরে। কত বেকার ছেলের আশা, তাদের পিতা-মাতার ঠাকুর দেবতার কাছে মানত, পুজোর ফুল বেলপাতা ছোঁয়ানো দরখাস্ত গুলি কীটে কাটছে। অথচ আবার দুবছর পরে আশার বাণী বঙ্গবাসীদের কানে এসে পৌঁছয়। ৪.৬.৭৩ এর ষ্টেটস্‌ম্যান খবর দিচ্ছে 'State Congress move to Centre to create 1 million jobs. New Delhi, June 3.— The Congress Economic Council of West Bengal, after a techno-economic study of the industrial potential in the State expects to create with the implementation of projects suggested by it, one million jobs in the State in

Corporation এর চাকরী যাহার জন্য কত কথা শুনিলাম) এবং সব ইনজিনিয়ারই সাকার হইবে (বেকার থাকিবে না), সেন র্যালে প্রমুখ সব কোম্পানীই খুলিবে তবে ১১ই মা র্চ পরে, (আগে নয়) —এর প্রতিটি জিনিষ বুঝিবার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গবাসী মোহনলালেদের দিনে দিনে হইয়াছে। রাজস্বের ৭৫% বাঙ্গলাকে দিতেই হইবে—এতে বাধা সৃষ্টিকারী ক্লীব বাঙ্গালী রাজনীতিকদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা বিপ্লবী মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের বংশধর আমরা কিছুতেই আর মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দিব না। বহু বছরের বঞ্চনার একটা শেষ হওয়া দরকার। বছরের পর বছর আবেদন নিবেদন করিয়া দয়ার দান ১০ কোটি টাকা গ্রহণ করিয়া আমরা হাওড়া ব্রীজ বানাইব না, নিজেরা যে টাকা রাজস্ব দিই তার একটা বৃহৎ অংশ দিয়া প্রতিদিনের যানবাহন সমস্যার মোকাবিলা করিব, এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটাইব—না পারিলে মৃতপ্রায় বাঙ্গালী একেবারেই মরিব কুম্ভীরদের অশ্রুর প্রত্যাশা না রাখিয়া।

জল সহজেই নিম্নগামী; দিল্লী হইতে আগত কংগ্রেস-রূপী জল সকল প্রদেশই প্লাবিত করিতে পারে—কিন্তু আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কংগ্রেসী-বঞ্চনারই ইতিহাস। যাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব এখনও আছে এবং অস্থির পশ্চিমবঙ্গে যাহারা পথ খুঁজিতেছি আমরা সেই বাঙ্গালীরা তাই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উপর হইতে আসা (দিল্লী তো উপরেই) কংগ্রেস-রূপী ঐ দূষিত জলকে আমরা স্রোতের বিরুদ্ধে রুখিব এবং আমাদেরই কাজে লাগাইব—ফিলটার করিব, জেনারেটার

the next three years...' তিন বছরের দেড বছর তো গেল (আজ ১৯৭৪ এর শেষের দিক), দশ লক্ষের কথা থাক, তার কয় ভগ্নাংশ পদ কংগ্রেস সরকার সৃষ্টি করেছেন আর কজন লোকই বা চাকরী পেয়েছে? ৭২এ তক্তে বসে দশ হাজার, সতের হাজার, চল্লিশ হাজার প্রভৃতি বহু চাকরীর খবর আমরা শুনেছি মাত্র।

বসাইব, হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার উৎপাদন করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাইব।

শেষ কথা তাই বলি, বারেবারে আর আমরা মীরজাফরদের হাতের শিকার হইব না। আমাদের মধ্যে যত মীরজাফর আছে, তাহাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিব, আগে হইতে চিনিব ও সময় মত রুখিব। আর প্রতিটি মুজিবকেও[১১১] চিনিয়া লইব এবং বরণ করিব।

১১১। ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারীতে মুজিবর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল তার পারপ্রেক্ষিতেই শেষ লাইনটা লেখা। অবশ্য বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আমার আইডিয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে ১৯৭৩ থেকেই।

যতীনদাস স্মরণে[১৯২]

পুঁজিবাদ ভাঙ্গার শেষ আনন্দের দিন ২৯ ডিসেম্বরে খোলা মন নিয়ে পথ চলছিলাম। ধাক্কা খেলাম বাজারের মোড়ে কংগ্রেসের 'যতীন দাস স্মরণে'। কংগ্রেস তোরণ তৈরী করেছে যতীন দাসকে স্মরণ করে।

যতীন দাসের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহীদের কথা যিনি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে তেষট্টি দিন অনশন করে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করেছিলেন, সেই যতীন দাসের কথা যিনি ১৯২৮ সনে আমাদের সুভাষচন্দ্রের অনুচর ছিলেন, সেই দধীচির কথা যাঁর উপর সেদিনের ইংরেজ সরকারের উৎপীড়নের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কতদূর মনের শক্তি ও দেশপ্রেম থাকলে একজন মানুষ ৬৩ দিন অনশন ব্রত চালিয়ে প্রাণত্যাগ করতে পারেন সেটা পরিমাপ করার সাধ্য আমার নাই—তবু বহুদিন আমি এই মহাবীরের কথা সঙ্গোপনে ভেবেছি। তোরণে লেখা কথাটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তাই আমার সেসব দৃশ্যগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠলো।

যতীন দাসের মৃত্যুতে চঞ্চল হয়েছিলেন দেশের লোক, হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ চন্দ্র বসু, এমন কি বহির্বিশ্বের বহু মনীষী। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এতবড় ঘটনা সম্পর্কে কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোন বাণী সেদিন নিঃসৃত হয়নি—সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ সত্ত্বেও না! অনেকদিন পর অবশ্য দেশবাসী জেনেছিল যে যতীন দাসের মৃত্যু তাঁর মতে ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। অপ্রিয় সত্য বলতে হোত তার জন্যই নাকি গান্ধীজী

১৯২। 'সত্যযুগ' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটির অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল ৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ সনে।

সেদিন মুখ খোলেন নি। এতে প্রশ্ন জেগেছিল সকলের মনে—অনশন তো মহাত্মারই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার। তিনি তো বহুবার অনশন করেছিলেন তবে যতীন দাসের অনশনে অপরাধ কোথায়? তুদিন বাদে লেবুর রস পান করে আমৃত্যু অনশন ভঙ্গ করেন নি জন্যই কি যতীন দাসের অনশন অস্বীকৃত? তবে কি তিনি অনশন করলে সেটা হয় দেশের কাজ আর অন্য কেউ করলে হয় ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা? মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব স্পষ্টভাবে জানা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু সেই দধীচিকে সম্মান দেখাইয়াছেন দিনের পর দিন। আমার মতে অবশ্য গান্ধীজির এ ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়। বাঙলার মহানায়ক সুভাষচন্দ্রকে যিনি 'স্পয়ল্‌ট চাইল্ড' মনে করেন, রামমোহন যাঁব মতে 'বামন', ভগিনী নিবেদিতা যাঁর কাছে 'বিলাস বহুল রমণী' ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর মনোভাব একটু উল্টোপাল্টা গোছের হবে বই কি!

যা হোক, যা বলছিলাম। 'জাতীয় কংগ্রেসে'র ৭৪ তম অধিবেশনে 'যতীন দাস স্মরণে' কথাটা বড়ই কৌতুকপ্রদ মনে হল। যে গান্ধী-কংগ্রেস যতীন দাসকে সেদিন সামান্যতম স্বীকৃতি দেয়নি, আজ তারাই তঁকে স্মরণ করছে?

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কংগ্রেসীরা ভোটের আগে এসে জনগণকে গান্ধী-স্মরণ করাতো আজ তাবাই গান্ধী-বিস্মরণ করে যতীনদাস-স্মরণিল কেমনে? তবে কি কংগ্রেসীরা গান্ধীকে একদম ভুলেছে নতুন গান্ধীকে (মিস্টার কে ছেড়ে মিসেস্‌কে) পেয়ে? তবে কি এ-গান্ধীর কংগ্রেস সে-গান্ধীকে ভুলেছে, একমাত্র যাঁর নাম তাদের মূলধন ছিল এতকাল? তা' ভালো—তারা কখন কাকে মনে রাখবেন, কখন কাকে ভুলবেন সেকথা তারাই জানেন; আমরা তো দর্শকমাত্র, তাই মাথা ঘামাচ্ছি না!

তবে 'যতীনদাস স্মরণ' পূণ্য কাজ, তাতে সৎ বাঙ্গালী মাত্রেরই আন্তরিক সমর্থন থাকার কথা, আমারও আছে কিন্তু কেন মনে হচ্ছে

যে, এই স্মরণটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙ্গালী যুবকদের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়ার এটা একটা সস্তা প্রয়াস মাত্র এটা কেন মনে আসে ?

[বাঙালী যুবকেরা যদি ইতিহাস পড়ে দেখতে যান তখন অবশ্য সব কিছু ধরা পড়বে তা ওরা জানেন, তবু ভরসা অনেকেই অত চুলচেরা বিচার করে দুয়ে দুয়ে চারের হিসাব মেলাবেন না]। গান্ধীজি অস্বীকৃত যতীন দাসকে '৭৪ তম অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের স্মরণটা একটু কুহেলিকাময় নয় কি ? তবে ওরা বলতে পারেন—আমরা সেই পুরণো কংগ্রেস নই, আমরা 'নব কংগ্রেস'। পুরাতনেরা অনেক অন্যায়, ভুল করেছে—আমরা তা করি না, তাই আমরা 'নব'। ওদের আমাদের তফাৎ অনেক। তাতেও প্রশ্ন ওঠে—নব কংগ্রেস তো বছর তিনেকের সৃষ্টি—১৯৬৯এ বোধ হয়—তাহলে 'নব কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন' না হয়ে '৭৪ তম অধিবেশন' কেমন করে হল এবং নব কবে থেকে জাতীয় হল ? বিধান নগরের অধিবেশনের[১৯৩] মাসখানেক আগে থেকে খবরের কাগজে 'নব কংগ্রেস'কে খুঁজে পাচ্ছি না—'নব' হারিয়ে কখনও 'জাতীয়' কখনও বা শুধু কংগ্রেস হয়েছে। নবরা পুরাতন হয়েছে তবে বড্ড তাড়াতাড়ি তাই না ? তা' হোন —নবর[১৯৪] নবত্ব হবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে—কিন্তু আমাদের যতীন দাসের কি হবে ? কে তাঁকে স্মরণ করবে ? কারা তাঁকে স্মরণ করছে ?

১৯৩। ২৫শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭২।

১৯৪। নবরা এখন, ১৯৭৪ এর জানুয়ারী নাগাদ 'অতি নব' হয়েছেন, তাঁদের কার্যকলাপ সবটাই অভিনব। বস্তুতঃ 'নব কংগ্রেস' আজ 'অভিনব কংগ্রেস' নামধারী একটি সার্কাস পার্টি মাত্র।

নেতাজী স্মরণ, কি সে কারণ ?[১৯৫]

পত্রিকা থেকে জানলাম যে ২৩শে জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তমলুকে যাচ্ছেন মাতঙ্গিনী হাজরার[১৯৬] মূর্তিতে মাল্যদান করতে এবং নেতাজী সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে। সেদিন সুন্দরবনে সমুদ্রবক্ষে তিনি রাত কাটাবেন হয়ত কিছু সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে মাতঙ্গিনী ও নেতাজীকে স্মরণ করে।

মাতঙ্গিনী হাজরাকে মাথায় রেখে নেতাজীর সম্বন্ধে কিছু বলাই এখন আমার উদ্দেশ্য। আপনারা সকলেই ঘটনাগুলি জানেন তবু আমি আপনাদের দু'একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেব। নারায়ণ সান্যাল মহাশয়ের 'নেতাজী রহস্য সন্ধানে' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি প্রথমে। (পৃঃ ১-১৮)।

"টোকিও শহরের···রেঙ্কোজী মন্দিরে···একটি ছোট্ট প্রকোষ্ঠে রাখা আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত চিতাভস্ম ···দর্শকের জন্য · রাখা খাতাখানা উল্টেপাল্টে দেখলাম।···জহরলাল, সঞ্জীব রেড্ডী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, ইন্দিরা গান্ধী— এঁরা কে কি লিখে গেছেন দেখলাম। ···পণ্ডিত জহরলালের বাণী : 'May the Buddha's Message bring peace to Mankind. Sd/ J. Nehru, 13 10 57' অর্থাৎ 'বুদ্ধের বাণী মনুষ্য সমাজে শান্তির বারি সিঞ্চন করুক (১৩।১০।৫৭)'।

প্রিয় সহকর্মীর চিতাভস্মের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুভাষ-বন্ধু জহরলাল ভুলে গিয়েছিলেন বাম-দক্ষিণের দ্বন্দ্ব, ক্ষমা করেছিলেন সেই ভ্রান্ত

১৯৫। ১৯. ১. ৭৩ এ পাঠানো লেখাটির অংশবিশেষ 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২২. ১. ৭৩ তারিখে।

১৯৬। ইনি একদা গান্ধী-বুড়ি নাম পেয়েছিলেন।

দেশপ্রেমিককে— যিনি ব্রিটিশ-ভারতের শত্রু জাপানের সহযোগিতায় যুদ্ধকালে বিব্রত ব্রিটেনকে আক্রমণ করেছিলেন। শান্তির ললিত বাণী ছাড়া আর কোন কথাই মনে ছিল না সেদিন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহরলালের।"···

"ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর রেখে গেছেন মাত্র···১৬-৬-৬৯ তারিখে···'**May the light of Buddha continue to guide us towards Truth and Peace and Service of the people**' 'বুদ্ধের আলোকবর্তিকা যেন আমাদের পথ দেখায়-- সত্যের পথে, শান্তির পথে, সেবার পথে পরিচালিত করে"। (অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাগুলি ১৯৭১ এর নির্বাচন কারচুপির পরে, তাই না? —লেখক) ···"মাদাম ইমোরি প্রশ্ন করেন, কিন্তু 'ভিজিটার্স বুক'-এ তিনি নেতাজীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করলেন না কেন? তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করলেন না কেন?

বললাম, জহরলালজী ছিলেন অন্তরে দার্শনিক। ভারতীয় দর্শনে মৃত্যুকে কি চোখে দেখে তা তো আপনারা জানেন। তাই মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শান্তি কামনা করেছেন —বুদ্ধের শরণ নিয়েছেন। ···

অপরিচিত জাপানী ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলুন তো! আপনি বলেছেন যে সরকারী তদন্তে দু'জন বলেছেন যে, এ চিতাভস্ম নেতাজীর, একজন তা মেনে নিতে পারেন নি। তা'হলে সরকারীভাবে ভারতবর্ষ এটাকে নেতাজীর চিতাভস্ম বলে মানে কি মানে না?

বললাম, সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এটি নেতাজীরই চিতাভস্ম, যদিও তৃতীয় বেসরকারী সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্রের বিশ্বাস এটি নেতাজীর চিতাভস্ম নয়; তাই অনেকে এ কথাটা বিশ্বাস করে না। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী এ ভস্ম নেতাজীরই।

—কিন্তু সরকার যখন মেনে নিয়েছেন তখন সরকারীভাবে নেতাজীর এ চিতাভস্মকে সম্মান জানাতে বাধা কোথায়? প্রতি বৎসর নেতাজীর জন্মদিনে ভারতীয় এম্ব্যাসী থেকে এখানে অর্ঘ্যদান করতে আসায় আপত্তি কিসের?

বললাম, আমি ঠিক জানি না।

—আপনি বললেন, জহরলালজী এখানে এসে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, নেতাজীর পূতাস্থির সম্মুখে শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা তাঁর স্মরণ ছিল না—

বাধা দিয়ে বলি, দেখুন, আমি তো সে সময় উপস্থিত ছিলাম না—

আমাকেও বাধা দিয়ে উনি বলেন, কিন্তু আমি ছিলাম! আমার স্পষ্ট মনে আছে তিনি কোনরকম অভিবাদন না করেই যখন এ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন রেভারেণ্ড মোচিজুকি তাঁকে অনুরোধ করেন একটি ধূপকাঠি জ্বেলে দিতে। উনি যেন বিরক্ত হলেন। আমরাই কাঠিটা জ্বেলে দিলাম—কিন্তু ধূপদানিতে সেই কাঠিটা গুঁজে দেবার মত সময়ও যেন তাঁর ছিল না। জ্বলন্ত কাঠিটা টেবিলের প্রান্তে রেখে দিয়ে তিনি হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন!"

সুদূর টোকিওতে গিয়ে নেতাজীর তথাকথিত চিতাভস্মের সম্মুখে দাঁড়িয়েও ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রীরই নেতাজীর কথা মনে আসে নি। ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৩এ কিন্তু মনে হচ্ছে বাঙলাদেশে এসে নেতাজীর কথাই মনে করবেন ও তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিতে পারেন বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যদি অবশ্য কোন কারণবশতঃ আসা না বন্ধ করেন। আগের কথা মনে করে বাঙলা দশের প্রতি এই অহেতুক কৃপা-দয়ার কারণ তাই খুঁজতে হচ্ছে। তাহলে কি বুঝবো কংগ্রেসের দুরবস্থা মাত্রা ছাড়িয়েছে তাই বাঙলার মানুষের Sentiment কে ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। অনেকে বলতে পারেন, কেন কংগ্রেসের তো CPI কে ধরে প্রায় ২৫০।২৬০টি এম. এল. এ আছে, তাদের

অবস্থা তো খুবই ভালো – দুরবস্থা বলছেন কেন ? আমি তার উত্তরে বলবো, বিধান নগরের মেলা শেষে হাইকম্যাণ্ড নিজেরাই বুঝেছেন যে তাদের অন্তঃসারশূন্যতা বাঙলার মানুষের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাদের পরিস্থিতি ১৯৬৯-৭০ এর চেয়েও খারাপ ১৯৭২-৭৩এ, সেই হেতু আয়োজন সেই নেতাজী স্মরণের যেখানে সত্যিই নেতাজীর নাম নেওয়া হবে ইমোশন্যাল বাঙালী মন গুলো যদি ভজে এই ভরসায়।

কংগ্রেসের কীর্তি[১৯৭]

প্রতি বছর সূর্য্য সেন স্মৃতিদিবসটি নির্দলীয়ভাবে উদযাপিত হয়, স্বাভাবিক কারণেই কোন দলীয় পতাকা থাকে না। কিন্তু গত ১৩ই জানুয়ারী সত্যযুগ পত্রিকা মারফৎ 'বিপ্লবী সূর্য্য সেন স্মরণে' কংগ্রেসের কীর্তি (! পড়ে জানলাম যে এ' বছর সকাল ৮টার সময় প্রদেশ কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করে। মাষ্টারদা কোন দলীয় নন — তিনি বাঙ্গালী জাতির মহানায়ক অথচ কংগ্রেস তাঁর মর্য্যাদা অবনমিত করিয়া দলীয় পতাকা উত্তোলন করায় তার প্রতিবাদে অনেকে কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের সময় চলে যান।

সূর্য্য সেন, বিনয়, বাদল, দীনেশ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। এঁরা সকলেই সুভাষচন্দ্র বসুর মন পেয়েছিলেন এটা ইতিহাসের কথা। কিন্তু গান্ধী-কংগ্রেসের মতে ঐ বিপ্লবীরা ছিলেন 'সন্ত্রাসবাদী' অতএব দেশের জন্য প্রাণ দিলেও তাঁরা পুরোপুরিই আনরেকগনাইজড। 'স্পয়ল্‌ট চাইল্ড', 'মিসগাইডেড লীডার' (বিপথগামী নেতা) এ' সব আখ্যাও সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন খোদ গান্ধীর কাছ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সন বাদ দিয়ে আগের বছরগুলির (অন্ততঃ ৭।৮ বছর) কথা বলছি। সারা বছর কংগ্রেসীদের পতাকার কোন পাত্তা পাওয়া যেত না শুধু তিনটি দিন ছাড়া। ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট। তিনদিনের প্রথম দিনটা 'নেতাজী দিবস' সেই দিনে কংগ্রেসী ফ্ল্যাগ আমার মত অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগিয়েছে, নেতাজী কি শেষে কংগ্রেসের কেউ ছিলেন? তিনি তো মিসগাইডেড নেতা, অত্যন্ত অসম্মানের সঙ্গে তাঁকে অপসারণ করেছিলেন গান্ধীজি ও তাঁর এ,বি,সি,ডি স্তাবকেরা।' তার পরই

১৯৭। ২০. ১. ৭৩ এ লেখা।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি। তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালীর সেন্টিমেন্ট ভাঙ্গাবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস পতাকা রাখে সেই নেতাজীর ফটোর সামনে যিনি ১৯৩৯ থেকে কংগ্রেসের আর কেউ ছিলেন না। গান্ধী-কথিত 'বিপথগামী নেতা'তেই কিন্তু সারা ভারত পরে নেতাজীকে খুঁজে পেয়েছিল। পাশাপাশি তুলনা করুন আর একটা ঘটনা খুবই হালের। তুলনাটি 'কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে' মনে করে একেবারে বাতিল করবেন না। বলছিলাম নিজলিঙাপ্পার কথা। '৭১ এর কংগ্রেস এ.আই.সি সি মিটিং এর সময় স্যুভেনীর বের করেছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সকলেরই নাম পর পর দিয়ে হালের নিজলিঙাপ্পার নাম সযত্নে মুছেছে। নিজলিঙাপ্পা অবিভক্ত কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সেদিনও। যেহেতু আজ তিনি সংগঠন কংগ্রেসের সদস্য তাই ওরা ঘটনাটা মুছে দিল। নেতাজীর নামে জাদু খেলে তাই নেতাজী শেষে কংগ্রেসে না থাকা সত্ত্বেও ওরা তাঁর নাম নেয়, আর নিজলিঙাপ্পা কংগ্রেসে থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম মুছে যায়। উদ্দেশ্য জলের মত পরিষ্কার।

রাস্তাঘাটে ঐ তিনদিন মাত্র কংগ্রেসী পতাকা দেখা গেলেও আর একটী ঘেরা জায়গায় অবশ্য সংবৎসর শোভা পায় সেটা হচ্ছে সিনেমা হল। ১৯৬২ এর চীন আক্রমণের পর থেকেই দেশপ্রেমিকরা দেশের শত্রু (?) কমিউনিষ্ট (কাম নষ্ট)-দের বোধ হয় শিক্ষা দিতে চেয়েছে জাতীয় পতাকা বাধ্যতামূলকভাবে জনগণের চোখের সামনে ধরে[১৯৮] (সিনেমা হলটা

১৯৮। 'সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বন্ধের দাবি নয়া দিল্লী ৩১মে—সিনেমা হাউসে জাতীয় সঙ্গীত শোনানো বন্ধ করার জন্য আজ লোকসভায় দাবি উঠেছিল। কয়েকজন সদস্য ঐ দাবি তুলে বলেন, জনগণ এই রীতির প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা দেখান না। বাস্তবে সিনেমা হলগুলিতে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞাই প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী সদস্যদের অভিমতের বিরুদ্ধে রায় দেন। তিনি বলেন, এরকম কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। (দাগ

জাতীয় পতাকা শো করার প্রকৃষ্ট জায়গা কিনা তা' নিয়ে এখানে প্রশ্ন করছি না এবং এই খেলো পন্থা গ্রহণকারীদের কোন কটাক্ষও করছি না।)[১৯৯]

শুনেছি সূর্য্য সেন অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি একটা সোজা অঙ্ক কষতে পারেননি। নিশ্চিত মৃত্যু, দুদিন আগে আর পরে, এ' জেনেও অঙ্ক-বিশারদ তিনি একটি ২।৪ লক্ষ টাকার লাইফ ইনশিওর করেছিলেন বলে শুনিনি। ২।৪ টি প্রিমিয়াম দিলেই কেল্লা ফতে হত, আর সে কটি টাকা ছিল না বা যোগাড হ'ত না বিশ্বাস করি না। নিজের অবধারিত মৃত্যু জেনেও অঙ্কের মাথাটা একটু খেলালেই তিনি পরিবারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবস্থাও করে যেতে পারতেন এবং তাঁর দেশের কাজের ও কিছু ইতর-বিশেষ হত না। হিসাবের রাজনীতি করলে তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অর্থকরী প্রতিষ্ঠাও আসতো।

আজকের কংগ্রেস ব্যারিষ্টার, ডক্টরেট ' পড়াশোনা করে পাওয়া অনারারী পাওয়া) ইত্যাদি বহু শিক্ষিত লোকে ভর্তি। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, ইনজিনিয়ার, ডাক্তার,

আমার) সুতরাং জাতীয় সঙ্গীত বাজানো চলবে'। (১. ৬. ৭২ সত্যযুগ)

প্রকাশ থাকে যে, এর কিছুদিন পর থেকে সিনেমা হলে জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হয় না এবং জাতীয় সঙ্গীতও বাজানো হয় না। 'প্রত্যেক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর প্রথা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদের জনসংযোগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে এই নিয়ম চালু হয়।

৮।৯ মাস সময়ের মধ্যে এতই অভিযোগ আসতে শুরু করলো ?

১৯৯। পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, এর চেয়ে বড় কটাক্ষ আর হয় না।

ব্যারিষ্টার, উকিল, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজসেবী প্রভৃতি আজ বাইরে অথবা ভেতরে থেকে উপদেষ্টা অথবা সক্রিয় নেতা। কংগ্রেসের আজ বড় দুর্দিন—১৯৬৯-৭০ এর চেয়েও দুঃসময় ১৯৭২-৭৩এ, বুদ্ধিমানেরা বিধাননগরে এ.আই.সি.সি মিটিংএর পর সেটা বুঝেছেন; তাই এই সব জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিতের(?) কংগ্রেসের হিসাবী রাজনীতিকরা বহু হিসাব করেই পতাকাটি রেখেছেন বিপ্লবী সূর্য্য সেনের ফটোর সামনে ভবিষ্যতের কথা মনে করে কিছু ফয়দা উঠাবার মানসে—সে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

ছি, ছি

হেমন্ত বসুর নারকীয় হত্যা আজ ইতিহাস, এটি ঘটনা ছিল ১৯৭১ এর প্রাক নির্বাচনী দিনে—ঘটনার মত ঘটনা। হত্যার অব্যবহিত পর থেকে সারাদেশে একটি ছি, ছি, ধিক্কার বাণী শোনা যায়, সেই ছি. ছি গুঞ্জন বহুদিন পর্যন্ত ছিল। সেদিন বহু বাঙালীর ক্রুদ্ধ মুখ দেখেছি, ঘৃণায় কুঞ্চন লক্ষ্যে এসেছে, আজ সেসব ঘৃণা প্রকাশকারীদের বহু-জনেই অদৃশ্য। হেমন্ত বসুকে কজন আজ স্মরণ করেন সে কথা বলা শক্ত।

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার, যুগান্তর, স্টেটস্-ম্যান, দেশ, অমৃত প্রভৃতির পৃষ্ঠায় ইলেকশনের আগের কয়েক দিন 'আমাকে মারছো কেন' সম্পাদকীয় থেকে আরম্ভ করে ছি, ছি সম্বলিত নানা প্রবন্ধ নানাভাবে লেখা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ঐ পত্রিকাগুলোব ছিঁচ কাঁদুনে লেখকদের না ঘৃণা না কোন কান্না দৃষ্টিগোচর হয়েছে মানুষের। বাঙ্গালী বিপ্লবী (?) পাঠকদের একটা বৃহৎ অংশেরই অতএব অশ্রু শুকিয়েছে—হেমন্ত বসু এখন ইতিহাস মাত্র, মৃতের ইতিহাস—মুষ্টিমেয় দু'চার জন ছাড়া মৃত দ্বারা কারো মনেই টান পড়ে না।

হেমন্ত বসুর মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকীর দিনে, ১৯৭১ এর ২০শে ফেব্রুয়ারীব বিকাল থেকে ছি-ছি পার্টির অন্যতম শরিক, দুই মন্ত্রীর পত্রিকা 'যুগান্তর' একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। ১৯৭৩ এর ২০শে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত প্রবন্ধটি নিম্নোক্তরূপ :—

"ঠিক দু' বছর আগে শনিবার সকাল ১০-৫৮ মিঃ শ্যামপুকুর মিত্তির বাড়ীর সামনে আততায়ীর ভোজালীর আঘাতে জননায়ক হেমন্ত কুমার নিহত হন। এই শ্যামপুকুর কেন্দ্রই ছিল তাঁর কৈশোরের

লীলাভূমি, যৌবনের কর্মক্ষেত্র। আজীবন তিনি এই এলাকায় বাস করেছেন। এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন তিনি, আর তাঁকে এখানেই প্রাণ হারাতে হলো প্রকাশ্য দিবালোকে বহু মানুষের চোখের সামনে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মাত্র বার বছর বয়সে হেমন্তকুমার অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। সেই যুগে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল : ইংরেজের দাসত্ব শৃঙ্খল চূর্ণ করে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধন করা। সেখানে ছিল না গদীর লোভ, ছিল না শাসন-ক্ষমতা লাভের জন্য লোলুপতা। হেমন্তকুমারের দেশপ্রেম এই আবহাওয়ায় লালিত। সেকালে রাজনীতির সঙ্গে জনসেবার কাজও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। একটি যেন আরেকটির পরিপূরক। স্বভাবতই রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা এবং জনসেবা হেমন্তকুমারের জীবনের ব্রত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যাঁরা এই আদর্শকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক আসরে অবতীর্ণ হন, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—আজীবন রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেও দলীয় সংকীর্ণতা এঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। হেমন্তকুমারের জীবন এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

দীর্ঘ ষাট বছরের বছরের রাজনৈতিক জীবনে তিনি বহু পূর্বসূরীর সংস্পর্শে এসেছেন। শ্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী বসু প্রমুখের বিপ্লবী সহকর্মীরূপে কখনও তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, আবার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অনুগামী হিসাবে তাঁকে দেখা গেছে। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লব সাধনার যিনি প্রধান প্রাণপুরুষ, সেই মহান বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হিসাবেই তাঁর সফল রাজনৈতিক জীবনের শুরু। সেই ১৯২৭ সাল থেকেই হেমন্তকুমার সুভাষবাদী হিসাবেই পরিচিত।

সুভাষচন্দ্র যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করেন, হেমন্তকুমার এই রাজনৈতিক দলের বাংলা শাখার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম শ্রেণীর নেতার পদে আসীন ছিলেন। মাঝে বঙ্গ বিভাগ নিয়ে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু যিনি নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত, সমাজতন্ত্র যাঁর জীবনের লক্ষ্য, তাঁর পক্ষে কংগ্রেসে বেশী দিন থাকা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর পদ অনায়াসে ত্যাগ করে পুনরায় ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন।

হেমন্তকুমারের দীর্ঘ সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন দেশের মানুষের কাছে দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর জীবনের আর একটি মহত্তর দিক আছে যা এ-যুগে বিরল। তা হলো মানুষের জন্য অসীম মমতা, রিক্ত সর্বস্বহারা মানুষের দুঃখে বিগলিত হৃদয়। অপরের দুঃখের কথা শুনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন। তিনি নিজের জন্য জীবনে কিছু করেননি, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবেননি, অর্থের আনুকূল্য তাঁর কখনই ছিল না। তাই তিনি নিজে সব সময় অর্থ দিয়ে দুঃখী, দরিদ্র মানুষকে সাহয্য করতে পারতেন না বটে কিন্তু তাদের কখনও নিরাশ করেননি। স্বচ্ছল বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের কছে চিঠি লিখে দিতেন কিছু সাহায্যের জন্য। বিধানসভার সদস্য হবার পর থেকে প্রার্থী ব্যক্তিদের জন্য তিনি যে কত হাজার দরখাস্তে সই দিয়েছেন, কত সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তার কোনও হিসেব নেই চেনা-অচেনা সকলের জন্যই তিনি চিঠি লিখতেন। শুভানুধ্যায়ীরা এরকম ঢালাও সই দিতে নিষেধ করতেন কিন্তু তিনি বলতেন, অচেনা দরিদ্র মানুষগুলো যাবে কোথায়? অর্থ দিয়ে তো উপকার করতে পারি না, সই দিলে অথবা একটু লিখে দিলে যদি এদের উপকার হয় হোক্ না। এই হলো আপনভোলা পরোপকারী জননায়ক হেমন্ত-কুমারের চরিত্র।

এমন একজন মানুষ, যাঁকে অজাতশত্রু বলাই সমীচীন, তাঁর মতন মানুষকেও নিজের এলাকায় ভোজালী, তরবারী ও পাইপগানের আঘাতে নিহত হতে হলো। হেমন্তকুমারের জীবনী পর্যালোচনা করলে এ পরিণতি অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে বাধ্য।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যন্ত্র-সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের কালে কৃতজ্ঞতা, হৃদয়বৃত্তি, মানবতা কথাগুলো বোধহয় অর্থহীন হয়ে আসছে, শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা বোধহয় শুধুই কথার কথা, আত্মত্যাগ, স্বার্থ-ত্যাগ সম্ভবতঃ মূল্যহীন হয়ে উঠছে, তা না হলে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে কি করে ?"

দেড় কলমের দীর্ঘ প্রবন্ধে ইনিয়ে বিনিয়ে হেমন্ত বসুর বায়ো-ডাটা সাপ্লাই করেছে যুগান্তর, তিনি যে খুব বড় একজন নেতা ও মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন সে সব কথা বলা আছে, তাঁর একটি ছবিও জুড়েছে, কিন্তু অতবড় একজন দেশসেবকের হত্যার কিনারা যে হচ্ছে না এ সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য কিছু নেই। ১৯৭১ এর প্রাক-ইলেকশন ছি-ছি বাণী অদৃশ্য হয়েছে, ১৯৭৩এ এসে হত্যার ঘটনাটা শুধুই 'অবিশ্বাস্য' বলে মনে হচ্ছে মাত্র। বৈষ্ণবী বিনয় আর কাকে বলে ?

স্টেটস্‌ম্যান একটি নামী পত্রিকা, বহু বছরের ঐতিহ্যবান পত্রিকা এটি। এতে লেখা খবরের গুরুত্ব অনেক। ২০.২.৭৩ এর স্টেটসম্যানও হেমন্ত বসুর নাম নিয়েছিল। ঐ কাগজের পয়লা পৃষ্ঠাতেই লেখা ছিল—
'Ray cautions critics—In the West Bengal Assembly on Monday, the Chief Minister, Mr. Siddharta Ray, cautioned the critics who thought that the Congress in the State was a house divided against itself . . . etc. CBI Probe — He announced that the Government would seek permission of the court for initiating a full - fledged investigation

by the CBI into the murder of the Forward Bloc leader the late Mr. Hemanta Basu. Amidst cheers from members', (সন্দেহ নাই চীয়ারস্‌টা কংগ্রেস পক্ষীয় কেননা ১৯৭২ এর নির্বাচনের পরে বিধান সভায় উপস্থিত এম.এল.এ বলতে কংগ্রেসীদেরই বোঝায় আধা-কংগ্রেসী সি.পি.আইদের পৃথক সত্বাকে হিসেবে না আনলে), he said : "We are determined to stop any political agitation on Hemantada's death". ১০ পৃষ্ঠার পত্রিকায় মাত্র ঐটুকু জায়গাই দেওয়া হয়েছিল হেমন্ত বসুর জন্য। হত্যার কিনারা না হওয়া সম্পর্কে একটি এডিটোরিয়াল তো দূরের কথা, তাঁর নাম আর কোন আনাচে কানাচেও ছিল না। অথচ সম্পাদক এন যে. নানপুরিয়া অথবা অনুরূপেরা ১৯৭১এ বড্ড কেঁদেছিলেন, কেঁদে ভাসিয়েছিলেন ঐ পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো। এই অশিক্ষিত - অতি শিক্ষিতের দেশে সবাই কিন্তু অন্ধ ও বধির নন অতএব তাদের কাছে স্টেটস্‌ম্যানের ভূমিকা ১৯৭৩এ নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছিল। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি কাগজগুলিরও একই ভূমিক, ১৯৭১এ ক্রন্দন, ১৯৭২-৭৩এ চোখের জল বাস্পীভূত।

নিউজ প্রিন্টের কালোবাজারী ছাড়াও প্রাদেশিকতার উস্কানি দানের অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে সেই অভীক সরকার অশোক সরকারের পত্রিকা আনন্দবাজার '৭১ এ 'আমাকে মারছো কেন' লিখলেও ১৯৭৩এর ২০শে ফেব্রুয়ারী তাদের পৃষ্ঠায়ও হেমন্ত বসুর হত্যা সম্পর্কে কিছুই লেখা ছিল না। এবিষয়ে গৌরাঙ্গদেবের ভক্তদের পত্রিকা 'যুগান্তর'ই তবু যাহোক কিছু লিখেছিল, 'হেমন্ত বসু স্মরণে'র (?) জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু ধন্যবাদ মানুষের কাছে আশা করতে পারেন!

যাক ওসব কথা, এবার আর একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনাই। 'হেমন্ত বসুর আত্মা কেঁদে কেঁদে ফেরে'[২০০] শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল :

"আজ থেকে দুবছর আগে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১এ হেমন্ত বসু নিহত হন। হেমন্ত বসু নিজে শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন তদুপরি 'সুভাষচন্দ্রের' সহচর ছিলেন এই জন্য এই ঘটনা নিয়ে রীতিমত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। হত্যাকারীদেব প্রতি ঘৃণা ও রোষের স্বতঃস্ফূর্ততা প্রায় প্রতিটি লোকের মধ্য থেকেই বেবোতে থাকে। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ-বিষয়ক মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কিছুক্ষণের মধ্যেই দমদম বিমান বন্দরে বসে মানুষকে হত্যাকাবীদেব রং চেনান। বৃহৎ পত্রিকাগুলি ও রেডিয়ো নানাভাবে হত্যাকারীদের বর্ণ চেনান। শোকযাত্রায় অনেকেই 'হেমন্ত বসুকে হত্যা করল কে, সি. পি. এম আবার কে?' শ্লোগান দেন। পবে শহীদ মিনারে আহুত মিটিং-এ কংগ্রেস, বাঙলা কংগ্রেস, সি পি আই, এস এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, ইত্যাদি সব দলের নেতৃবৃন্দই সোজাসুজি সি পি এমকে হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করেন।

হত্যাকারীরা আগে থেকে ইনফরমেশন দিয়ে ঐসব পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণকে এবং উপরোক্ত বিভিন্ন পার্টির নেতাগণকে ঘটনাস্থলে হত্যার আগের মুহূর্তে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে উপস্থিত করিয়ে নিয়ে সাক্ষী রেখেছিল যার ফলে ঘটনার দু'এক ঘণ্টাব মধ্যেই সকলে হত্যাকারীদের নাম ধাম রং ফাঁস কবে দিতে পেবেছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই অনেকেই ওদের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে-ছিলেন। তবু দশচক্রে ভগবান ভূত হলেন।

মাত্র এক মাস পরে ২৩ মার্চ, ১৯৭১ এ (অর্থাৎ ভোট পর্ব সারার পক্ষকাল মধ্যেই) স্টেটসম্যানে একটি চমকপ্রদ খবর বেরোয়। খবরটাতে ছিল যে কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, ভক্তিভূষণ মণ্ডল, নির্মল বসু প্রমুখ ফরোয়ার্ড ব্লকের ক'জন নেতা রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, পুলিশ হত্যাকাণ্ডের একমাসের মধ্যেও হত্যাকাবীদের ধরতে পারেনি। তাদের অনুরোধে ধাওয়ান প্রতিশ্রুতি দেন সে

সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবার। বহু লোকের মনে তখন প্রশ্ন জাগে: ঘটনার পরের দিন মিছিলে যোগ যারা দিয়েছিল এবং তার পর শহীদ মিনারের মিটিং এ যারা সি, পি, এম কে দোষী সাব্যস্ত করেছিল তাদের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকও ছিল কিন্তু দীর্ঘ একমাস পরে তারাই বলছেন দোষীকে ধরা যায়নি। হত্যাকারীকে ধরা গেল না অথচ দোষী কে তা সাব্যস্ত হয়ে গেল, এটা সে সময় অনেকের কাছেই হেঁয়ালী মনে হয়েছিল।

তারপর দিন যায় বছরও গড়িয়ে ২০।২।৭২ এসে পৌঁছায়। ১৯৭১ এ বড় বড় দৈনিক পত্রিকা হেমন্ত বসুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু নানাদিনে নানা ভাবে লিখেছিল। কিন্তু যারা ঘটনার পরদিন থেকেই সম্ভাব্য খুনী সম্বন্ধে ইংগিত দিয়েছিল ঘটনার এক বছর পরেও সেই খুনের কিনারার কোন ব্যবস্থাই হল না—না ডেমো কোয়া সরকার দ্বারা না গভর্ণর শাসিত প্রশাসন বিভাগ দ্বারা। বাঙলার মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখেছে ঘটনার অব্যবহিত পরেই (১৯৭১এ) ডেমো কোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্বেও হেমন্ত বসুর হত্যার কোন কিনারাই অজয় সরকার করে নি। অথচ সাধারণ নিয়মানুযায়ী তো সি পি এম শত্রু অজয় মুখার্জীরই প্রথম কাজ ছিল আদা নূন খেয়ে লেগে হত্যাকারীদের বের করে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করার সি পি এম-এর গন্ধ যখন একবার মুখুজ্যে মশায় পেয়েছিলেন। ইলেকশনের আগেকার বিভ্রান্ত জনসাধারণের এক অংশ যারা সি পি এম কে দোষী মনে করেছিলেন তারাও তাই অজয়-সরকারের এই ঢাক ঢাক গুরু গুরু ভাবকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেছেন।

এল ১৯৭২-এর ইলেকশন। লক্ষ্য করবার মত ঘটনা ঘটালো ফরোয়ার্ড ব্লক। ১৯৭১এ যাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল সময়ের বিবর্তনে ফরোয়ার্ড ব্লক সেই সি, পি, এম দলের সঙ্গে নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠন করলো। শ্রীঅশোক ঘোষ ১৭।২।৭২ তারিখে বামপন্থী ফ্রন্ট

আয়োজিত ময়দানের সভায় দ্বিধাহীনচিত্তে রোষদৃপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে, তাদের বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকার কেউই হত্যাকাণ্ডের কিনারার চেষ্টা করেন নি এবং এখন তাঁরা বুঝেছেন যে কংগ্রেস সরকার এ' হত্যার কিনারা করবে না ববঞ্চ উল্‌টোটা অর্থাৎ ধামাচাপা দিচ্ছে ও দিবে। জনসাধারণেব যে অংশ তখনও ভুল ধারণার উপর চলছিলেন, অশোকবাবুদের ১৯৭২-এ বামপন্থী ফ্রণ্টে যোগদানে তারাও সব কিছু বুঝতে পারলেন ·

'সত্যযুগ' তখন জন্ম নিয়েছে—একমাস মাত্র বয়স। সেই ছোট্ট শিশু 'সত্যযুগ'ই একমাত্র দৈনিক পত্রিকা যাতে ২০।২।৭২এ 'জননায়ক হেমন্ত বসুকে হত্যা করেছিল কারা ?' নামক প্রবন্ধ লিখে বিগত এক বছবের মুল্যায়ন করে মানুষকে জানায় সি পি এম নয়, আসল হত্যাকারী নকশালরা। শ্যামপুকুর তল্লাট তখন নকশালদের এক-চেটিয়া অঞ্চল ছিল আর সি পি এম এর পক্ষে অগম্য অঞ্চল ছিল। হেমন্ত বসুর মৃত্যুর ক'দিনের মধ্যে ইলেকশনের আগেই তাঁর সীটে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী অজিত বিশ্বাসও নিহত হন কিন্তু এবারে আর সি পি এমকে জড়াতে সাহস হয়নি তাদের। নির্বাচনে যে ভাবেই হোক কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেন। ১৯৭১ এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন যিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খুনী চিনিয়ে-ছিলেন, তারই হাতে এখন একচ্ছত্র ক্ষমতা। অথচ মজা এই যে, প্রায় এক বছরের মধ্যে খুনী ধরাতো দূরের কথা ধরার চেষ্টাই করা হল না। খুনী ধরতে অজয় সরকারের ইতস্ততা সিদ্ধার্থ সরকারের এগারো মাসের সরকারেও দেখা গেল। হেমন্ত বসুর তদন্ত চাই বলে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের আবার তাই ২০।২।৭৩ এ আইন অমান্য আন্দোলনে ব্রতী হতে হচ্ছে।

বাঙ্গালী রাজনীতির বলি। আগে ব্রিটিশের, ১৯৪৭এ ব্রিটিশ-কংগ্রেসের, পরে দিল্লী-কংগ্রেসের। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ

দেখলে ভয় পায়, তাই কোন জিনিসই বাঙ্গালী চট করে বিশ্বাস করে না শেষ না দেখে। ১৯৪৭ সন থেকে ধামাচাপা দিতে দিতে ১৯৫৬এ এসে বাঙলার জনতার চাপে পড়ে প্রধানমন্ত্রী জহরলালকে নতি স্বীকার করে নেতাজী এনকোয়ারি কমিটি বসাতে হয়েছিল। জহরলাল - প্রসাদপুষ্ট শাহনাওয়াজ খানের রিপোর্টে নেতাজী মৃত সাব্যস্ত হলেও সে রিপোর্টের সত্যতাকে সন্দেহের চোখে বাঙলার মানুষ দেখেছে। যারা খবর রাখেন তারা জানেন শাহনাওয়াজ - রিপোর্টটি তথ্য সমৃদ্ধ নয়, বরংচ উলটোটা। সে রিপোর্ট বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বছরের পর বছর ধরে এজিটেশন হতে থাকে। বাধ্য হয়ে জহরলাল - দুহিতা অধুনা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কিছুদিন আগে (১১.৭.৭০এ) খোশলা কমিশন বসিয়েছেন। বহু প্রমাণ এই ২৫/২৮ বছরে হয়ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই খোশলা কমিশন সদিচ্ছা থাকলেও এতদিন পরে কতটা কি বের করতে পারবেন তা বলা শক্ত। একটা জিনিস সময় মত করা আর অনেক বছর পরে করার মধ্যে তফাৎ অনেক হয়ে যায়। গরম ভাত ও ঠাণ্ডা ভাত — দুইই ভাত, কিন্তু স্বাদে তফাৎ অনেক, গুণেও বটে।

মানুষ জেনেছে যে এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে হেমন্ত বসুর হত্যাকারী বলে বর্ণিত সাতজনের মধ্যে একজন ছাড়া পুলিশ কাউকেই ধরেনি। তিনজন বিভিন্ন সময়ে পুলিশের সঙ্গে তথাকথিত সংঘর্ষে নাকি মারা গিয়েছে। বাকী তিনজনকে ধরা যায়নি, হয়ত এমন বৃহৎ বক্ষপুটে আশ্রয় তারা পেয়েছে, যেখানে পুলিশ ইচ্ছা থাকলেও পৌঁছাতে পারলো না সাহসের অভাবে। যাকে সন্দেহ করে ধরা হয়েছে সেই স্বপন রায় চৌধুরীকেও পুলিশের বড়কর্তাদের পরামর্শক্রমে পাগল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে—এ খবরও মানুষ এখন জানে। হয়ত শেষ প্রমাণ লোপ পাবে স্বপন রায় চৌধুরীকে পাগল প্রচারের পর আর হেমন্ত বসু হত্যা সম্পর্কীয় পুলিশী রিপোর্টও ফাইনাল করা হবে

ঠিক তারই পরে। হেমন্ত বসু তদন্ত কমিটির গঠন হয়ত হবে কিন্তু প্রমাণগুলি লোপাট হয়ে যাবার পর, এটা আঁচ করা আজ আর কঠিন নয়। তা সত্ত্বেও বাঙলার মানুষ ফরোয়ার্ড ব্লকের আজকের দাবির সংগে একাত্ম হয়ে সুর মিলিয়ে 'হেমন্ত বসু হত্যার তদন্ত চাই' এই মুহূর্তেই বলে ধ্বনি তুলবে।

'দি অ্যাগোনি অব ওয়েষ্ট বেঙলে'র প্রখ্যাত লেখক শ্রীরঞ্জিত রায় ২২।৪।৭২-এ সাপ্তাহিক 'ফ্রন্টিযাব' পত্রিকায় দিল্লীতে সিদ্ধার্থ রায়ের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেন তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রঞ্জিত রায় ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশ্নোত্তরে যেভাবে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন এখানে হুবহু তা' তুলে দেওয়া হলো।

'রঞ্জিত রায়ঃ পশ্চিমবঙ্গে গত কযেক বৎসরে যে সমস্ত খুন সংঘটিত হয়েছে, যেমন বারাসত-বসিরহাটের খুন, জেলের অভ্যন্তরে বন্দী হত্যা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবর্গসহ অন্যান্য বহু হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের খুঁজে বার করাব জন্য আপনি কি তদন্তের নির্দেশ দেবেন?

সিদ্ধার্থ রায়ঃ না নতুন কোন তদন্তের প্রয়োজন নাই। আমরা জানি হত্যাকারী কে?

রঞ্জিত রায়ঃ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে আপনি তা জানাবেন? আপনি কি দোষীদের শাস্তি বিধানের কথা ভাবছেন?

সিদ্ধার্থ রায়ঃ না। যা ঘটবার ঘটে গেছে। আমরা পালটা অভিযোগের মধ্যে যেতে চাই না। আমরা পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলারূপে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

রঞ্জিত রায়ঃ জনসাধারণ জানতে ইচ্ছুক প্রকৃত দোষী কারা এবং তাদের কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধার্থ রায় : না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ত জানতে চায় না শুধু সি পি আই এম-ই তা চাইছে।

রঞ্জিত রায় : দোষীদের শাস্তি দেওয় উচিত নয় কি ?

সিদ্ধার্থ রায় : তারা আপনার বন্ধু লোক।

রঞ্জিত রায় : আমার বন্ধু কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রত্যেক দলে আছে। আপনি যদি জানেন কারা হত্যাকারী তাহলে তাদের শাস্তি দিতে আপনার বাধা কোথায় ?

সিদ্ধার্থ রায় : আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসেন নি। তদন্তের পরামর্শ দেবার বা এ ধরণের প্রশ্ন করার কোন অধিকার আপনার নেই।'

এ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণ পেশ করে রঞ্জিত রায় তাঁর চিঠিতে পরে লিখেছেন : 'এই বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিনি। এর বেশি আর কিছু দরকার ছিল কি ? সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে রীতিমত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমন্ত্রণ পত্রে একথা বলা হয়নি যে, সিদ্ধার্থ রায়ের সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সোজাসুজি এখানে উপস্থিত হইনি বলে কিছু জানবার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করার অধিকার আমার থাকবে না। সিদ্ধার্থ রায়ের মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ আমি করিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আমার নয়াদিল্লীর অভিজ্ঞ সাংবাদিক বন্ধুরা এই থেকে যা বুঝবার তাঁরা তা বুঝে নিয়েছেন।'

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে হেমন্ত বসুর আত্মা বাংলার বাতাসে গুমরে গুমরে কেঁদে কেঁদে ফিরবেই। সেই আত্মার ফিস-ফিসানির সঙ্গে গলা এক করে বাঙলার সত্যকামী মানুষ কি উপরদিকে তাকিয়ে 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ'-এর অধিকারী দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনে'র মহান আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলবে না—হে দেশপ্রেমিক মহানায়ক, তোমার হাতে গড়া সুভাষ চন্দ্রের একদা সহচর হেমন্ত বসুর হত্যার সত্যিকারের খুনীদের যারা আড়াল ক'রে চাপা দিয়ে মানুষকে সত্য জানা থেকে বঞ্চিত করলো তাদের তুমি ক্ষমা করো না "

ছিছি ধিক্কার বাণী আজও নিশ্চয়ই শোনা যায়—তবে সেটা মানুষের ধিক্কার বাণী—যারা ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারী, মার্চে মানুষকে ভুল বুঝিয়েছিল সে সব পত্রিকা ও তাদের চালকদের দিকে তাকিয়েই।

২০০। বর্তমান গ্রন্থকারের লেখা প্রবন্ধটি (প্রায় সবটাই) প্রকাশিত হয়েছিল 'সত্যযুগ'২০১ পত্রিকায় ২০. ২. ৭৩ এ।

২০১। 'গণশক্তি', 'দেশহিতৈষী', 'পিপলস্ ডেমোক্রেসী' থেকে হেমন্ত বসুর হত্যা সম্পর্কীয় লেখাগুলো নিতে পারতাম, কিন্তু পাঠকদের মনে আসা স্বাভাবিক ঐ হত্যার চিহ্নিত আসামী সি. পি. এমের মুখপত্র গুলোর লেখা নিশ্চয়ই তাদের গা বাঁচাবার চেষ্টা করে অন্যকে দোষারোপ করে লিখবে, তাই ওদের পৃষ্ঠা থেকে কিছুই নিলাম না। (না. একটু ভুল থাকলো—'সত্যযুগে'র প্রকাশিত প্রবন্ধে রণজিৎ রায় সম্পর্কিত সাংবাদিক সম্মেলনের অংশটা টুকেছিলাম ১২ই মে, ১৯৭২ এর 'গণশক্তি'র পৃষ্ঠা থেকে. 'ফকিরচাঁদ বাঙালী'র পরিবেশিত লেখা হতে)।

বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা 'সত্যযুগ' সি. পি. এমের পত্রিকা—'সত্যযুগ' এর নিয়মিত পাঠকরা জানেন এটা সত্য নয়। এটি নির্দলীয় পত্রিকা কিন্তু নিরপেক্ষ নয়— পক্ষ তাদের নিপীড়িত, শোষিত জনগণের— একথা পত্রিকার জন্মক্ষণে ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭২-এ সম্পাদকীয়তে লেখা ছিল। ঐ পত্রিকার শতকরা একশ ভাগ লেখাতেই বর্তমান লেখকের সমর্থন আছে এটা ঠিক নয়, বস্তুত: একাধিক লেখাই সমালোচনার অপেক্ষা রাখে, তবু বলবো এঁরা চেষ্টা করছেন. প্রচুর চেষ্টা করছেন, দুঃখী মানুষদের বোঝবার, সেই মানুষদের সাধ্যমত সঠিক পথ বোঝাবার। নিয়মিত পাঠকেরা এ পত্রিকাকে প্রতিদিন যাচাই করে বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছেন, এটি সি পি. এমের দলীয় পত্রিকা নয় —এ সম্বন্ধে তাঁদের 'প্রথম দিনের সম্পাদকীয়' 'মুখে এক বুকে আর এক' নন এটা বোঝা সম্ভব হয়েছে। যারা 'সত্যযুগ' পাঠক নন তারা hearsayর ওপর থেকে যা ভাবেন, যা বলেন সেটা মোটেই ঠিক নয়।

কাট বিফোর দি হর্স[২০২]

১৯৭২ সনে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে কেন্দ্রের সমধর্মী যে কংগ্রেস সরকার জোর জবরদস্তি করে চাপানো হয়েছে তার মন্ত্রীসভার বেশ কয়েকজন সদস্যই আইনজ্ঞ। এদের মধ্যে বি. এল, এল. এল. বি মার্কা আইনজ্ঞ যেমন আছেন, তেমনি আছেন সাত সাতজন ব্যারিষ্টার, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যার অন্যতম ও প্রধানতম। তাঁর নামানুসারে বর্তমান মন্ত্রীসভার নাম রায়-মন্ত্রীসভা।

বিজ্ঞজন পরিচালিত এই মন্ত্রীসভার বহু কাজের সঙ্গেই পরিচয় ঘটেছে এই প্রদেশের মানুষের গত পৌনে দু'বছরে। আইনের বই পড়া নাই অথবা আইন পরীক্ষার কোন পাশ দেওয়া নাই এরকম লোকই সংখ্যায় বেশী অথচ এইসব সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকের কাছে ঐ আইনজ্ঞ-মন্ত্রীসভার বহু জনের কাজকেই সুনীতি সম্পন্ন মনে হয়নি। কাজের বাগাড়ম্বর দেখে এদের দৌড়টা কতদূর তা যাচাই করতে পেরেছেন তারা। 'সোনার বাংলা' গড়বার যে প্রজেক্টটা সিদ্ধার্থ-সরকার একুশ মাস আগে হাতে নিয়েছিলেন, তার মানথলি প্রোগ্রেস সম্বন্ধে কোন রিপোর্টই এখন আর 'অল ইন্দিরা রেডিয়ো' মারফৎও পাওয়া যায় না, এমন কি পাওয়া যায় না কোন সরকার পক্ষীয় সংবাদ পত্র মারফৎও। ফলে, ঐ লুক্রেটিভ প্রজেক্টটির অপমৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। 'কল্লোলিনী কলিকাতা'[২০৩] নামক প্রজেক্টটিতে যে 'বলিষ্ঠ পদক্ষেপ' এর কথা শোনা

২০২। 'বাস ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা' নাম দিয়ে 'সত্যযুগ' পত্রিকা প্রবন্ধটির অংশবিশেষ প্রকাশ করেন ২৫।১২।৭৩ এ। এটা লিখেছিলাম ১১।১২।৭৩ এ, পাঠিয়েছিলাম পত্রিকায় ২।৩ দিন পরে।

২০৩। সরকারী কর্তারা নিজেরা ছাড়া ইউ. বি. আই (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া) কে দিয়ে মোড়ে মোড়ে 'কল্লোলিনী কলিকাতা'র সুদৃশ্য সাইন বোর্ডগুলো ঝুলিয়েছিলেন সেগুলোও এখন অদৃশ্যপ্রায়।

গিয়েছিল, সেই পদক্ষেপের মধ্যে কোন বলিষ্ঠতাই আর কোনদিক থেকে দেখা যাচ্ছে না—পদক্ষেপ বড্ড দুর্বল, এত দুর্বল যে পদচালনা চলছে কিনা সে সম্বন্ধেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। চল্লিশ হাজার বেকারের চাকরী, সতের হাজার কর্মহীনের কর্মসংস্থান, দশ হাজারের নোকরী— এই সব প্রজেক্টগুলোর কোনটিরই ব্লু-প্রিণ্ট আর পাওয়া যাচ্ছে না, আইনজীবি কাশীকান্ত মৈত্র গদীতে আসীন থাকাকালে তবু বা কিছু লোকের কর্মসংস্থান করে দিয়েছিলেন চোরাপথে, আইন ও নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজের তাঁবেদার একটি বিশেষ গোষ্ঠী সৃষ্টি মানসে। 'দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ' কর্বার প্রতিশ্রুতির কাগজ পত্রগুলো কে জানে কোথায়, হয়ত বা বঙ্গোপ-সাগরের জলেই বিলীন হয়েছে এতদিনে। প্রজেক্টগুলোর সংখ্যা সম্ভবতঃ এত বেশী হয়ে গিয়েছিল তাড়াহুড়োর মাথায়, জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দেবার সময় খেয়াল ছিল না, যে প্রজেক্ট ইনডেক্সটিই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ফলে কেউ আর জানতে পাচ্ছেন না 'কলকাতাকে জঞ্জাল মুক্ত' কর্বারই বা কি হল আর তাকে 'উদ্যান নগরী' কর্বারই বা কতদূর? শিল্পমন্ত্রী তরুণ কান্তি ঘোষ বড় বড় উদ্যান বেষ্টিত অট্টালিকায় বাস করে ভেবেছিলেন দমদমের পাশে অভিনব উদ্যান বানিয়ে এমন তাক লাগাবেন সব বিমান যাত্রীদের যে তারা কলকাতায় ঢুকবার প্রারম্ভেই 'উদ্যান নগরী কলকাতা' ও তার কর্তাকে তারিফ করে যাবেন কিন্তু কে জানে সেই অভিনব উদ্যান হয়ত বারাসতের শিশির-কুঞ্জেই আত্মগোপন করলো কিনা? 'সেকেণ্ড হুগলী ব্রিজ',[২০৪] 'পাতাল রেল' কবে দেখতে পাবো স্যার এ প্রশ্ন এই স্যারেদের কাউকে করলে হয়ত তারা কেন্দ্রকে দেখিয়ে দিতে পারেন,

২০৪। হুগলী সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল যুক্তফ্রণ্ট সরকার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শিলান্যাস কর্বার কালে কংগ্রেস সরকার সেটুকু স্বীকার করতেও লজ্জা বোধ করেন।

কিন্তু সেই স্টেডিয়াম স্থাপনার প্রকল্পটীর কি হল, এখন সল্ট লেকে স্থানাভাব হেতু গঙ্গার জলে অথবা আকাশে তাবা নতুন 'প্রজেক্ট-সাইট ঠিক করেছেন, সে সব কথা জানাবার অবকাশ পাচ্ছেন না বেচারীরা চারদিকের নানাবিধ কাজের প্রেসারে এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ দলাদলির প্রচণ্ড ঘুর্ণীর চাপে। কাজের পরিমাণ তো কম নয়,[২০৫] এত কম সময়ে কেমন করে হয়, তাব জন্য সময় চাই, কটি দশক অথবা শতক বৎসর সময় তারা নেবেন তা' তাবা আর বলছেন না অথচ ১৯৭২ এর মার্চ-এপ্রিলে সংবাদপত্র আর রেডিয়োর মাধ্যমে হম্বি তম্বি দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বা দু-চাব মাসেই বানিয়ে ফেলবেন কিছু একটা। এখন তারা আর তা' বলছেন না, বলতে পারছেন না, কেননা যে কেন্দ্রীয় সরকারের রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং এর গোপন সহায়তায় এই ভেজালী মন্ত্রীসভার সৃষ্টি, সেই সরকারের নেত্রীবই যে বচন-বাচনের সুর পালটিয়েছে, তাঁর নিজেরই সেই 'গরিবী হটাও'[২০৬] নামক প্রজেক্টটি যা কিনা ষ্টার্ট পেয়েছিল ১৯৭০।৭১ সনে,

---

২০৫। আগের বিশ বছরে ডাক্তার রায় ও শিক্ষক সেন মশায় তো কিছুই করেন নি, যত কাজ আজ দেশবন্ধু দৌহিত্র ব্যারিষ্টার ও তাঁর অ্যাসিস-ট্যাণ্টবাই করছেন এ কথা তো তাঁর মুখ থেকেই শোনা গেল অগুনতিবার কাগজের পাতায় ও রেডিয়ো ব্রডকাষ্টিং এর মাসিক প্রোগ্রামে।

২০৬। ১৭।২।৭৩ এর পত্রিকাতে লিখছে: 'প্রতাপগড় ১৬ই ফেব্রুয়ারী ...গরিবী হটাও সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, একজনের পক্ষে দু'একদিনের মধ্যে তা করা সম্ভব নয়। ...একজন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সহজ নয়। তিনি আরো বলেন, তাঁর ধারণা জনগণ যদি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে অল্পকালের মধ্যেই দারিদ্র দূর হয়ে যাবে'। তবে যে শুনলাম তিনি ১৯৭১-এ অসৎ প্রতিক্রিয়াশীল কামরাজ, মোরারজী, নিজলিঙ্গাপ্পাকে সরিয়ে তাঁর কংগ্রেসকে ধোয়া তুলসীপাতার আখরা করে তুলেছেন, তা এখন তিনি 'একলা' হলেন কেন, তাঁর তো সহযোগীর অভাব নাই, না এর মধ্যেই আবার তারাও অসৎ হয়ে পড়েছেন? সৎ তিনি আবার একজন মাত্র! তাহলে আর এত বড় দুরূহ কাজটা কেমন করে হয়?

সেই ১নং প্রজেক্টটি এখন দশ বাঁও জলের তলে অদৃশ্য প্রায়, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলেই বলতে হচ্ছে 'গরীবী হটানো' সময় সাপেক্ষ, ২।১০ বছরের মধ্যে তো হবেই না, তাঁর জীবিত কালেও যে হবে এমন ভরসাও আর তিনি দিতে পার্ছেন না।[২০৭] তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে চার টাকা কিলো চাল, দশ টাকা কিলো তেল, ১৪ টাকা কিলো মাছ আর সব আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া[২০৮] দামের সাথে পরিচিত করিয়ে দিতে পেরেছেন এবং তাতেই তাদের দৌড় যে কতদূর তা বুঝতে পারছেন এখানকার সবাই।

এহেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধুনাতম পদক্ষেপ বাস ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আর সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়েই উপরোক্ত গৌরচন্দ্রিকা করতে হল। রায়-মন্ত্রীসভা গঠনের অব্যবহিত পরেই প্রচলন হল 'এল' মার্কা বাস ও মিনিবাস। লিমিটেড স্টপ মার্কা বাস যে ভবিষ্যতে সব বাসেই পাঁচ পয়সা ভাড়া বাড়াবার গ্রাউণ্ড-ওয়ার্ক এ সন্দেহ মানুষ তখনই প্রকাশ করেছে। তারপর হল দোতলা বাসে 'ক্লাসিফিকেশন'

২০৭। 'গরিবী হটাতে কতদিন সময় লাগবে? এই প্রশ্নের আলোচনা হয়েছিল নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়মে। শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর অভিমত ভারত থেকে গরিবী হটাতে দেড়শ বছর সময় লাগবে। শ্রীবি. ভি. নায়ক সময় চেয়েছেন একশ বছর। দিল্লীর এক সাংবাদিক শ্রীডি আর মানকেকর গরিবী হটানোর জন্য ত্রিশ বছর সময় দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রী বলেছেন— না, গরিবী হটাতে এগারো বছর লাগবে। পরিকল্পনা-মন্ত্রীর হিসাবই বাস্তব; কারণ তিনি আরও দুটো নির্বাচনে এই প্রতিশ্রুতি রাখতে চান, তাহলেই পনের বছরের নিরঙ্কুশ রাজত্ব'। সত্যযুগ ২৪।৪।৭২।

[২৫-২৬ বছর ধরে ভারতের স্বাধীন সরকার কাজ করছে কিন্তু মহাকালের তুলনায় মাত্র ২৫-২৬ বছর কতটাই বা? ১০০, ১৫০ বছরও কিছু নয়। অতএব দু' পাঁচটা জেনারেশন নির্বিবাদে ক্রস করুক না!]

২০৮। আকাশ ভেদ করা বলাই ভাল।

অর্থাৎ কোন কোন দোতলায় একটি কার্পেট বিছিয়ে এবং সামনে দুটো আর পেছনে একটা মিনি-ফ্যান ঝুলিযে করা হল ফাষ্ট´ ক্লাশ। লিমিটেড স্টপ বাস ও ফাষ্ট´ ক্লাশ দুটোকেই আরম্ভ করানো হল পাঁচ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির বিনিময়ে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র প্রজা, শীতের রাত্রি, পুকুরের জল আর ল্যাম্প পোষ্টের আলোর কথাই মনে পড়েছে বারে বারে লোকেদের ঐ ফ্যানগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়লেই। হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড়ের তাল গাছের মাথায় ভাতের হাঁড়ি আর গোড়ায় আগুন দিয়ে ভাত ফোটানোর সেই সুবিখ্যাত গল্পটিও সাথে সাথেই স্মরণ হয়েছে যাত্রীদের। মন্বন্তরে যারা মরে না, মারী নিয়ে ঘর যারা করেছে এবং এখনও করে, শত দুঃখেও সেই বাঙ্গালী জাতটার রসবোধ যায় না, এ অভিজ্ঞতা আমাদের নিজেদের আছে। গত ২৭ বছরে ওদের ষড়যন্ত্রে এ প্রদেশ অনেক কিছুই হারিয়েছে, বেকারের সংখ্যায় গিজগিজ করছে রাজ্যটি, ভারতের সর্বপ্রদেশের শীর্ষে এর স্থান এ ব্যাপারে। তবে দারিদ্র্যে যতই নিম্নে অবতরণ করুক আর ধুঁকতে থাকুক এবং শিক্ষায় যতই দ্বিতীয় স্থান থেকে দ্বাদশে নেমে আসুক, ফাষ্ট´ ক্লাশ দোতলায় উঠে নানান জনের চুটকি চাটকি কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে অসীম প্রাণশক্তির অধিকারী জাতির জনেরা রসিকতা আজও ভোলেনি। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্' কথাটার সাথে পরিচয় ছিল, মনের অভিধানে সংগ্রহ হল 'দর্শনেন পূর্ণ ভোজনম্' নামক নতুন কথাটি যা' কিনা ঐ রসিক জনেরই কাউকে কাউকে বলতে শোনা গিয়েছে ঐ ফ্যান ক'টাকে কেন্দ্র করে। সামনের সারিতে চারজন ও পেছনে দুজন — এই ছয়জন ভাগ্যবান ছাড়া আর বাকী সকলকেই ফ্যানের দিকে তাকিয়ে 'হাওয়া খাচ্ছি' মনে করেই পাঁচ পয়সা একষ্ট্রা গুনতে হয়েছে। শীতের প্রারম্ভেই ফ্যান তিনটি অন্তর্ধান করেছে, কিন্তু ফাষ্টো কেলাস তার কৌলীন্য হারায়নি — বাসের টিকিটের দাম পাঁচ পয়সা বাড়ানোই থাকলো। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়লো। ডাঃ বিধান রায় ষ্টেট বাস প্রবর্তন করে বহু বাঙ্গালী যুবকের কর্মসংস্থান

করেছেন একথা কংগ্রেসের অতি বড় সমালোচকও স্বীকার করেন এখন পর্যন্ত। তিনি গোড়ার দিকেই ফ্যানের প্রবর্তন করেন কয়েকটি একতলা বাসে, কিন্তু তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়নি। সদিচ্ছা নিয়ে এক্সপেরিমেণ্টই, তাই তার জন্য কেউ তাঁকে ছিছি করেনি কিন্তু আজ করছে। আগের ইতিহাস জানা থাকা সত্বেও ফ্যানের প্রচলনই অনুচিত হয়েছে তাই তার প্রচলনে মোটিভ খুঁজে পেয়েছে মানুষ। যে ফ্যানের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই তা নতুন কিনবার সময়ে আবার পরে স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রীর মধ্যে মানুষ অন্য কিছুর গন্ধ শুঁকেছে কর্তাব্যক্তিদের চরিত্রের সঙ্গে এই কদিনের পরিচয়ের পরে। সে যাক্, ১লা ডিসেম্বর থেকে পাঁচ পয়সা বাসের-ভাড়া বাড়িয়েছেন এই সরকার। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যতই বলুন 'পেট্রোলের দাম বাড়লেও সাধারণ লোকের কোন ক্ষতি হবে না' তা কিন্তু হয়নি। পেট্রোলের দাম বাড়ল — প্রতি লিটারের দাম ১.৬০ টাকা থেকে ১.৬৭ টাকা কি তার চেয়েও বেশী করা হল, যদিও মাত্র সাত পয়সাই বাড়া উচিত ছিল জ্যোতির্ময় বসুর দেওয়া যুক্তি অনুযায়ী — ট্যাক্সি ফেয়ার বাড়ল ১৯৭০ এর তুলনায় ৬০ পারসেণ্ট, ১৯৭২ এর তুলনায় প্রায় ৪০%...। ট্যাক্সির ভাড়া বাড়লো পেট্রোলের দামকে কেন্দ্র করে, কিন্তু বেশীর ভাগই বাস চলে ডিজেলে ফলে ভাড়া বৃদ্ধির কারণ বোঝাতে অন্য রাস্তা ধরতে হল। ৩০শে নভেম্বর পরিবহনমন্ত্রী শ্রী জ্ঞানসিং সোহন পাল অজ্ঞ জনসাধারণকে জ্ঞান দিলেন 'লোকসান তাই ভাড়া বাড়ছে। সি. এস. টি. সি বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা লোকসান খাচ্ছে।' আমাদের স্মরণে আছে এর আগে, নিজেদের কৃতিত্ব ও কর্মপটুতা বোঝাবার জন্য, একাধিকবার এরা ক্যালকাটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট লাভ হচ্ছে বলে বক্তৃতা দিয়েছেন। তা

২০৯। এটা এখন আবার আরো বেড়েছে। সেদিনকার পরিবর্তিত ভাড়া ১.৬০ টাকা থেকে ১.৮০ টাকাতে উন্নীত হয়েছে, এই কদিনের মধ্যেই।
—লেখক ২৫.৩.৭৪

টাকা কম আদায় হয়েছে। এটা কি শতকরা ৯৫ জন যাত্রীর বর্ধিত হারে বাসভাড়া দেওয়ার কথা প্রমাণ করে না ঠিক উল্টোটা? ভাড়া বাড়বার পরিমাণের হার শতকরা হিসাবে আগে যা দেখানো হয়েছে, তাতে সহজেই অনুমেয় যে মন্ত্রীজির কথা সত্য হলে এক একদিনে তিরিশ/চল্লিশ/পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় বাড়তো, কিন্তু আসলে তা কমেছে। এই কথাটাকে বিশ্লেষণ করলে এতে বর্তমানের কলকাতার মানুষের মনের সঠিক প্রতিফলন পাওয়া যায়। তারা পাঁচ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধিকে মাত্র পাঁচ পয়সা হিসাবে নেন নি, পাঁচ পয়সা বেশী দিলে কেউই মরে যাবেন না কিন্তু তারা নিয়েছেন এটা নীতি হিসাবে। ১২।১৪ টাকা কিলো মাছ, ৪ টাকা কিলো চাল, ১০ টাকা কিলো তেলের বিরুদ্ধে যদি কিছু নাই করে থাকতে পারেন এতদিন, তবে তা নেহাৎই বাধ্য হয়ে, অনন্যোপায় হয়ে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে প্রচণ্ড রাগ জমে উঠেছে গত কয়েক মাসে জিনিসপত্রের একটা অস্বাভাবিক রকম মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে আর এঁর জন্য তারা শাসককুলকে যে ঘৃণার চোখে দেখতে সুরু করেছেন, এরই প্রতিফলন আছে ঐ সামান্য কটা টাকার অঙ্কের মধ্যে, লক্ষও নয়, কোটিও নয়, মাত্র কয়েক হাজার টাকার হিসাবের মধ্যে। বাসযাত্রীদের বহু লোকেরই যুক্তি এই যে, চাল-ডাল, তরি-তরকারি, বেবীফুড আর কয়লা কোনটারই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা করতে পারা যাচ্ছিল না নিজের ক্ষমতার অভাবে, নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে, কিন্তু পাঁচ পয়সার ইস্যুটা তো আজ এসেছে নিজেরই হাতের মধ্যে। সরকারী মন্ত্রী 'প্রধান' থেকে 'কোল' পর্যন্ত — সকলের দুর্নীতিতে আজ দেশটা রসাতলে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের জীবন কি দুর্বিষহ করে তুলেছেন তারা, অথচ কেউ তা বলতে গেলেই মহাশয় মহাশয়াদের গোঁসা হয়,

২১০। 'বাড়তি বাসভাড়া বয়কট ; কর্তৃপক্ষের কালা সার্কুলার' শীর্ষক খবরে বাসভাড়া আয়ের উপরোক্ত হিসাবটা বেড়িয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ এর সান্ধ্য দৈনিক 'গণশক্তি'তে। সেখান থেকেই হিসাবটা নেওয়া হয়েছে।

নিছক এম. এল. এ-এম. পি শিপের সংখ্যাধিক্যের জোরে অনাস্থা প্রস্তার নাকচ করেন, তাবা বিরোধীদেব ঘাড়ে আবোল তাবোল কথা বলে দোষারোপ করেন। ভূষি কেলেঙ্কারীকে কেন্দ্র করে যে কোটি কোটি টাকা চুরি হয়, তার দায়টার সবটা প্রভুদয়াল গুপ্ত নামক অবাঙ্গালীটার ঘাড়ে চাপিয়ে ঐ দুর্নীতির আসল নায়ক বাঙ্গালী খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্রকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় কিন্তু পশ্চিম-বাংলার সচেতন মানুষ অত সহজে কোন জিনিস ভোলেন না. খালাসদানকারী সিদ্ধার্থ রায়দের চরিত্র অতি নগ্নভাবে ধরা পড়ে গিয়েছে তাদের কাছে। বহুদিন ধবে সাধারণ মানুষ সুযোগ খুঁজছিল, ঐ বড় বড় ব্যাপারে নীরব দর্শক (মাঝে মাঝে সরবও বটে) থাকলেও, এই ছোট্ট পাঁচ পয়সার ইস্যুটাকেই তারা ট্রামকার্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন. এটা বুঝতে কারো বেগ পেতে হয না। মাত্র এক পয়সা ভাড়া বেড়েছিল ১৯৫২ সালে, আজ থেকে বাইশ বছর আগে, ডাঃ বিধান রায়ের আমলে আর তাতে মানুষ কি পর্যন্ত ক্ষেপে উঠেছিল, কিভাবে তার প্রতিরোধ করেছিল আন্দোলন করে, আজ দুর্নীতির শীর্ষস্তরে অবস্থিত সিদ্ধার্থ-সরকারকে তারা বিনা চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দেবে পাঁচ পয়সা বাডাবার ও পরে, একথা যারা ভাবেন তারা বাতুল. পশ্চিমবাংলার মানুষের পালস্ ফীল করতে তারা পারেননি। বাস ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটা যে অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক হয়েছে, রায় মন্ত্রীসভার বিজ্ঞ সদস্যদের এখন তা' মালুম হচ্ছে। খবরেই প্রকাশ, এই বোকামির জন্য মূল্য তাদের ইতিমধ্যেই দিতে হয়েছে, এবং আরও অনেক দিতে হবে। এই ছোট্ট ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো গত কদিন ধরে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে তা সামাল দেবার মত কোন ক্ষমতাই আর সিদ্ধার্থবাবুর বা তাঁর সঙ্গীদের নাই, অদূর-ভবিষ্যতের ইতিহাসই তা' বলবে। মোট কথা, ফার্ষ্ট রাউণ্ড জয় জনগণের হয়ে গিয়েছে সে কথায় পরে আসছি।

অনেকের ধারণা যে কলকাতা শহরের যানবাহনের ভাড়া অন্যান্য বড় বড় শহর থেকে অনেক কম। কিন্তু এটা সত্য নয়। একথা বোঝাতে গেলে একটা প্রামাণিক সত্য সামনে তুলে না ধরতে পারলে পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করানো শক্ত। তাই ৯ই ডিসেম্বরের 'সত্যযুগ' পত্রিকার পাতায় লেখা 'ভাড়াবৃদ্ধি অযৌক্তিক' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি। '...শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, ভারতের মধ্যে শুধুমাত্র কলিকাতাতেই পরিবহণ ব্যয় সর্বাধিক। এছাড়া অন্যান্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় কলিকাতাতে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি এবং রিকশার ভাড়া অনেক বেশী। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যপার হইল, এই কলিকাতাতে যাত্রীসংখ্যা এত বেশী যে, সেই তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা অতি নগণ্য। ফলে, প্রতিদিন অফিসযাত্রীরা ট্রেনে, ট্রামে, বাসে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বাদুড ঝোলা হইয়া অতিকষ্টে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এই ধরণের মর্মন্তুদ চিত্র সারা ভারতের অন্য কোথাও মিলিবে না। ...সবচেয়ে নিম্নতম দূরত্বের ভাড়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৫ পয়সা। ...অথচ ভারতের অন্যান্য সব রাজ্যের শহরে সব বাসেই দশ পয়সার স্টেজ রহিয়াছে। ট্যাক্সির ক্ষেত্রেও অবস্থাটা তথৈবচ। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় যেখানে ট্যাক্সির সর্বনিম্ন ভাড়া এক টাকা চল্লিশ পয়সা সেখানে কলিকাতাতে তাহা এক টাকা ষাট পয়সা। অথচ কলিকাতার তুলনায় বোম্বাইয়ে কিন্তু পেট্রোলের মূল্য অনেক বেশী। এ ছাড়া সারা ভারতে মিনিবাস চালু রহিয়াছে কেবল মাত্র দিল্লী ও কলিকাতায়। কিন্তু ছুটি রাজ্যে ইহার ক্ষেত্রে ভাড়ার পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। দিল্লীতে যেখানে ভাড়া ৩৫ পয়সা থেকে শুরু, সেখানে কলিকাতায় ইহা শুরু ৫০ পয়সা থেকে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়ত ইহা বাড়িয়া ৭৫ পয়সায় দাঁড়াইবে বলিয়া আশংকা করা যাইতেছে। আসলে কলিকাতার সর্বত্রই বাসের ভাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশী।'

গত দশ এগারো দিন যারা কলকাতার বাসে ট্রামে চলাফেরা করছেন, তারা অমানুষিক কষ্ট পাচ্ছেন, কাতারে কাতারে লোক মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকছে একটি বাসের জন্য, আর বাস ট্রাম এলে তাতে ওঠা অথবা তা থেকে নামা যে কি ভয়াবহ তা' সকলেই বুঝতে পারছেন। কষ্ট হচ্ছে সন্দেহ নাই কিন্তু এর একটি সুফলও আছে। মানুষের মন তৈরী হচ্ছে, ইস্পাত সদৃশ্য শক্ত হচ্ছে। যারা বৈঠকখানায় বসে টেবল-চাপড়ানো রাজনীতি করে দিন কাটান, এরকম বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরাও আজকাল পথে-ঘাটে প্রশ্ন রাখছেন, 'বাসগুলো সব গেল কোথায়?' ১৭ই নভেম্বরে[২১১] যে সরকার ৭০০ বাস চালাবার চেষ্টা করেন, আজ ২০০।৩০০ বাস তারা চালাচ্ছে কিনা সন্দেহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে একটা বাস দেখা যাচ্ছে না, ব্যাপার খানা কি'? ঘটনাটা এই যে, যত বুঝতে পার্ছেন যে তারা হেরে যাচ্ছেন মানুষের কাছে, তারা তলিয়ে যেতে চলেছেন ততই এই জনবিরোধী সরকার, যারা নির্বাচন-জালিয়াতির মাধ্যমে পশ্চিম-বাংলার মসনদে বসেছেন, মানুষের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠছেন, যতরকম সম্ভব হয়রানি ও দমন মূলক ব্যবহার করছেন, তাদের শাস্তি দেবার জন্য, নাহলে সরকারী বাস এইরকম অবিশ্বাস্যরকম ভাবে কমিয়ে দেবার মানেটা কি? অথচ মুখে যত জনদরদী কথা! বিরোধী পক্ষের প্রতি অপপ্রচারে আর যে চিড়ে ভিজবে না, এটা তাদের মালুম পড়েছে গত দশ দিনের কলকাতাকে দেখে। তাই হয় আর তাই হচ্ছে।

এর আগে শোনা গিয়েছিল মাননীয় বিচারপতি বিনায়ক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে যে কমিশন বসেছিল তারই সুপারিশক্রমে সিদ্ধার্থ রায় ভাড়া বৃদ্ধি করেন। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে ব্যানার্জি কমিশনের রিপোর্টের প্রথম অংশ গুলি প্রকাশ করলেও পরবর্তী অংশ গুলি

২১১। বাংলা বন্ধের দিনে

যেমন পরিবহণ দপ্তরের দুর্নীতি সম্বন্ধে কটাক্ষ ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ, যাত্রীসাধারণের নানাবিধ সুবিধার জন্য সুপারিশ এগুলি কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন নি। এরকম নজির অবশ্য নতুন নয়। ওয়াংচু কমিটির অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট'টি বেমালুম গায়েব করে দিয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী—এ খবর মানুষ কোনদিনই জানতে পারতো না যদি এম. পি জ্যোতির্ময় বসু লোকসভায় প্রশ্ন উত্থাপন না করতেন আর তথ্য দিয়ে লেখা তাঁর বই Demonetization & Wanchoo Committee's Report না বের করতেন। যাক্ সে কথা। ৫ই ডিসেম্বরের 'যুগান্তর' এ দেখা যাচ্ছে 'ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথাই উঠে না' বলে বিবৃতি দিচ্ছেন সিদ্ধার্থ রায় অথচ দুদিন পরেই জানা গেল ব্যানার্জী কমিশনের পুনঃ নিয়োগের ব্যবস্থা করছেন তিনি। এটা যে জনতার চাপে নতি স্বীকার করেই করতে হল এবং এটা যে জনগণের ফার্ষ্ট রাউণ্ড জয় এই কথাটা বলবার জন্যই এত কথার অবতারণা করতে হল।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'টু পুট দি কার্ট বিফোর দি হর্স'। অশ্ব-শকটযান চালনা করে অশ্ব সামনে থেকে, পেছনে থাকে শকটযানটি। কিন্তু শকটযানটিকে যদি সামনে রাখা যায় আর অশ্ব পেছনে তবে তা' চলবে কি? বোধ হয় চলবে না। আর যদি বা চলে হর্স-পাওয়ারের পেছন থেকে ঠেলায় তবে গাড়ীটি তার আগের গতি পাবে না, হয়ত সেটি খানা-খন্দতে মুখ থুবড়ে পড়বে। সেটা আর যাই হোক, সুষ্ঠুভাবে চলার নিদর্শন নয়। তাই ডিকসনারীতে ঐ প্রভার্বটির মানে দিয়েছে 'ভুল পদ্ধতিতে কাজ করা'। অর্থাৎ কিনা এরকম ব্যবস্থা যে গাড়ীর মালিক করবেন তাকে হয় লোকে 'অ্যালিস্ ইন দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে'র বিখ্যাত 'হোয়াইট নাইট' আখ্যা দিবে নতুবা তাঁর মস্তিস্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রধান ব্যারিষ্টার রায়ের ব্যানার্জী কমিশন পুনঃ নিয়োগরূপ কাজটি দেখেও মানুষের মনে ঐ উপরোক্ত কথাটি আসাই স্বাভাবিক।

পূর্ববর্তী কমিশনের রিপোর্ট তিনি পুরো বের কর্লেন না অথচ ভাড়া বাড়ালেন'। আবার এখন দেখা যাচ্ছে ব্যানার্জী কমিশনের কাছেই জিনিসটা পাঠালেন। ব্যানার্জী কমিশনরূপী ঘোড়াকে ফলো করে-ছিল ভাড়াবৃদ্ধি রূপ গাড়ীটি কিন্তু এখন পাশা উল্টেছে। ভাড়াবৃদ্ধি থেকেই গেল অথচ সেটা হওয়া উচিত কি উচিত নয় তার সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হচ্ছে কমিশনের কাছে। ভাড়াবৃদ্ধিকে আপাততঃ মূলতুবি রেখে কমিশন বসানোটাই স্বাভাবিক লোকের কাজ ছিল কিন্তু অস্বাভাবিকতায় যাদের জন্ম, তাদের মাথায় এ যুক্তি ঢোকে না। সাধারণ লোকেরা এদের আইনজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছে। কমিশনের প্রতি কোন কটাক্ষ না করেই বলতে হয় যে ব্যানার্জী কমিশনকে প্রভাবান্বিত কর্বার সুপ্ত আকাঙ্খা এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এবং অন্যায় ভাবে বিদ্যমান। ব্যানার্জী কমিশন শাসক গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করে যদি পনের পয়সা অথবা তদুর্দ্ধে টিকিটের দামটি বর্ধিত কবাব সুপারিশ করেন দশ পয়সার জায়গায়, তবে সিদ্ধার্থ সরকার বাঁচলেন আর যদি ১২ অথবা ১৩ পয়সা সুপারিশ করেন, তবে তো মার্কসবাদী দলের নেতা জ্যোতি বসুর কথাটাই প্রশ্ন আকারে রাখতে হচ্ছে— তবে কি সিদ্ধার্থ বাবুরা যে সব যাত্রীকে অন্যায় ভাবে পনের পয়সার টিকিট বিক্রি করেছেন এ'কদিন, তাদের প্রত্যেককে মুখ চিনে রেখে বাড়তি ২।৩ পয়সা ফেরৎ দেবেন ?

পশ্চিমবঙ্গ সবকারের আইনজ্ঞ মন্ত্রীরা কি জবাব দিচ্ছেন ? এখন আবার ঐ কমিশন বসানো একটি বিরাট প্রহসন ছাড়া কিছই নয়। মানুষের চোখে যতই ঠুলি দেওয়ার চেষ্টা করুন, ভাড়া বৃদ্ধি করে পরে কমিশন বসানো তাদের কোন্ আইনশাস্ত্রে এর সমর্থন লেখা আছে এই প্রশ্ন আজ সবার মুখে।

উত্তর প্রদেশের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা ঘটছে তলে তলে এবং আরও ঘটবে, উড়িষ্যার নির্বাচনে নন্দিনী সৎপতিদের

কেন্দ্র করেও বহু ঘটনাই ঘটছে বাঁকা পথে। কিন্তু মানুষ আর ঘুমিয়ে নেই— সকলেই সজাগ হয়েছে, হচ্ছে ; একটা বিশাল বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে আছে আজকের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার। সেই বারুদে আগুন ধরাবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যারা, বঞ্চনার শিকার হয়েছেন কংগ্রেসী-সরকারের, বছরের পর বছর ধরে। (পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ উড়িষ্যা, আসাম, বিহার সকলেই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অন্যায় ভাবে শোষিত, বঞ্চিত।) বাস ভাড়া প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলার সচেতন মানুষের একটি সফল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

[(আর একটি প্যারাগ্রাফ আমার অরিজিন্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্টে ছিল, 'সত্যযুগ' পত্রিকায় পাঠাবার সময় সে অনুচ্ছেদটি দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই। যাহোক, সেটাও থাকলো বন্ধনীর মধ্যে)।

সংগ্রাম চলছে, সংগ্রাম চলবে। বাসভাড়া আন্দোলন অন্যান্য সংগ্রামেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, একটি ছোট্ট বিন্দু আগামী দিনে সিন্ধুতে পরিণত হবে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। বানার্জী কমিশনের পুনঃ নিয়োগে সিদ্ধার্থ রায়দের হাব ও জনগণের ফার্স্ট রাউণ্ড জয় হল। সেকেণ্ড রাউণ্ড ও জয় হবে এবং ফাইন্যাল সাফল্যও বেশীদূরে নয়। মানুষের চাপে বাসভাডা আন্দোলনেব পুরোপুরি জয় খুব শীঘ্রই হবে, আব এই আন্দোলনের জয় থেকেই সূচিত হবে বৃহত্তর আন্দোলন গুলির জয়]।   (প্রবন্ধটি সমাপ্ত)

—::—

(পাঠক, এর পরে বাসভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কয়েকদিনের টুকরো টুকবো সংবাদ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি উপরোক্ত প্রবন্ধে লেখা ভবিষ্যৎ বাণী গুলি কিভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, সরকার এ ব্যাপারে কিভাবে পিছু হটেছেন। এই খবর গুলি যুগান্তর. আনন্দবাজার, ষ্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি সব পত্রিকাতেই বেরিযেছে। অতএব আপনাদের সকলেরই জানা আছে। তাহলেও আমি সাহায্য নিচ্ছি সত্যযুগ পত্রিকারই)।

২৬।১২।৭৩ এর সত্যযুগ লিখছে : "ব্যানার্জী কমিশন প্রহসন মাত্র—নয়দল। বাড়তি ভাড়া ও চালের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক। কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর—নয়টি বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে আগামী শনিবার ২৯ ডিসেম্বর বিকেল চারটায় শহীদ মিনার ময়দান থেকে বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে এবং রেশনে চালের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি সমাবেশের ডাক দেয়া হয়েছে। ...আজকের বৈঠকে নয় দলের প্রতিনিধিরা ব্যানার্জি কমিশনের রিপোর্ট আলোচনার পর একটি বিবৃতিতে বলেছেন, কমিশনের সুপারিশ এবং কমিশনের পর্যালোচনা পরস্পর বিরোধী, ব্যানার্জী কমিশনের বর্তমান অধিবেশনকে নয় দলের নেতৃবৃন্দ 'প্রহসন' আখ্যা দিয়েছেন। ...বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, কমিশনের পূর্বতন রিপোর্টে বাসভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি দেয়া হয়নি। এখন কমিশন তাঁর পূর্বতন সুপারিশ পরিবর্তন করবে বলে মনে হচ্ছে। অথচ সরকার বর্ধিত ভাড়া চালু রাখতে বদ্ধপরিকর। বিবৃতিতে বর্ধিত হার প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়ে জনগণকে ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান হয়েছে··· ।"

২৭শে ডিসেম্বরের 'গণশক্তি'তে আছে : 'প্রাইভেট বাস বন্ধ : ষ্টেট বাস ডুমুরের ফুল : যাত্রীদের সীমাহীন দুর্গতি। বাড়তি ভাড়া বয়কট আন্দোলন চলছে'।

২৯শে ডিসেম্বরের 'সত্যযুগ বলছে : "ব্যানার্জী কমিশনের সুপারিশ জনস্বার্থ বিরোধী—নয়দল। কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর— নয়টি বামপন্থী দলের প্রতিনিধিরা ব্যানার্জী কমিশনের বাসভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত রিপোর্টটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কমিশনের সুপারিশ পুরোপুরি জনস্বার্থ বিরোধী, কমিশন সরকারী এবং বেসরকারী বাসের বর্তমান দুর্নীতি-পূর্ণ এবং অরাজক অবস্থা বজায় রেখে এই অন্যায়কারীদের অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ করে দিয়েছেন।..."

এবার শুনুন ৩০শে ডিসেম্বরের খবর : 'বাসে দশ পয়সা ভাড়া আবার চালু হতে যাচ্ছে…'।

৩১শে ডিসেম্বরের পত্রিকায় আছে : 'বাসভাড়া প্রতিরোধ আন্দোলন প্রত্যাহারের সম্ভাবনা নেই। কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর— ব্যানার্জি কমিশন অন্তবর্তী রিপোর্ট পেশ করে বাসভাড়ায় দশ পয়সার ষ্টেজ আবার চালু করার সুপারিশ করলেও অবিলম্বে এই সুপারিশ কার্যকরী করার পক্ষে যেমন অনেক অসুবিধা আছে তেমনি যে সমস্ত দল সংগঠন বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা তাঁদের আন্দোলনে 'আংশিকভাবে' খুশী নন বলে আন্দোলন প্রত্যাহারের সম্ভাবনা নাই।

ব্যানার্জি কমিশন দশ পয়সার যে ষ্টেজ চালু করার সুপারিশ তাঁদের অন্তবর্তীকালীন রিপোর্টে করেছেন তাতে আগে দশ পয়সায় যে দূরত্ব অতিক্রম করা যেতো এখন তা থেকে কম দূর পথ যাওয়া যাবে। অর্থাৎ আগে যেমন ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ১০ পয়সা ভাড়া ধার্য ছিল, নতুন সুপারিশে সেখানে ২ কিলোমিটার পর্যন্ত দশ পয়সা ভাড়া ধার্য করার সুপারিশ করা হয়েছে। …এদিকে নয়টি বামপন্থী-দলের প্রতিনিধিরা এই অন্তবর্তীকালীন রিপোর্টে খুশী নয়। তাঁরা যদিও মনে করেন যে সরকারকে জনমতের চাপে কিছুটা পিছু হটতে হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সুপারিশ করিয়ে গণ-আন্দোলনকে তাঁরা বিভ্রান্ত করতে চান। ব্যানার্জী কমিশনের যে রিপোর্টের ভিত্তিতে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে সেই সুপারিশ অসঙ্গতিতে ভরা।…'

২রা জানুয়ারীর যুগান্তরের সংবাদ : 'ব্যানার্জি কমিশন — ট্রামের ভাড়া বাড়াতে বলেছেন তবে এখন নয়। …বিনায়ক ব্যানার্জি কমিশন জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারকে এখনই ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ কার্যকর না

করার পরামর্শ দিয়েছেন। ...আজ থেকে দশ পয়সা বাসভাড়া চালু...'।'

২৬শে মার্চ, 'সত্যযুগ' এর খবর : '১লা এপ্রিল থেকে প্রথম শ্রেণী থাকবে না'। অর্থাৎ ফাস্টো কেলাসের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল।

[এর পরের খবর : জুলাই, ১৯৭৪-এ জোর করে ভাড়া আদায়ের জন্য সরকার পুলিশের ব্যবস্থা করেন কিন্তু 'বাস ভাড়া আদায়ে পুলিশ দিয়েও কাজ হলো না, তাই এ ব্যবস্থা বাতিল করা হলো।' (সত্যযুগ ১৫.৮.৭৪)]

'ল অ্যাণ্ড অর্ডার'

'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' নিয়ে মাতামাতি ব্রিটিশরা যেমন করেছে স্বাধীনোত্তর কালে কংগ্রেস সরকারও ২৭ বছর ধরে তাই করলো। শিক্ষাখাতে যেখানে খরচ হয় রাজস্বের মাত্র ১.৭%, পুলিশ আর সি. আর পি খাতে খরচ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। শিক্ষাখাতে রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা যেখানে কমপক্ষে জাতীয় আয়ের ৬% ব্যয় করে, সেখানে ভারতবর্ষে আজও মাত্র ১.৭%। ১৯৭০-৭১ সনে ৫৫০০ কোটি টাকার জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ১.৫৫% মানে ১.৭% এর চেয়েও কম। আইন যারা নিজেরা ভাঙ্গে, শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তারাই চিরকাল দেখালো অথচ জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে তাদেরই পয়সায় তাদের ঠ্যাঙ্গায় বুভুক্ষেরা যাতে কোনদিন তাদের স্বরূপ না বুঝতে পারে তার জন্য জনসাধারণকে অশিক্ষার পঙ্কে ডুবিয়ে রেখে। ১৯৫০ সনে কেন্দ্রীয় পুলিশ খাতে খরচা হত বার্ষিক ৩ কোটি টাকা, ১৯৭৩-৭৪ সালে সেইটে বেড়ে গিয়ে হয়েছে ১৩৫ কোটি টাকা।

এই 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' আনবার জন্য কংগ্রেসের কীর্তি সম্পর্কে বলতে গেলে ১৯৬০ সনে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বীকৃতিটি উল্লেখ করাই ভাল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন ২০০ বছরে ইংরেজ বিদেশীদের উপর যত গুলী চালায় নি, মাত্র ১৩ বছরে কংগ্রেস তার চেয়ে বেশী গুলী চালিয়েছে স্বদেশের লোকের উপর। এর মধ্যে আরও ১৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যেই হয়ত অহিংস-গুলীর সংখ্যা আরো দশগুণ বেড়ে থাকবে। সি.আর.পি খাতে একলা পশ্চিমবঙ্গে যে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রকে গুণতে হয় তাও নাকি ল অ্যাণ্ড অর্ডার রেষ্টোরেশনের জন্যই।

২১২। ৩০.১২.৭৩ এ লেখা।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী মুখার্জী ১৯৭২ এর এপ্রিল মাসে ১৯৪৯ সালের সি. আর. পি অ্যাক্‌ট (কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী আইন) বেআইনী অর্থাৎ অবৈধ এই রায় দিয়েছেন। এই বেআইনী পুলিশবাহিনী পশ্চিমবঙ্গে কয়েক বছর ধরে অবস্থান করছে কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণে, এদের খোরপোষ এ প্রদেশের লোককেই বহন করতে হচ্ছে— আজব বটে 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' আইন-শৃঙ্খলারক্ষার ডেফিনিশনটি। তিনটি জিনিস কিন্তু সত্যি—(১) এই সি. আর পি বাহিনী দলে দলে এ রাজ্যে প্রথম আসে অহিংস গান্ধীবাদী নেতা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের পি. ডি. এফ এব আমল থেকে প্রথম যুক্তফ্রণ্টেব পতনের মুখে মুখেই, (১) দ্বিতীয় ইউনাইটেড ফ্রণ্ট রাজত্বে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু এদেব ব্যারাকে ফেরৎ পাঠিযে দেন এবং সি আর পি বাহিনী ফেরৎ নেবার জন্য কেন্দ্রকে বলেন। এতে গান্ধী-অহিংসবাদীদেব পিলে চমকে যায় এবং নানাবিধ প্রবোচনামূলক কাজ দ্বারা — প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ কাজ দ্বাবা — যুক্তফ্রণ্ট[২১৩] ভাঙ্গতে সমর্থ হন তারা। পবর্তী সময়ে সি. আর. পি বহু তাজা তাজা সুন্দর সুন্দর ছেলে, বারাসত-বসিরহাট থেকে আরম্ভ করে বরানগর-কসবা-সোনারপুর প্রভৃতি স্থানের ছেলেদের রক্ত চোষে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগ গান্ধীজীর কংগ্রেস আনবে বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রমুখ দলের মাধ্যমে, এ আর আশ্চর্য কি? (৩) ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারত শাসন আইন অনুসারে পুলিশ রাজ্য সবকারের এক্তিয়ারে পড়ে। 'তাই ১৯৪৭ সালের ভারত (স্বাধীনতা) আদেশ বলে প্রদত্ত ক্ষমতানুযাযী গণ পরিষদের ১৯৪৯ সালের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিসবাহিনী আইন পাশের এক্তিয়ার ছিল না।' ইংরেজের 'Crown

---

২১৩। যুক্তফ্রণ্ট ফ্ল-লেশ ছিল, কোন ভুল ভ্রান্তি অন্যায অপকর্ম ছিল না এটা বলা ঠিক নয। তবু নিজেদের কর্মসূচী কোন্ কোন্ পার্টি জানবাব চেষ্টা করেছে, কারা ভেঙ্গেছে এটা বোঝা গিয়াছে বৈকি।

Reserve Police' কংগ্রেস আমলে নাম পেল Central Reserve Police. 'বিচারপতি এরই ওপর বিচার করে ১৯৪৯ এর এই আইনটি বিধি-বিরুদ্ধ ও সংবিধান-বিরোধী বলে রায় দিয়েছেন। পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে রাজ্যের বিষয় হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার বারবার রাজ্যের এই অধিকারে জবরদস্তি হস্তক্ষেপ করেছে। কেবালায় ই এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের মন্ত্রীসভাব আমলে সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটের সময় কেন্দ্রের নির্দেশে রাজ্য মন্ত্রীসভা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন পুলিসী ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায়, রাজ্য সরকারের সম্মতি না নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে সি. আব. পি পাঠায়'। (পেটে খেতে না দেবার কেউ হলেও, পিঠে কিল মারবার গোঁসাইরা তাই চিরকাল ধবে করে আসছেন—লেখক)। 'পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এরাজ্য থেকে সি. আর. পি সরিয়ে নিতে বলা সত্বেও কেন্দ্র ঐ বাহিনী অপসারণে রাজী হয় না। বরং ঐ মন্ত্রিসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে আরও সি. আর. পি এ রাজ্যে পাঠাতে থাকে। এখন দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকাব সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে রাজ্যের কাজে হস্তক্ষেপ করে চলেছে।' ('কেন্দ্রের বে-আইনী হস্তক্ষেপ' নামক সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য, 'গণশক্তি' ২০-৪-৭২)। ১৯৭২ এর মার্চে ইন্দিরা-গান্ধীপন্থী সরকার পশ্চিম-বাংলায় ছলে-বলে কৌশলে স্থাপনার অব্যবহিত পরেই বিচারপতি ঐ ঐতিহাসিক রায় দেন কিন্তু অবাক হতে হয় দেখে যে আজ ১ বছর ৯ মাস প্রায় হতে চললো কিন্তু বক-ধার্মিকেরা নানা অজুহাতে এই বে-আইনী হস্তক্ষেপ করে এখনও সি আর পি পশ্চিমবাংলায় রেখেছে—তাদের নিজেদের তৈরী আইন তাও তারা নিজেরাই মানে না, সেটা যতক্ষণ তাদের ফেভারে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আইনকে সম্মান দেয়, যে মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে যায়, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তারা এর বিপক্ষে যায়। ফলে সি. আর. পি আইন বিচারপতি বে-আইনী বলে রায় দিলেও সেই পুলিশবাহিনী এখানে বহালতবিয়তেই আছে। এই

সি আর পি বাবদ আমাদের খরচ ৭ কোটি টাকা। পশ্চিমবাংলার টাকায় ঐ বাহিনী খাবে পড়বে আর পশ্চিমবঙ্গের লোককে অন্যায় ভাবে পেটাবে। সারা ভারতে সি আর পি খাতে যত খরচ হয় তার শতকরা ২০% (এক-পঞ্চমাংশ) পশ্চিমবঙ্গের, অথচ প্রদেশ কিন্তু ১৬টি। পরবর্তী সময়ে মিসা আইনেব ১৭(ক) অবৈধ বলে বিচারপতি রায় দিলেও একই ভাবে গায়ের জোরে তারা এ প্রদেশের লোকদের মিসায় গ্রেপ্তার করছে এখন পর্যন্ত। এ সম্পর্কে "পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ' এর ভাষায় বলছি: 'মহাশয়, ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক 'মিসা' আটক আইনের ১৭(ক) ধারা সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও—আজও পর্য্যন্ত এই কালা কানুনকে বাতিল করা হয়নি। এমন কি সুপ্রীম কোর্টের রায় সত্ত্বেও—হাজাব হাজার বন্দীকে আজও আটক করে রাখা হয়েছে অথবা ছেড়ে দিলেই জেল গেটে অন্য ধাবায বা সাজানো কেসে আবার আটক করা হচ্ছে।

এই সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ও জংলী আইন 'মিসা' বাতিল ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ১৮ই মে, ১৯৭৩ শুক্রবার বিকাল ৫টায় শহীদ মিনার ময়দানে আমরা এক জনসভা আহ্বান করেছি। এই সভায় একজন গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসাবে আপনার উপস্থিতি আমরা বিশেষ ভাবে কামনা কবি।" এই মহতী জনসভায় প্রধান আইনজ্ঞ সি. পি. এম এম পি শ্রীশশাঙ্ক শেখর সান্যাল[২১৪] বলেছিলেন মিসা নয়, মিসা নয, এর নাম 'মিছা আইন।'

২১৪। 'কংগ্রেস-পি. ডি এফ—বর্তমানে কি জানিনা' নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এঁর দাদা। বর্তমানের রাজনীতিতে সি. পি. এম দলের প্রবীণ শ্রদ্ধেয় এই নেতার দান অতুলনীয়। গত তিন বছরে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এঁর কযেকটি চিঠি যারা পড়েছেন তারাই জানেন ভারত-বর্ষের ভবিষ্যতের ইতিহাসে ঐ পত্রগুলো বিশেষ গৌরবময় স্থান অধিকার করে থাকবে। পত্রগুলো আমরা দেখেছি 'সাপ্তাহিক বাঙলা দেশে'র পাতায়।

এর পরেও বহু সময় পেরিয়েছে, সাধারণ মানুষের উপরে ঐ মিছা আইনটি চেপেই বসে আছে।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সত্যযুগে প্রকাশ যে 'টেক্সম্যাকোর শ্রমিক নেতা নিরঞ্জন বসুকে মিসায় গ্রেপ্তার' করা হয়েছে বে-আইনী ঘোষণার ৭৷৮ মাস পরেও।

গভর্ণমেণ্টের চাকুরেদের অফিস-কোডে C.C.R বলে একটি কথা আছে। Confidential Character Roll এর abbreviation এটি। উর্ধতন অফিসার তার অধঃস্তন কর্মচারীদের বৎসর শেষে কাজকর্ম দেখে কন্‌ফিডেনশিয়াল রিপোর্ট আরও উপরে পাঠান। সেই রিপোর্টের উপর নির্ভর করে অধঃস্তন কর্মচারীটির চাকরী-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রমোশন-ডিমোশন, বাৎসরিক ইনক্রিমেণ্ট অথবা তার স্টপেজ ইত্যাদি ঐ রিপোর্টেরই ফলশ্রুতি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে ওপর তলার অফিসারটি যদি নিজে হন দুর্নীতিগ্রস্ত অথবা অপদার্থ তাহলে তাঁর সার্টিফিকেট দ্বারা নিম্নতর কর্মচারীর চাকরীজীবনের চারিত্রিক স্বচ্ছতা এবং যোগ্যতা কিভাবে প্রমাণ হবে? সৎ কর্মচারীতো দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারের চক্ষুশূল হবেন, যোগ্য লোকই অযোগ্য ওপরওয়ালার অস্বস্তির কারণ হবে। পুলিশ ভেরিফিকেশনের পরে চাকুরীয়াকে তার নতুন চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি যেমন একটি অবাস্তব ও অন্যায় নিয়ম—যে নিয়ম দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট আসবার পরে সে সরকার তুলে দিয়েছিল এবং যে বেনিয়ম সিদ্ধার্থ সরকার আবার চালু করেছে ১৯৭২এ — ঐ C.C.R টিও সেইরূপ অন্যায়কারীদের আরো অন্যায় করবার অস্ত্র হিসাবে কাজ কর্বার সুযোগ দেয়। সে যাক্, একটা কথা কিন্তু এতে উল্টোভাবে প্রমাণ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার যে অফিসারের বিরুদ্ধে খারাপ রিপোর্ট দেয় নিঃসন্দেহে সেটা মোটিভেটেড এবং অনেক সময়ই সৎ সার্টিফিকেট পাবার উপযুক্ত ধরে নিতে হয়। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস—গণিতের এই সহজ সূত্রটি

স্কুলের ছাত্রদেরও জানা আছে। কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রীরা—প্রধান-মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা পর্যন্ত—বিরোধীদের বিপক্ষে বিষোদগার করেন—বিরোধীরাই যে দেশের গরীবী হটাতে বাধা দেয় এটা তারা হরদমই বলেন, দেশের সর্বরকম অবনতির জন্য একমাত্র বিরোধীরাই দায়ী তাদের মতে। যে সরকার অবৈধ আইন নিয়ে বছরের পর বছর চলেন, সেটি বে-আইনী বলবার পরেও (বিচারপতির রায় দানের পরেও) তা রেখে দেন !

তাজ্জব বটে এদেশের 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার !'

এতদিনে মানুষের কাছে অবশ্য স্বচ্ছ হয়েছে আইন শৃঙ্খলারক্ষা-কারীদের চরিত্রগুলো।

লেনিন ও গান্ধীজি[২১৫]

গান্ধী ভক্তরা ইদানীংকালে (১৯৭০-এ লেনিন জন্মবার্ষিকীতেই সম্ভবতঃ প্রথম) লেনিনের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করেছেন। গান্ধীজিকে বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত করে বিশ্বের মহান বিপ্লবী লেনিনের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে তাঁকে হয়ত সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন ওরা—ইদানীং লেনিনের নাম চারদিক থেকে শুনে শুনে মাথাটা ঠিক না রাখতে পারারই কথা। লেনিনকে 'উপদ্রবকারী' ভাবতেন মহাত্মাজী, এখবরটা হয়ত তাদের জানা নাই। যাকগে, 'আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়', গান্ধীজীকে যতই এলিভেট করার চেষ্টা করুক তাঁর সত্তর দশকের স্তাবকেরা, লেনিন আর মোহনদাসে যে আসমান-জমিন ফারাক এযুগের সজাগ মানুষেরা (চোখ কান বুঁজে যারা দিন কাটাচ্ছেন তারা ছাড়া) বুঝেছেন ঠিকই এতদিনে। তিরিশের দশকের শেষভাগের গান্ধীবাদীরা হঠাৎ ফ্যাসিবাদী 'হিটলারে'র সঙ্গে তাদের দেবতা সদৃশ্য নেতাকে তুলনা করে বসেন। এ সম্পর্কে 'ফ্যাসিষ্ট বিরোধী রবীন্দ্রনাথ' লিখতে গিয়ে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"একদিন যখন কন্‌গ্রেস থেকে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে বহিস্কৃত করলেন, তখন কংগ্রেস সদস্যগণ গান্ধীকে হিটলার এর সঙ্গে তুলনা করে জয়ধ্বনি তুললেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'পৃথিবীতে যে-দেশেই যে-কোন বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভেতরে ভেতরে নিজের মারণবিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্‌পিরিয়ালিজম্ বলো, ফ্যাসিজম্ বলো, অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাস নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কন্‌গ্রেসের অন্তঃ সঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। ·· ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তি পূজার বেদী গড়ে

২১৫। ২. ১. ৭৪ এ লেখা।

উঠেছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তরা মুসোলিনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন?" (মাসিক বাঙলাদেশ, বৈশাখ ১৩৮০ রবীন্দ্র সংখ্যা)। মহাত্মাজীকে সমালোচনা করে প্রবীণ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই সময় লিখেছিলেন 'তিনি থাকিবেন কংগ্রেসের বাহিরে, কাহারও কাছে দায়ী হইবেন না অথচ সর্বেসর্বা হইবেন ইহা বাঞ্ছনীয় নহে'। (নেপাল মজুমদার রচিত 'ত্রিপুরীর প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ', মাসিক বাঙলাদেশ পৃঃ ১০২১ দ্রষ্টব্য)। তা ঘটনা তো তাই ছিল, তিনি কংগ্রেসের কেউ ছিলেন না এমন কি চার আনার সদস্যও নয়, অথচ 'Entire intellect of the Congress has been mortaged to' him. ডিকটেটার এর আর কি ডেফিনিশন হয়? সুভাষচন্দ্র বিতাড়ন গান্ধী 'শক্তি পূজার বেদী'তে তাই সম্পাদন হয়েছিল। কবিগুরু যদিও 'মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত' করেছিলেন বলে মনে করেছিলেন, আজ আমাদের মনে হয় সেদিনকার গান্ধী ভক্তদের অবচেতন মনের প্রতিফলনটা সঠিকই হয়েছিল— ডিক্‌টেটর গান্ধী ও মুসোলিনি-হিটলারের মত ডিকটেটররা উভয়তঃ তুলনাযোগ্য বই কি! গান্ধীজিকে বিন্দুমাত্র অসম্মান করেন নি তাঁর অনুরক্তেরা। তাঁকে কম্‌প্লিমেণ্ট ঠিকভাবেই তাঁরা দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা।[২১৬]

'স্বাধীনতা' হীনতায কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায হে, কে পরিবে পায়' ? কবি রঙ্গলালের এই কবিতার প্রয়োজনীযতা ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রে শেষ হয়ে যায়নি, বস্তুতঃ সে'দন থেকে গোটা দেশটা নতুন একটি শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে। যা আমাদের সেদিন মিলেছিল, স্বল্পবুদ্ধি আমরা সেদিন বুঝিনি, ভাববিলাসী বাঙ্গালী আমরা অনেক কিছুর বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে বৃহত্তর স্বার্থে সাদরেই গ্রহণ করেছিলাম, তবে এটা যদি স্বাধীনতা হয় তাহলে পরের অধীনতা জিনিসটা যে কি বস্তু আজ তা' বোঝার সময় এসেছে।

'যেমনি চালাও, তেমনি চলি, তুমি রথ, আমি রথী' এই আত্ম-সমর্পণের ভাব নিয়ে ২৭ বছর ধরে চোখে ঠুলি, কানে ছিপি দিয়ে বসে থাকার পর আজ স্বাধীনতার ডেফিনিশনটা জানবার জন্য অভিধানটা নতুন করে খুলে দেখবার প্রয়োজন এসেছে। আজ রাত্রে তেল দশ টাকা, তো কাল সকালে তের টাকা, ডালডা বাজারে নাই অথচ আছে, চিনি এভাব-ডিউ স্লিপে পেলেও কর্তাদের আকাঙ্খা নয় তার সফেদ চেহারাটার সাথে আপনাদের আর পরিচয় থাকে পাছে কালোর (কালোবাজারীর) আইডেনটিফিকেশনের জন্য 'সাদা'র আসল রংটা আপনার মনে গেঁথে যায় তাই হোয়াইট-সুগারের ব্ল্যাকে (সরকার কালোবাজারীদের পছন্দ করেন না,[২১৭] অতএব আমার ব্ল্যাক কথাটা

২১৬। ২৭-২-৭৪এ লেখা

২১৭। ক) দেওয়াল লিখন: 'চোরাকারবারী, ভেজালদারদের মৃত্যু দণ্ডের দাবীতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) বিধানসভা অভিযান সফল করুন।' যুব কংগ্রেস।

খ) 'ভেজালদার চোরাকারবারীদের স্বার্থে সি. পি. এম এর ডাকা বন্ধ ব্যর্থ করুন।' ছাত্র পরিষদ।

কিন্তু হিসাবে ধরবেন না) অবস্থানের মাশুল, দুই হতে পঞ্চমুদ্রা।[২১৮] (কিলো প্রতি) আপনাদের গুণতে হবে, 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, ওদের যত্ন নিন' মার্কা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর সাইনবোর্ড দেখেও সন্তুষ্ট না হয়ে আপনি যদি এখনও বেবীফুড এর জন্য ক্রাই করবার আকাঙ্খা রাখেন তবে তো স্যার, দেশপ্রেমিকদের অধীনে একটু যেতেই হবে। আপনার স্বদেশীয় স্বজাতিরা নিজের সপেল-এ দাঁড়িয়ে যা কিছু করেন সে তো আপনার জন্যই। অতএব তাদের কথার ও বার্তার, চালের এবং চলনের অধীন হয়ে একটু থাকতে হবে বৈকি! তাদের সেফ কাস্টোডিতে রাখা 'আমুল'টি তো আপনার সন্তানের জন্যই মজুত আছে, শুধু একটু গোপনে আধা প্রকাশ্যে ফিস ফিস করে কথা বলে ব্যবস্থা করে নিলেই হল।

বিবাহিতা রমণীর পরপুরুষ চিন্তা নাকি পাপ, সেটা অসতীর লক্ষণ। তা স্বামী দেবতাটি যদি হন লম্পট, পত্নীর দুবেলা দুমুঠোর ব্যবস্থার চেয়ে যদি তাঁর রক্ষিতার সিল্কের শাড়ী সাপ্লাই এর দিকে মনোযোগ বেশী দেখা যায়, তবে নিছক তনুরক্ষায় কোন সহানুভূতি-সম্পন্নের সাহায্য নিয়ে তার মধ্যে কিছু মনের পরশ খোঁজবার আকাঙ্খা সেই বঞ্চিতা রমণীর পক্ষে একটি স্বাভাবিক ঘটনা।[২১৯] সেইরকম ১৪ টাকা কিলো মাছ, আর আড়াই টাকা কিলো কড়াইশুঁটিকে সামনে নিয়ে মনটা একটু ওদিক ছুটবেই; তাই তো নিষিদ্ধ বিরোধীপক্ষদের কথাবার্তা অত্যাচারিত অবহেলিত মানুষের মন এত বেশী করে টানতে সুরু করেছে। দেশপ্রেমিকরা যতই বিরোধীপক্ষই দেশের সব দুর্দশার

২১৮। আজ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪—এই মাত্র খবর মিললো বাজারে চিনির দাম ছয় টাকা কিলো। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কান্তি ঘোষের চিনির ডিউ স্লিপের কি অপার মহিমা!

২১৯। তবে তিনি চরিত্রহীনা কিনা, এ প্রশ্নের জবাব 'চরিত্রহীন' লেখক শরৎচন্দ্রের নিকট হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গজদের অনেকের পক্ষেই দেওয়া মোটেই শক্ত নয়।

মূল বলে স্পীচ দেন, ইদানীং মানুষ ওঁদের কথায় আর আগ্রহ খুঁজে পাচ্ছেন না।

১৯৭২ এর মার্চের পর থেকে এই দুবছরে জিনিস পত্রের দাম যা' বেড়েছে এরকম আগে কখনও দেখা যায় নি। যে গোষ্ঠীর হাতে বাজারটার এই অবস্থা, তাদের কাছেই সাধারণ মানুষ আজ পরাধীন। এই যুপকাষ্ঠ থেকে মুক্তি চায় জনসাধারণ।

নদের নিমাই প্রসঙ্গে[২২০]

১৯৭১এ যেদিন দ্রৌপদীর গোঁসা লিখি সেদিন কাশীকান্ত মৈত্রকে বিশেষ চিনতাম না—শুধু জানতাম হাইকোর্টের উকিল, নামকরা উকিল আর নদীয়ার সুনামী বিশিষ্ট জমিদার লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের ছেলে। সাকসেসফুল ল-ইয়ার হতে কতটা তাঁর বাবার নাম, পারিবারিক প্রতিষ্ঠা কাজ করেছে আর কতটা নিজের এলেমে হয়েছে এ বিচার করতে বসার সেদিন কোন কারণ দেখিনি। সত্যিকথা বলতে কি, ১৯৭০এ হাইকোর্টে একদিন দেখা ছাড়া ভদ্রলোক সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। তবু আমি 'দ্রৌপদীর গোঁসা'য় ওঁকে নিয়েছিলেম, তাঁকে ছাড়া ১৯৭১-এর অজয় মুখার্জীর সংসার পূর্ণরূপ পেত না। শুধু অজয় মুখার্জীর সঙ্গে ঘোরাফেরা করা, নির্বাচনী সভা করা (কৃষ্ণনগর, বহরমপুরের যে সব সভায় মাঝে মাঝে পটকা-টটকা ফেটেছে) দেখে এটুকু মনে হয়েছিল আর যা' হোক, ভদ্রলোকের ভেতরে সার পদার্থের বেশ কিছু ঘাটতি আছে। তাই সেদিন মৈত্র মশায়কে দ্রৌপদী-পরিবার ভুক্ত করে নিয়ে অল্প কিছু লিখেছিলেম ব্যঙ্গ করে। পরবর্তী সময়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক সোস্যালিষ্ট পার্টির নায়ককে শুধু লক্ষ্য করেছি দূর হতে।

প্রিয়দর্শনের খ্যাতি আমার নেই, দূরদর্শী একথাও খুব একটা কেউ বলে না, নিজের কাজকর্ম ছেড়ে আবোল-তাবোল (!) জিনিষ নিয়ে অনেক সময় কাটানো দেখে আমার বুদ্ধির উপর ভরসা বড় কেউ একটা রাখেন না। আমার অনেক কথাই অনেকের কাছে 'খাপছাড়া' বলে মনে হয়, তাই আমার অনেক নির্ভেজাল শ্রমের সাবজেক্ট-ম্যাটার দেখে তাদের মনে ভাসে 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে' মাতা-

২২০। ৭ই জুন, ১৯৭৪ এ লেখা।

মাতির কথা, ফলে বে-হিসেবী সংসারী জীবটির সার্টিফিকেট মেলে 'পণ্ডশ্রমের'! হিসাবী সুহৃদদের কখনও বোঝাতে পারিনি যে 'খাপ-ছাড়া বঙ্গসন্তান'দের জীবনভোর পরিশ্রমের প্রায় সবটাই তো আখেরে 'পণ্ডশ্রম' মাত্র!

বিশেষ কিছু না জেনে শুধু '৭০-৭১ এর চলাফেরা দেখেই উকিল সাহেব সম্বন্ধে যে অ্যাসেসমেণ্ট করেছিলাম, পরবর্তী সময়ে ৭২-৭৩ এ নানান ঘটনায় তার সমর্থন পাওয়া গিয়েছে দেখে নিজের উপর হালে শ্রদ্ধা এসেছে, জীবনে অন্ততঃ একটি মনুষ্য-চরিত্র আমি সময়ে অথবা সময়ের আগেই ধরতে পেরেছি। [যে অতি-বুদ্ধিমানেরা আমার সরল বিশ্বাসী অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মনটাকে চিরকালই বোকা ভেবে আনাচে কানাচে হাসহাসি করলো, তারা যদি আমার হালের এই দূরদর্শী-বুদ্ধিমত্তার কথাটা জানতে পারতো!] 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের প্রয়োগে' এর প্রণেতার দুর্নীতির ধাক্কায় দুর্নীতিকে থোড়াই কেয়ার-করা সিদ্ধার্থ সরকারকেও হেলে পড়তে হয়েছিল প্রায়। সাংবাদিক হলধর পটলের মসী-অসির ক্ষমতায় রায় মন্ত্রীসভার পটল-প্রাপ্তির অবস্থাই এসেছিল ১৯৭৩ এর জুলাই, আগষ্টে— সেটা অবশ্য সামলে ওঠা গিয়েছে দুর্নীতিবাজ খাদ্যমন্ত্রীকে বিতাড়ন করে যদিও বহু লোকের (আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকার পাঠকেরাই এর মধ্যে বেশী ধারণা যে কাশীকান্ত বাবু খুব নীতি বাগিশ সৎ লোক তাই মন্ত্রীত্ব ছাড়তে বাধ্য হলেন, অসৎদের সাথে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। ওঁদের এই ধারণা যে ১০০% ভুল সে কথা বোঝাতে গেলে তথ্যভিত্তিক খবর পরিবেশন করতে হয়। আমি সাংবাদিক নই— তথ্য দিতে হলে হলধর পটল মহাশয়ের বহু কষ্টার্জিত সংবাদ-গুলোই 'সত্যযুগে'র পাতা থেকে চুরি করে নিতে হয়।[২২১]

২২১। এই দুর্নীতিগ্রস্ত অথচ ন্যায়নীতির বক্তৃতা-বাগীশ মন্ত্রী মহোদয়কে নিয়ে 'সত্যযুগ' পত্রিকা বিভিন্ন দিনে যে কাশীকান্ত-মহাভারত লিখেছেন তা

ভূমি-মন্ত্রী ভূমির কালোবাজারীর মাষ্টার প্ল্যানও ফন্দাও কারবারেই শুধু খুশী ছিলেন না, যতদূর মনে আছে ১৯৭২ এর মার্চে মন্ত্রীত্ব নেবার মাস দেড়েকের মধ্য থেকেই তাঁর পেটোয়া লোকদের চাকরী দেওয়া

এখানে লেখার চেষ্টা করা বাতুলতা। সে চেষ্টা অতএব করছি না। তবে কথঞ্চিৎ ধারণা দেবার জন্য বলি: ২৭শে এপ্রিল ১৯৭২ এর 'সত্যযুগ' খবর দেয় 'সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের প্রচলিত সমস্ত নিয়মকানুনকে সুকৌশলে এড়িয়ে পশ্চিম বাঙলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র' (মন্ত্রিত্ব মেলবার দেড় মাসের মাথাতেই) 'নিজের লোকজনকে খাদ্য বিভাগে নিয়োগের এক পরিকল্পনা করেছেন।' ইন্টারভিউ না নিয়ে ১৩৮ জনের চাকরি এই খাদ্যমন্ত্রীই তাঁর দলীয় লোকদের দেন এটাও পত্রিকা ছাপিয়েছিল ১৫.১১.৭২এ। 'কাশীবাবুর খাদ্যদপ্তর' নিয়ে ধারাবাহিক লেখা, 'চোরের মায়ের বড গলা' নামক ধারাবাহিক লেখা, 'সাবাস কাশীকান্তবাবু', 'কাশীকান্তের অদ্ভুত সাফাই' 'ভূমিমাল বিদায় হোক' সবগুলোই ঐ বাক্যবাগীশ (এবং কর্মবীরও বটে) ভূমিমন্ত্রী 'ব্যাসকাশী বাবু' সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত হলধর পটল 'ভূমি কেলেঙ্কারী' নাম দিয়ে ৬৮ পৃষ্ঠার একটি বইও প্রকাশ করেন ১৯৭৩এ। নামকরা উকিল কিন্তু মানহানির কেস করেন নি, গাউন গায়ে দিয়ে নিজের কেসের সওয়াল করেন নি নিজের সুপরিচিত উঁচু-আদালত অট্টালিকার কক্ষে যদিও গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন অনেক। হলধরবাবু বলেছেন 'অত্যন্ত দাম্ভিক, কাশীবাবু পণ্ডিত। যথেষ্ট পড়াশোনা তিনি করেছেন। পাণ্ডিত্য তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রকে দিয়েছিল বিনয়, স্পষ্ট ভাষণের সাহস, মানুষকে শ্রদ্ধা করার উদারতা আর কাশীকান্তকে দিয়েছে অতিরিক্ত দম্ভ, মিথ্যা ভাষণের কৌশল এবং মানুষকে ছোট করে দেখার সঙ্কীর্ণতা।' ভূমি কেলেঙ্কারী' পৃঃ ৭।

এ সত্ত্বেও 'চোরের মায়ের বড় গলা' ১৯৭৪ এর শেষেও শোনা যায়। 'কংগ্রেস দল কিছু লোভী, স্বার্থপর ও আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির আখড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে' (২৭.১২.৭৪ সাপ্তাহিক বাঙলাদেশ) এই কথাটি কাশীকান্ত মৈত্রের কাছ থেকে শুনতে হয় পশ্চিম বাংলার লোককে। "কংগ্রেস দল আজ মোসাহেবের দলে পরিণত হয়েছে। শ্রীমৈত্র একে 'হেঁ হেঁ পার্টি' বলে অভিহিত

শুরু ক'রেছিলেন সরকারী আইন কানুনের প্রতি নির্মমভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। গত ২৭ বছরে বহু মন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে, কিন্তু দি গ্রেট ল-ইয়ার মিঃ মৈত্র এর মত এত বড় মতলববাজ স্বার্থান্ধ মন্ত্রী আর কখনও এরাজ্যে দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। একলা কাশীকান্ত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তরটাকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছিলেন।

যাক, আজ ঐ ভদ্রলোক সরকারে নেই, তিনি এখন আইনের পরামর্শ দেন 'বাঙ্গালদের হাইকোর্ট' বিল্‌ডিংএ এসে। লোকে বলবে যে চলে গিয়েছেন তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? বাঙ্গালী-লোকগুলোর এই কথাটাই আমার বোধগম্য হয় না। যখন যে থাকে সামনে, তাকে নিয়ে প্রচণ্ড হৈচৈ চায়ের আসরে, এমন কি রাত্রে রুটি চিবোবার সময়েও, অথচ পরবর্তী সময়ে 'আউট অব সাইট তো একদম আউট অব মাইণ্ড'। তাদের 'অজয়দা' এখন আর তাদের কেউ না অথচ কত রঙ্গই করলেন এবং সেদিনকার বঙ্গে আর 'মুজিব'ও ঐ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ পর্যন্তই, অর্থাৎ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের মিটিঙের জের টেনে সাতই এর সকালটাতে থাকলেও ৮ই থেকেই আসর জমানো বাক্যবাগীশদের কাছে তিনি একদম নির্জীব।

কথাটা বলবার কারণ আছে। প্রফুল্ল ঘোষ, অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়া, কাশীকান্ত মৈত্ররা বিভিন্ন সময়ের হিরো, গোষ্ঠী স্বার্থান্বিত সংবাদপত্র গুলোর কেরামতি সেটা। তাদের নিয়ে বিপ্লবী-জ্ঞানী গুণীরা নিজেরা নাচেন অন্যকে নাচান কিন্তু পরবর্তী সময়ে একদম ভোলেন। কিন্তু ভোলবার বস্তু এটা নয়, ভোলা অপরাধ। ঘোষ-মুখুজ্যে-মৈত্ররা সরকারী মেসিনারীটা হাতে নিয়ে দেশের যে ড্যামেজ করেন তার কালেকটিভ ফল আমাদের সারাজীবন ধরে

করেন।" অথচ আমরা জানি প্রতাপ সেনগুপ্ত, অরুণ দাশগুপ্ত প্রমুখ গণ্ডা কয়েক মোসাহেবদের নিয়েই মৈত্র মহাশয় ভূষির কালোবাজারীর পত্তনটা সেদিন করেন।

ভুগতে হয়। তাঁরা সরকারে না থাকলেও তাঁদের অপকীর্তি গুলি সরকারী মেসিন গুলোতে ডিম পাড়ে। পশ্চিমবঙ্গটা যে আজ ধুঁকছে, তার যে বর্তমানের দুঃসহ যন্ত্রণা— এতো ঐ কীর্তিস্মানদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কুকীর্তিরই ফল। অথচ কাশীকান্ত মৈত্ররা আজও বিপ্লবীর হুঙ্কার ছাড়েন। সাংবাদিকরা তাঁর কাছে যায় আর উকিল সাহেব তত্ত্ব[২২২] আর তথ্যের ফাইল দেখিয়ে বলেন: কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করছে। [এই তো সেদিন, মার্চ-এপ্রিলে কবে যেন, ৪৪-২৫ জনের এম. এল. এ. বাহিনী (খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ সহ) দিল্লীতে গিয়ে মন্ত্রীদের পারিবারিক সংবাদপত্রে (যুগান্তর) ফটো তোলালেন, কেন্দ্রের কাছে খাদ্য নিয়ে দরবার করতে গিয়েছিলেন, তারই ২১ দিন পরে হবে] অথচ '৬৭-'৬৯-'৭১ এমনকি '৭২-এও যারা অনুরূপ কথা বলেছিলেন সেই সি. পি আই (এম) এর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছেন: ওরা দেশের সংহতি নষ্ট করছে। ন্যাকামি আর কাকে বলে? ধাপ্পাবাজ খুঁজতে কি দুর্নামী রকে যেতে হয়? কলকাতা-২৯ আর কলকাতা-১ এর নামকরা অট্টালিকা গুলো কি শুধুই মাত্র ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির গুলোর বাসস্থান, কর্মস্থান?[২২৩]

২২২। লোকে বলে ইনি নাকি বড় তাত্ত্বিক। খাদ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের আমলে অনেক অনেক তত্ত্ব দিয়ে প্রায়দিনই বিধানসভায় বর্তৃতার ফুলঝুড়ি দিয়ে তাঁকে ঘায়েল করতেন।

২২৩। যতই চ্যাচাই আর ভ্যাবাই এরাই পশ্চিমবঙ্গের আসল সমাজ। বহুদিন ধরে আছেন, কতকাল থাকবেন জানিনা। পরিত্রাণ কেমনে, কে বলিতে পারে? কে বাঁচাবে বিশ্বের নামী ভিখারীদের? কি বলছেন, গীতায় বলেছে: 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে?' আরে ছোঃ, গীতা যেন আমি পড়িনি! বহুকাল ধরে তো শুনছি আপনাদের বড় বড় হেঁয়ালীমার্কা নেতিবাচক জ্ঞানগম্যির কথা, স্বর্গ থেকে কে যেন কোন্ মহাপুরুষ কবে যেন এই কাপুরুষদের দেশে এসে সকলকে ত্রাণ করবেন, তা ওগুলো ছেড়ে সহজ সরল ইতিবাচক হতে পারেন?

'সুভাষচন্দ্রের মাত্রাহীন অবমাননা'[২২৪]

১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারীতে, সিকি শতাব্দীর উপর ধরে যে আজকের 'শিশুরাষ্ট্র' চলছে, সেই শিশু রাষ্ট্রের প্রথম নেতাজী দিবস পালনের কথা, তা সেদিনকার কথা প্রধানমন্ত্রীর সুহৃদ যশস্বী 'আয়রণ ম্যান'[২২৫] সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের 'অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো' কিভাবে পালন করেছিল তার ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন সুধী প্রধান[২২৬] তাঁর 'স্বাধীন ভারতে বেতারে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন পালনে নেহেরু-প্যাটেল সরকারের ভূমিকা' নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে 'মাসিক বাঙলাদেশ, দীপাবলী সংখ্যা'র পৃষ্ঠায়। তার অংশ-বিশেষ তুলে ধরছি পরে, আগে বলা দরকার যে নেতাজীর জন্মদিবসে সেদিনের পুলিশ-মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা প্রচার রেডিয়ো থেকে হলেও নেতাজীর নাম রেডিয়োতে নাম মাত্রই স্থান পেয়েছিল সেদিন। সংগঠন কংগ্রেসের ফলশ্রুতি আজকের সবুজ-বিপ্লবী কংগ্রেস, পুরাতনই আজ নবরূপ ধারী,— ওল্ড ট্র্যাডিশন তাই আজও সমানে চলেছে—মাঝে মাঝে নেতাজীর নাম প্রয়োজনের খাতিরে নিলে। ১৯৭৪ এর জানুয়ারীতেও নেতাজী দিবস স্বীকৃতি পায় না কেন্দ্রীয় সরকারের। ২রা অক্টোবরে গান্ধী জয়ন্তীতে সারা দেশ ছুটী ভোগ করে, 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ এদের যত্ন নিন' মার্কা সাইন বোর্ড

২২৪। ২০.১.৭৪ এ লেখা।

২২৫। 'আয়রনম্যান' শুধু বাঙ্গালীর প্রতি, সুভাষচন্দ্রের প্রতি ব্যবহারে, পার্টিশন কমিটির অবৈধ মেম্বার হয়ে বাঙলা দেশকে কর্তন করবার বেলায়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র বা অন্য সমগোষ্ঠী স্থান বা তার মানুষদের প্রতি অবশ্য তুলোর মত নরম-ম্যান।

২২৬। ইনি প্রবীণ বামপন্থী নেতা, লেখক ও সাংবাদিক। ১৯২৮ সনে ইনি সুভাষ অনুরাগী কংগ্রেস সেবী ছিলেন।

সামনে রেখে শিশু এবং জাতি দুইই ধুঁকতে থাকে, প্রতি ১০০টি শিশুর ৭০টি প্রতিদিন পেটে-খিদে নিয়ে রাত্রে ঘুমায়। তবু সেই ক্ষীয়প্রাণ 'শিশু'র 'ভবিষ্যৎ' এর আশায় তার অশক্ত অভিভাবকেরা 'শিশু দিবস' পালন করেন ১৪ই নভেম্বরে শিশু দরদী চাচ নেহরুকে স্মরণ করে আর স্কুলের শিশুরা দু' প্যাকেট করে লজেন্স চোষে, কিন্তু 'নেতাজী দিবস' সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ক্যালেণ্ডারে সামান্য লাল আঁচড়টুকু পাবার মত সৌভাগ্যও করে না। সারা ভারতে ২৩শে জানুয়ারীতে সব কয়টি প্রদেশেই অফিস কাছারী খোলা থাকে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে সাধুবাদ জানাতেই হয় তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে অবশেষে অন্ততঃ আঞ্চলিক নেতা হিসাবে (সর্বভারতীয় নেতা নয়) স্বীকৃতি দিয়েছেন ঐ দিনটা সব কিছু বন্ধ রেখে। তবে সেটা না করলে যে মুখোসের আবরণটা একেবারেই খসে পড়তো।

অনেক বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গে এ্যাণ্টি-কংগ্রেস ফিলিং ডেভেলপ করেছে, কংগ্রেস সে সম্বন্ধে সচেতন। তাই তাদের সাদা-সবুজের বাহারী পতাকা সারা বছর বাক্স বন্দী করে রাখলেও মাঝে মাঝে যেমন প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, গান্ধী জয়ন্তী ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ওড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে হয় কিন্তু বছরের প্রথমে এই ২৩শে জানুয়ারীরই কল্যাণে। ২৬শে জানুয়ারীর প্রাকালে নেতাজীর জন্মদিবসে তেরঙ্গা ফ্ল্যাগে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বাজারের মোড়ে মোড়ে। কিন্তু তার বেশী নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর কোন অবদানই তারা স্বীকার করতে রাজী নয়, নির্বাচন প্রাক্কালে অথবা কোন কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রয়োজন-ভিত্তিক নেতাজী-স্মরণ ছাড়া। তাই 'নেতাজী-দিবস' শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'করুণা-দিবস' হয়, বঞ্চিত বাঙ্গালীদের একটা ক্ষুদ্র সেকশন—ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজ—ছুটি উপভোগ করে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন, কৃতজ্ঞতা বোধ করেন রাইটার্স-বিল্ডিংসের অধিপতিদের প্রতি।

শীতের মরশুমে হলিডে মুড আনতে সাহায্য করে এই নেতাজী-দিবস—বাঙ্গালী বাবুদের সৌভাগ্যবান কয়েকজন প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রিফিক্সে, ২৩শের সাফিক্সে দুটো দিন ছুটী অ্যাড করে মাইথন, তিলাইয়া, ফরাক্কায় জলের ক্ষমতা ও সেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির কণ্ট্রোলার কংগ্রেস সরকারের কীর্তি দেখে মুহ্যমান হবার জন্য বাস ভর্তি হয়ে যান, ডায়মণ্ড হারবার-কাকদ্বীপে পিকনিক সেরে এসে বছরের আর কটা দিন এলিয়ে পড়ে থাকেন। ২৩শে জানুয়ারীর আসে পাশে ৭ দিন-দশদিন সুভাষ-মেলা, চিত্র প্রদর্শনী, জন্মোৎসব কমিটির মাল্যদান, অর্ঘদান সবই ভাবুক-বাঙ্গালী. অসামান্য প্রাণশক্তির বাঙ্গালীরা করেন কিন্তু সেই পর্যন্তই। ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি সদন) যতই বঙ্গবাসী কলেজ সুভাষ-চিত্রে ও বাণীতে ভরিয়ে ফেলুক, সিকি শতাব্দী পার হযে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হলিডে-চার্ট এ ২৩শে আজও স্থান পায় না। ১৮০ জন এম. এল. এর. শতকরা ৯০ জন নিজেদের অথবা নিজেদের গোষ্ঠীর কব্জায় এনে ১৯৭২ এর ভেল্কিবাজি নির্বাচন সেরে কেন্দ্রের সমধর্মী সরকার গঠন হবার পরেও ১৯৭৩ এর ২৩শে জানুয়ারীতে অধুনা প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে এসে নেতাজী-স্মরণ করলেও স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিল্লীতে সরকারের পক্ষ থেকে যে ক্যাপস্যূল প্রোথিত করা হয়েছে তাতে যে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে নেতাজীর নাম নাই অথবা থাকলেও তাঁর সম্বন্ধে বিকৃত ইতিহাস আছে, ক্যাপস্যূলের ভেতরটা না দেখেও মানুষ তা অনুমান করতে পারে।

যে ষড়যন্ত্র করে গান্ধীজি ও তাঁর 'মাথা নাড়ে, কথা কয়, কলের পুতুলেরা' সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করেছিলেন, সেই ষড়যন্ত্র এর পরেও চিরটা কাল ধরেই হয়ে এলো। গান্ধীজিকে 'জাতির জনক' নাম দিলেন সুভাষচন্দ্র অথচ 'জাতির জনক' বা তাঁর শিষ্যরা তাঁর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। চেয়ে চিন্তে স্বাধীনতা অর্জন করেছে গান্ধী কংগ্রেস কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে

যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে সেই নেতাজীর নাম স্মরণ করে নেতাজী-দিবস গান্ধীজি বর্তমানে[২২৭] কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার বিভাগ কিভাবে পালন করেছিল তার পূর্ণ বিবরণ দিতে গিয়ে সুধী প্রধান লিখেছেন— "১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে আমরা যখন দেখলাম যে বেতার কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের জন্ম-তিথিতে কোন অনুষ্ঠান করছে না। তখন আমরা প্রথমে বেতার কর্তৃপক্ষকে জানালাম এবং পরে সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিয়ে বললাম যে, যদি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে বেতার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অনুষ্ঠান না করে তাহলে সেদিনের অনুষ্ঠানে কোন শিল্পী যোগদান করবে না। সংঘের সংগঠন-সম্পাদক হিসাবে আমার নামে এই বিবৃতি এসোসিয়েটেড প্রেস ১৯৪৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে প্রচার করে। কিন্তু এর আগে ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী নেতাজী জন্মদিবস পালন সমিতির পক্ষ থেকে সর্বশ্রী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং হরেন্দ্রনাথ সেন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান যে, তাঁরা কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি পালন উপলক্ষে কয়েকটি গান যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তা গাওয়াবার জন্য সকালে দশ মিনিট এবং বিকালে দশ মিনিট সময় প্রার্থনা করে বিফল হয়েছেন। কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টার-সর্দার প্যাটেলের কাছে তাঁদের যোগাযোগ করতে বলায় তাঁরা তাই করলেন এবং উত্তর পেলেন : Reference your telegram January tenth and your letter No. Pub/N/47/1 January sixth to Honourable Sardar Vallabhbhai Patel,

---

২২৭। গান্ধীজি গত হয়েছেন ৩০।১।৪৮এ, স্বাধীন ভারতে প্রথম নেতাজী দিবসের ৭ দিন পরে, আগে নয়। আরো উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীজি অনেক দিন ধরে রোগশয্যায় শায়িত থেকে মারা যাননি, স্বাধীনোত্তর প্রথম ২৩শে জানুয়ারীতে তিনি আনকন্‌শাস ছিলেন না, বস্তুতঃ তিনি সপ্তাহকাল পরেও বিড়লা মন্দিরে রামধুন সঙ্গীত গাইবার মত শক্ত ছিলেন।

radio programme celebration of Mr. Subhash Chandra Bose's birth-day Governments' existing policy bans discussions party politics or party propaganda.[২২৮] Regret your request can not be acceded—Information. এই টেলিগ্রাম উদ্ধৃত করে নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদকদ্বয় মন্তব্য করেছেন যে তাঁরা বুঝতে পারছেন না নেতাজীর প্রতি সম্মানসূচক সঙ্গীত কি করে রাজনৈতিক প্রচার হয়— এবং ভারতের প্রথম জনপ্রিয় সরকার বেতারে নেতাজীর সম্মানে গান গাওয়া কেন বন্ধ করছেন। (নেশন —১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৯ সাল।) প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, তখন দেশবাসী এবং নেতাজী ভক্তদের ধারণা ছিল যে, যে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম করে কংগ্রেস নেতারা নির্বাচন তরণী পার হলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সুভাষের প্রতি পুরাতন বিদ্বেষ ভুলে গেছেন কিন্তু ব্যাপারটাতো ভোলার নয়— সুপরিকল্পিত ভাবে এড়িয়ে যাওয়া। ১৯৪৮ সালে আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন যখন দাবী করল যে, নেতাজীর জন্মদিন পালিত না হলে ২৩শে বেতার বয়কট করা হবে তখন কংগ্রেস নেতারা অদ্ভুত কুটিলতার পরিচয় দিল। ২২শে জানুয়ারী রাত্রিতে যখন আমি বেতার কেন্দ্রে গিয়ে ২৩শের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে ষ্টাফ আর্টিষ্টদের সঙ্গে সংঘের নির্দেশ জানাচ্ছিলাম তখন স্টেশন ডাইরেকটার শ্রীঅশোক সেন আমাকে জানালেন যে তাঁরা সর্দার প্যাটেলকে ফোনে ধরার চেষ্টা করছেন কারণ তিনি দিল্লীতে নাকি ছিলেন না। রাত্রি ১১টা বেজে গেল কিন্তু শ্রীসেন বেতার চালাতে বলে আমাকে

২২৮। দুরাত্মাদের কখনো ছলের অভাব হয় না। 'নেতাজী অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫৬)'র কাজের সময়ে জহরলালের এই রকম ছলের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারে 'প্রধান' এবং 'উপ-প্রধান' দুই মন্ত্রীই এক সুরে বাঁধা ছিলেন। লং লিভ দি হনারেবল সিলেক্টারস্ অব দি প্রাইম অ্যাণ্ড দি ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টারস্ অব ইণ্ডিযা!

নিয়ে তাঁর ডালহৌসী স্কোয়ারস্থ ষ্টীফেন কোর্টের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন এবং ফোনের কাছে বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ফোন বেজে উঠলো— এবং সেন কি সব কথা বলে আমাকে খবর দিলেন যে হুকুম পাওয়া গেছে নেতাজী-জন্মতিথি পালিত হবে। আমি তাঁকে বললাম যে, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের শিল্পী সুকৃতি সেন একটি অনুষ্ঠান তৈরী করে রেখেছেন। তাঁকে খবর দিলেই তিনি করবেন। শ্রীসেন তার সম্মতি জানিয়ে আমাকে একটি বিবৃতি দিতে বললেন। আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস করে পরের দিন অনুষ্ঠানে শিল্পীদের যোগ দিতে বললাম। আমার বিবৃতি শ্রীসেন নিজে টাইপ করে এসোসিয়েটেড প্রেসে পাঠালেন এবং আমাকে তাঁদের গাড়ী করে রাত্রি প্রায় ১২টার পরে আমার চারু এভেনিউস্থ বাসায় পৌঁছে দিলেন। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল সারা দিনের মধ্যে বিকালের অনুষ্ঠানে নজরুলের 'দুর্গম-গিরির' রেকর্ড ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের এক বক্তৃতা দিয়ে সুভাষ-জন্মদিন বেতারে পালিত হ'ল। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, রাজ্য-সরকারের পুলিশ-মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়কে দিয়েও আর একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল যাতে শিল্পীরা বেতারে যোগ দেন।

এই ব্যাপারে জনসাধারণের সঙ্গে আমরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম এবং পরের দিন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানালাম যে, বেতার কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার শোধ আমরা সময়মত নেব। সেকালের ইংরাজী পত্র 'নেশান'—যার সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক মোহিত মৈত্র এবং বসুমতী আমাকে এবং সঙ্ঘকে কড়া সমালোচনা করে লিখলেন বেতার কর্তৃপক্ষকে বিশ্বাস করার জন্য। তার উত্তরে বসুমতীতে আমার যে জবাব বেরিয়েছিল তা এই :

প্রিয় বৈতারিক মহাশয়,

১৫শে তারিখের 'বসুমতী'তে আপনাদের বেতার সম্পার্কে মন্তব্য পড়লাম। মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত—তবু আমাকে উদ্দেশ্য করে

যে ধিক্কার দিয়েছেন সেই সম্পর্কে আপনাকে কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রথমত জাতীয় নেতাদের হাতে সরকার গেছে বলে বেতার পরিচালনায় গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে একথা মনে করার কারণ শিল্পী সংঘের হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে বেতার সম্পর্কে আমরা যা কিছু করতে চেষ্টা করেছি তাতে কেবল আমরা বাধাই পেয়েছি এবং তাঁরা আগেকার ব্রিটিশ রাজত্বের ব্যবহারই চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আপনার যে অভিমান তা শিল্পী সংঘ বেতার কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে পোষণ করে না। আমরা জানতে পারি সর্দার প্যাটেলের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না বলে নেতাজীর জন্মদিনে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে না। তাই আমাদের কর্তব্য করার জন্য আমরা ধর্মঘট করার প্রস্তাব পাঠাই। এতে ভীত হয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষ রাত্রি ১১টার সময় (২২শে জানুয়ারী) আমেদাবাদ ভায়া দিল্লী থেকে তার যোগে আদেশ আনেন। আমার সামনেই সেই তারের কথাবার্তা শুনতে পাই। প্রোগ্রাম কি হবে জানতে চাইলে ষ্টেশন ডিরেক্টার বলেন খুঁটিনাটি ব্যাপার তাঁরা ঠিক করবেন। অথচ পরের দিন দেখলাম যাচ্ছেতাই প্রোগ্রাম হয়েছে। আমি একটি বিবৃতিতে বলেছিলাম, এটা আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এবং শিল্পীরা এ কথা সহজে ভুলবে না। এই বিবৃতি একখানি কাগজ ছাড়া কোন কাগজ এমন কি আপনাদের 'বসুমতী'ও ছাপেনি। ...বেতার কর্তৃপক্ষ জানতেন প্রতারণা না করলে তারা ধর্মঘট ঠেকাতে পারবেন না। জনসাধারণের মধ্যে এখনো এই ধারণা আছে যে ঠকা না পর্যন্ত এই সরকারকে সুযোগ দিতে হবে। কাজেই আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছিলাম বা জয় হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিলাম। তাতে অন্যায় কিছু করেছি বলে মনে হয় না। বরং তাতে আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়েছে এবং বেতার কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক এবং কংগ্রেসের তথাকথিত নেতাদের মুখোস খুলে গেছে। নমস্কার। ইতি— সুধী প্রধান।

১৯৪৮ সালের নেতাজী জন্মোৎসব এইভাবে বেতারে কংগ্রেস নেতারা এড়িয়ে গেলেন এবং আমরাও ভাবলাম ১৯৪৯ সালে বোধ করি ভিন্নতর অবস্থা হবে। তখন আমরা অনেকেই বুঝিনি যে মুখোস খোলার পর যে দানব আত্ম-প্রকাশ করবে সে শিশু সাহিত্যের দানব নয়। এ দানবের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে রয়েছে অনেক রকমের ছলাকলা—যার পরিচয় মিলেছিল ১৯৪৯ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সুভাষ-চন্দ্রের জন্মদিন পালন করার ব্যাপারে শিল্পী সংঘের তৎপরতা এবং অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করার ইতিহাস'।

এতক্ষণ, সুধী প্রধান যা বলেছেন, তাই টুকে দিলাম। সুধী প্রধান নিজে প্রবীণ বামপন্থী নেতা, সুচিন্তিত লেখক ও সাংবাদিক। সর্বোপরি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় জন কারণ যখন '১৯১৮ সনে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন' ইনি তখন জি. ও সি. বেশী 'সবাধিনায়কের এডিকং' হয়েছিলেন। ১৯২৮ এর সেই অধিবেশনকে বিদ্রূপ করে গান্ধীজি বলেছিলেন: 'পার্ক সার্কাসের সার্কাস'। সজনীকান্ত দাস বহু বছর ধরে রঙ্গ-রসিকতা দিয়ে ভরে তাঁর 'শনিবারের চিঠি' লিখতেন। তা এই বিখ্যাত বঙ্গ রঙ্গ-রসিক তাঁর পত্রিকার ভাদ্র, ১৩৩৫ এর সংখ্যায় মাত্রাতীত ব্যঙ্গভরে পদ্যাকারে লেখেন: 'সেলাম নেহরু, কেটে পড় বাছা, / সেলাম বৃদ্ধ গান্ধী। / হাফ প্যান্টের নাহি বটে কাছা / তবুও কোমরে বান্ধি —/দেখিস্ না এই বিশ্বব্যাপিয়া/মাথা তুলিয়াছে চ্যাংড়া/ যুবা ইয়োরোপ, যুবক এশিয়া / কাঁচা পীচ্, কাঁচা ল্যাংড়া। / হে চির তরুণ ধন্য। / গান্ধী গোখেল হইল হন্য/তুমি এলে সেই জন্য। / শোভে ঝলমল জরির পোষাক / রাবড়ি সেবিত অঙ্গে, / শিখ মারাঠিরা বিষম অবাক/মিলিটারী দেখে বঙ্গে। / সিংহ চর্মে শোভিত রাসভ দিকে দিকে তাই ওঠে জয়রথ,/ভেকদল আজ করে কলরব/হাতীরে না মানে হাতী।/ হেথা জাতীয় সমরে যুবা সৈনিক / যেন পারাবত লকা, / কারো ভাঙা

শিরদাঁড়া, সম্বল কারো,/ ঘুণ ধরা বুকে যক্ষ্মা। /সেই শ্রীমান খোকারে ঘিরিয়া যত/ডাকাতের হল gang/পাকা গুরু হয়ে সেথা নয়া ভগবান/ কাড়াইয়া আছে ঠ্যাং।[২২৯]

অতএব দেখা যাচ্ছে নেতাজীর স্নেহভাজন ও আপনজন সুধী প্রধানের কাছ থেকে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পেলাম। এ থেকে ভারতের ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিহিংসা পরায়ণ চরিত্রের স্বরূপটা জানতে পারা যায়। নারায়ণ সান্যালের 'নেতাজী রহস্য সন্ধানে' পড়ে খবর মেলে এদেশের শান্তিপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর সুভাষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতার মাত্রাহীন পরিমাণটার কথা। আর এই দুটী জিনিষ একত্র করে ভাবতে বসলে অবাক লাগে আমাদের এই মহান ঐতিহ্যপূর্ণ উপমহাদেশটি রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত দু'জনের স্বরূপ দেখে। লজ্জা হয় এই চিন্তা করে যে এত বড় বড় অপমানজনক ঘটনা আমাদের প্রদেশের লোকগুলো অনায়াসে সহ্য করলো বছরের পর বছর ধরে।

'অন্যায় যে করে,/আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা যেন তারে/তৃণসম দহে'।[২৩০] এই মুহুর্ত্তে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই প্রদেশের মানুষের

২২৯। আলেকজাণ্ডারের চোখে বিচিত্রতা যে দেশের ধরা পড়েছিল সে দেশ সত্যিই অভিনব। লকা পায়রার সাথে তুলনা করে গরু সুভাষচন্দ্রকে 'ডাকাত দলের সর্দার' বলেছিল শনিবারের পাতা; সুভাষ-অনুরাগীদের বিচিত্র এই বঙ্গে সেই শনিঠাকুর 'সজনীকান্ত দাস'ই অপ্রতিহত গতিতে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী চালিয়েছেন ঐ ঘটনার পরে বহু বছর ধরে—নাম কিনেছেন, হয়ত বা ধাম ও বানিয়েছেন—বাঙ্গালী রসিকজনেরা তাঁর সরস লেখা চর্বন করে জ্ঞানের কলস হয়েছেন, হয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেছেন। 'খোকা ভগবান' বিশেষণও ঐ সজনী দাশেরই দেওয়া।

২৩০। "To my countrymen I say— ... Forget not that the greatest crime is to compromise with injustice and wrong," Subhas Chandra Bose, 26. 11. 40. দেশের নায়করা সুভাষ-ভক্তরা থোড়াই তাদের নেতার কথা মনে রেখেছেন!

কাছে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, অন্যায় সহনশীলদের সহ্য শক্তি তুলনাহীন। একটা জাতি সত্যিই ক্লীবত্ব পাবার মুখে। বাঙ্গালীর গর্জে ওঠবার কথা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, তামাম ভারতবর্ষের জনসাধারণের মুক্তির জন্য, তা নয় যুগের পর যুগ ধরে তারা তোফা ঘুম দিচ্ছে।[২৩১]

সুভাষচন্দ্রের অপমান তো তাদের অপমান নয়!!!!

২৩১। কথার ফুলঝুরি বৈঠকখানার রাজনীতিক তারা যে প্রায় সবাই বুদ্ধিজীবি—কত বিদ্যা তাদের পেটে, বুদ্ধি কত ঘটে!

নেতাজী কমিশন[২৩২]

'অখণ্ড ভারত' যাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল সেই যোগীর, সেই ঋষি সুভাষচন্দ্রের কেউ নামও নেয়নি প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের দিনে। পরেও তাঁকে চিরকালই অস্বীকার করলো এ' দেশের সরকার। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিলেন, তাঁর উত্তরসূরী নেহরুজী শুধু তাঁকে তরবারি হাতে রোখবারই বাসনা প্রকাশ করেন নি, দেশে ফেরবার সমস্ত পথ রুদ্ধ কর্বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর অন্তর্ধান জনিত প্রশ্নটা নিয়েও কি পর্যন্ত নোংরামির পরিচয় দিল নেহরু-সরকার গঠিত শাহনাওয়াজ কমিটি। ১৮।৮।৪৫-এ বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এটা জনশ্রুতি ছিল। ভারতবর্ষের মসনদ বৃটিশ-প্রসাদে পণ্ডিতজী পেয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে কিন্তু নেতাজীব বিমান দূর্ঘটনা জনিত তদন্ত কমিটিটি গঠনের সময় করে উঠতে পারলেন না ভদ্রলোক ৫-৪-১৯৫৬ এর আগে, কাজের চাপে মাত্র বছর ন'য়েকই সময় গিয়েছিল। তিনজন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির দু'জন চেযারম্যান শাহনাওয়াজ খান[২৩৩] ও সরকারী সদস্য অই. সি. এস এস. এন. মৈত্র কর্তাব ইচ্ছাকেই কর্ম হিসাবে ধরে নিয়ে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেন। বিমান দূর্ঘটনার স্থান ফরমোসা দ্বীপে সরেজমিনে তদন্তে না গিয়েই ১১টি বছর পরে গঠিত অনুসন্ধান কমিটি কতকগুলি হাস্যকর যুক্তি লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ করে দিলেন নেতাজী মৃত। ব্যারিষ্টার-সাহেবকে খুশী করা নিয়ে কথা—তা' তিনি হয়েছিলেন শুধু বিরক্তির কাবণ ঘটিয়েছিলেন তৃতীয় বেসরকারী সদস্য সুভাস-

---

২৩২। ২২.৪.৭৪ এ লিখিত ও ১০-৯-৭৪ এর পরে পরিবর্ধিত।

২৩৩। আই. এন. এর সদস্য শাহনাওয়াজ খান বর্তমানে কেন্দ্রীয় পেট্রোল ও কেমিক্যাল দপ্তরের উপমন্ত্রী।

অগ্রজ সুরেশ চন্দ্র বসু যখন তিনি পণ্ডিতজী-নিযুক্ত অপর দুই পণ্ডিতের আবোল-তাবোল কথাবার্তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। যাক তাদের সে কলঙ্কের কথা। নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ ২৭.৮.৪৫ তে প্রথম পেয়ে নেহরুজী বলেছিলেন 'সুভাষবাবুর মৃত্যু সংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে কিন্তু ইহা আমাকে স্বস্তিও দিয়াছে'। দুঃখিত হবার কথা থাক, বহু বছর ধরে বাক্যবাগীশ মহাশয়টি যে অস্বস্তিতে জীবনটা কাটিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'নেতাজী এনকোয়ারি কমিটি'র ডেলিবারেট ফাইন্যাল রিপোর্টে যা সরকার প্রকাশ করেছিলেন ১৯৫৬ এর সেপ্টেম্বরে। এনকোয়ারি কমিটির সদস্য সুরেশ চন্দ্র বসুর যুক্তি-গ্রাহ্য আপত্তি সত্বেও শাহনাওয়াজ খান ও এস. এন মৈত্রের রিপোর্টটি ছাপা হয়, যার বিষয়বস্তু পাঠ করলে একজন শিশুর পক্ষেও হাসি সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এদের পাণ্ডিত্য দেখে, পরিণত বয়স্ক লোকের মনে রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, ঘৃণা সব কিছু ভাবেরই উদ্রেক করে। সুরেশ চন্দ্র বসুর চিঠির উত্তরে জহরলাল যা লিখেছিলেন তাতে ভারতবর্ষ-চালক প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মানসিক চেহারাটি পুরোপুরি চেনা যায়। নেতাজী সত্যিই মৃত একথা সরকারী ফাইলে লিপিবদ্ধ করতে পারার পরে জীবনের শেষ ৮টি বছর হয়ত স্বস্তিতে কেটে থাকবে (পুরোপুরি স্বস্তি এসেছিল তো, নাকি নতুন কোন অস্বস্তি মনে দানা বেঁধেছিল?)। প্রসঙ্গতঃ এই জহরলালকে সুভাষচন্দ্র বড় ভাইয়ের সম্মান দিতেন। যারা খবর রাখেন তারা জানেন শাহনাওয়াজ রিপোর্টটি তথ্যসমৃদ্ধ নয়। সে রিপোর্টটি বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়াতে বছরের পর বছর ধরে এজিটেশন হতে থাকে। বাধ্য হয়ে জহরলাল-দুহিতা অধুনা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রায় ৪ বছর আগে (১১.৭.৭০) খোসলা কমিশন বসিয়েছেন। বহু প্রমাণ এই ২৫।২৯ বছরে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে, নষ্ট করা হয়ে থাকবে, খোসলা কমিশনের সদিচ্ছা (?) থাকলেও এতদিন পরে কতটা কি করতে পারবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ পুরোপুরিই আছে।

সে যাক চল্লিশের দশকে ভুলাভাই দেশাই এর সাথে একসঙ্গে গাউন পরে এই জহরলালই লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকদের হয়ে বৃটিশ আদালতে দরবার করেছিলেন। তবে সেটা যে ব্যারিষ্টার সাহেবের নিছক নাম বাড়াবার আকাঙ্খায়, সে কথা আই. এন. এর সৈনিক ও তার সর্বাধিনায়কের প্রতি তাঁর পরবর্তী কালের ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

হালের খবরে প্রকাশ, নেতাজী সম্পর্কিত ব্যাপারে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও 'ভদ্রলোকের এক কথা'র থিয়োরী চালিয়ে যাচ্ছেন। 'নেতাজী তদন্ত কমিশনকে সরকার সাহায্য করছে না' এ খবর পরিবেশন করে 'সত্যযুগ' পত্রিকা যা বলছে তা এইরূপ: 'কলকাতা ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৪— ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেন যে নেতাজী তদন্ত কমিশনকে নেতাজী সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যথোচিত সাহায্য তো করেনই নাই অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁরা শাহনওয়াজ কমিটির রায যে যথার্থ সেটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

নেতাজীর সম্পর্কিত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পাঞ্জাব হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীজি ডি খোসলাকে চেয়ারম্যান করে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করেন, ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে শ্রীঅমর চক্রবর্তী এবং শ্রীসুনীল গুপ্ত কমিশনের সঙ্গে ভারতে এবং ভারতের বাইরে সর্বত্র গিয়ে সমস্যাদি যাচাই করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। তাঁরা দুজনেই তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে অভিযোগ করেন যে, কমিশনের সামনে বহু প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র পেশ করা হয়নি। যেগুলো পেশ করা হয়েছে সেগুলোও মূল দলিলের নকলের নকল যার আইনগত কোন মূল্য নাই। তাছাড়া ডাঃ রাধা-কৃষ্ণণ, শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ সাক্ষীদের কমিশনের সামনে

হাজির করার চেষ্টা হয়নি'। (আরো খবর আছে যে হবিবুর রহমান, লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রমুখের সাক্ষ্যও কমিশন গ্রহণ করেনি। —লেখক)

'শুধু তাই নয় শ্রীচক্রবর্তী অভিযোগ করেন যে, অনেকগুলো দলিল-পত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী···একটি চিঠিতে জানান যে মূল দলিল নষ্ট করা হয়নি। অপ্রয়োজনীয় বোধে কিছু সংখ্যক দলিলের নকল নষ্ট করা হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তীর প্রশ্ন তাহলে সেই দলিল গুলো হাজির করা হোল না কেন?

শ্রীচক্রবর্তী জানান যে জাপানী সিক্রেট সার্ভিসের জনৈক শ্রীকিশি একখানি চিঠিতে লেখেন যে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি নেতাজীর খবর রাখেন। পরিকল্পনা মাফিক তিনি তখনো কাজ করে যাচ্ছিলেন। শ্রীচক্রবর্তীর অভিযোগ এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটিও হাজির করা হযনি। ফরেয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দের অভিযোগ যে তদন্ত কমিশনকে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করা দূরে থাক বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে স্বভাবতঃই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে তদন্ত কমিশনের রায়ের পরেও নেতাজী সম্পর্কে সত্য জানার জন্য জনগণের আগ্রহ পূরণ নাও হতে পারে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দের মতে প্রকৃত সত্য বের করতে হলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তদন্তকারী অফিসারদের দিয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ উচিত ছিল। তদন্ত কমিশন তথ্য খুঁজে বের করবেন না— তাঁরা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের রায় দেবেন। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ ঐ ধরণের অফিসার নিয়োগ করে তথ্য অনুসন্ধানের দাবী করেন। সর্বশ্রী নলিনী গুহ, অশোক ঘোষ, ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য্য, ভক্তিভূষণ মণ্ডল এবং নির্মল বসু আলোচনায় যোগ দেন'।

তা' ভারতবর্ষের সেই পুরণো ট্র্যাডিশন আজও সমানেই চলেছে। জহরলাল নেহরুজী যে দলিল তৈরী করে গিয়েছেন শাহনাওয়াজ-

মৈত্রের সহযোগিতায়, অনুরূপ দলিলই যে আবার তৈরী হতে চলেছে তাঁর সুযোগ্যা কন্যার পাহারাদারীতে খোসলা কমিশনের নেতৃত্বে, এ সম্বন্ধে মানুষের মনে আর সন্দেহ থাকলো না। হালের নেতাজী কমিশনটাও যে শেষ পর্যন্ত বহু প্রয়োজনীয় জিনিস—আসল আসল জিনিস—অমিশন করেই তার রায় দেবে এটা বোঝা অসম্ভব নয়।

একটা পুরণো কথা এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যিক। ডিসেম্বর, ১৯৭০-এ লেখা নারায়ণ সান্যালের 'নেতাজী রহস্য সন্ধানে'র ২৮৯ পৃষ্ঠায় আছে: 'বর্তমান খোসলা কমিশনের কাছে ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহ বলেছেন যে, সুভাষচন্দ্রের রাশিয়ায় বন্দী হয়ে থাকার কথা তিনি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকেও জানিয়েছিলেন—এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে। রাশিযায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতও নাকি এ-কথা জানতেন। একবার তিনি নাকি সাংবাদিকদের কাছে একথার ইঙ্গিতও দেন'।

'সত্যযুগে' প্রকাশিত প্রায় চার বছর পরের সংবাদটির সঙ্গে উপরোক্ত কয়েকটি লাইনের একটা যোগসূত্র কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ?

[পরবর্তী খবর প্রমাণ করে যে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দের ৮ই এপ্রিলের কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়। সংবাদটি নিম্নরূপ : 'নেতাজী তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান জি. ডি. খোসলা নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কিত প্রতিবেদন আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশঙ্কর দীক্ষিতের কাছে পেশ করেছেন' (১।৭।৭৪ সত্যযুগ)। খবরে প্রকাশ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে এই কমিশন চার বছর সময়ে ৫০০ পৃষ্ঠার যে প্রতিবেদন তৈরী করেন তাতে যা বলা হয়েছে 'ইতিপূর্বে শাহনাওয়াজ কমিটির রিপোর্টেও এই একই কথা বলা হয়েছিল। খোসলা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তাইহোকু বিমান বন্দরে

নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে'[২৩৪] ১৮।৮।৪৫ তারিখে। 'সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীআর কে হালদুলকর' ২৬শে জুলাই, ১৯৭৪-এ 'বলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং অনেক লোক বলেছেন যে নেতাজ কে সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনে দেখা গিয়েছে। খোসলা কমিশন কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনে তদন্তের জন্য একবারও যান নি'।

'নেতাজীর পরিবার এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা এখনও বিশ্বাস করেন না যে নেতাজী মারা গিয়েছেন।- তাঁরা যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে খোসলা কমিশন নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কোন প্রামাণিক তথ্য দেখাতে পারেন নি। খোসলা কমিশনের রিপোর্টে নেতাজীর মৃতদেহ সনাক্তকরণেরও কোন প্রমাণ নেই।' ...খোসলা কমিশনের অন্যতম সাক্ষী শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার নেতাজীর ভাইপো দ্বিজেন্দ্র-নাথ বসু আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সর্বশ্রী সত্যরঞ্জন বক্সী, অমর প্রসাদ চক্রবর্তী, সুনীল দাস প্রমুখের উপস্থিতিতে বলেন[২৩৫] যে 'তদন্ত কমিশনের কাছে এমন অনেক তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় যে ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সালে তাইহোকু বিমান বন্দরে নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি।'

'তিনি বলেন যে বিমান দুর্ঘটনার পরও নেতাজীকে দেখতে পাওয়া গেছে। আমেরিকা ও বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ এই দুর্ঘটনা ঘটার পরেও নেতাজীর সন্ধান করেছেন। এ ছাড়া নেতাজীর ডাইরেন থেকে জওহরলাল নেহরুকে লেখা চিঠি প্রমাণ করে যে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হননি। এমন কি এই চিঠির কথা উল্লেখ করে জওহরলাল নেহরু তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তোমাদের চিরশত্রু সুভাষচন্দ্র বসু বর্তমানে ডাইরেনে

২৩৪। সত্যযুগ ২৭শে জুলাই, ১৯৭৪।

২৩৫। সত্যযুগ ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

আত্মগোপন করে রয়েছেন— তোমরা তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

'খোসলা তদন্ত কমিশনে উপরে উল্লিখিত ঘটনাটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নেতাজী সংক্রান্ত জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত ফাইল চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফাইল নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই অজুহাতে কোন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কমিশনকে দেওয়া হয়নি।' (কি অবিশ্বাস্য কথা! যেদেশের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ফাইলই নষ্ট হয়ে যায় (!) সে দেশে নিযুক্ত যে কোন তদন্ত কমিশনই যে মূষিক প্রসব করবে, এটাই স্বাভাবিক। 'উপযুক্ত তথ্যের অভাব'টাই শেষ পর্যন্ত একটা সৃষ্ট অজুহাত হবে এটা জানা কথা—লেখক।) 'শ্যামলাল জৈন নামে এক ভদ্রলোক উক্ত চিঠি কমিশনের কাছে পেশ করেন।'[২৩৫]

অতএব বাংলার সজাগ মানুষ— আগেও যেমন এখনও তেমনি— কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত কমিশনের রায়ের কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না, যুক্তিই তাদের বিশ্বাস করতে দেয় না।[২৩৬]

২৩৬। 'নেতাজী কমিশন' অত্যন্ত সংক্ষেপে ২/৪ কথায় সারা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আসলে একটি অত্যন্ত বড় প্রবন্ধ হবার অপেক্ষা রাখে।

এখানে শুধু দেখানো হয়েছে যে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ ৮.৪ ৭৪ এ অত্যন্ত ঠিক কথা বলেছিলেন ; বস্তুতঃ এটা পরবর্তী সময়ে জুলাই মাসে প্রমাণিত হয় যখন খোসলা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে শাহনাওয়াজ খানকেই ডিটো দেন। খোসলা কমিশনের নিযুক্তি আসলে পুরো জিনিসটাকে আবার নুতন করে ধামা চাপা দেবার জন্য—কয়েকটি বছর সময় ইচ্ছা করে নষ্ট করা এবং সরকারের মানে জনগণের বেশ কিছু টাকা বাজে খরচ করে একটি গোষ্ঠীর কয়েকজনের কিছুদিনের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করা—এটা বোঝা অসম্ভব নয়। নেতাজী কমিশন রিপোর্ট বের হবার আগে ও পরে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা পশ্চিমবাংলার মানুষের মনের সঠিক প্রতিফলন।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

সংশোধন, সংযোজন ও মন্তব্য

পৃষ্ঠা	লাইন		
৯	২১	'পাঞ্জাবের কংগ্রেস' এর স্থানে হবে	'পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব কংগ্রেস'
১৫	৭	'কদম' শব্দের স্থানে হবে	'একদম'
১৮	৪	'করেন' ,,	'করেন নি'
২০	২৮	'তন' ,,	'তিনি'
৩৪		(শেষ লাইনের পরে যোগ হবে) পাঠক বুঝি রিলেটিভ ভেলোসিটির কথা ভাবছেন? ওটার কথা থাক। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, কথাটাও আপাততঃ হিসেবে ধর্লাম না।	
৩৮	১১	'Congres' এর স্থানে হবে	'Congress'
৫১	২৭	'জমিদারবৃন্দ ভারতবর্ষেরও' এর স্থানে হবে	'জমিদার-বৃন্দ (ভারতবর্ষেরও)'
৫৭	১৫	'মানুষই করতে' এর স্থানে হবে	'মানুষই করতে পারে না'
৬২	১	'যরমোসা' ,,	'ফরমোসা'
৮০	৪	'রবীন্দ্রনা ের' ,,	'রবীন্দ্রনাথের'
৮১	৪	'পরণত' ,,	'পরিণত'
৮৩	২০	'বিভির্ম' ,,	'বিভিন্ন'
৮৯	৯	'(অথচ' ,,	'অথচ'
	১৬	'সকলেই' ,,	'সকলেই'।
৯১	৬	বিস্তৃ'ত। ,,	বিস্তৃত'।
	৮	'অন্নাদি' ,,	'অন্নাদির'
৯২	১১	'জহরলাল ক' ,,	'জহরলালকে'

	১৭	'নেতার ৫তি খানা	,,	'নেতার প্রতি খানা'
১০১	৪	'বস্তি'	,,	
১০২	৬	'নি দের'	,,	'নিজেদের'
১০৮	১০	'কংগ্রেসীর'	,,	'কংগ্রেসীরা'
১১০	১৬	'৬৬'	,,	'৯৯'
		'৬৬৬'	,,	'৯ ৯'
১১৪	৪	কিভাবে সম্ভব ?'	,,	কিভাবে সম্ভব ?"
১২৪	১৩	'ক্ষমা পাবে না' !	,,	'ক্ষমা পাবে না'।
	১৪	'নেতাজী জিন্দাবাদ' !	,,	'নেতাজী জিন্দাবাদ'।
	১৫	'মোহনলাল জিন্দাবাদ'!	,,	'মোহনলাল জিন্দাবাদ'।
	১৬	'বিপ্লব জিন্দাবাদ'	,,	'বিপ্লব জিন্দাবাদ'।
১২৯	১	'সুঁটে ব্যানার্জী	,,	'পি সেন সুঁটে ব্যানার্জী'
১৩৪	২৭	'বহিপ্রকাশ'	,,	'বহিঃপ্রকাশ'
১৩৫	১০	'আপাতঃ'	,,	'আপাত'
১৩৭	১৫	'আপাতঃ'	,,	'আপাত'
১৩৮	২	'আনন্দবাজরে'	,,	'আনন্দবাজার'
১৪১	১৬	'অনগল'	,,	'অনর্গল'
১৪২	(শেষ লাইনের পরে যোগ হবে)			ভাব রেখেছি কিন্তু কালে-কটিভলি ঐ কম্যুনিষ্টদের, ভাবতবর্ষের মানুষ হয়ে
১৪৩	৩	ইন্‌সান	,,	উইং সাং, কিং সিং
১৪৩	৭	পারান	,,	পারিনি
১৪৪	২	করলাম মনে	,,	করলাম। মনে
১৪৫	১২	ষারা	,,	যারা
১৫১	২২	টলেছে	,,	চলেছে
১৫২	৩	দেডযুগ	,,	দেড়যুগ
	১৮	প্রতিবাদ যা কিছু	,,	প্রতিবাদ, যা কিছু
,,	১৯	বাণী শোনাচ্ছে	,,	বাণী শোনাচ্ছেল
১৫৫	২২-২৩	নকশাল হবার	,,	নকশাল হবার আশঙ্কার মত

১৬৫	৫	ফ্যাগিজম	,,	ফ্যাসিজম
১৬৮	৫	আশীর বছে	,,	আশী বছরে
১৭১	২৪	মার্কসবাদী	,,	মার্কসবাদীর
১৭২	২০	ইতিহাস বলনে	,,	ইতিহাস বলছে
১৭৫	২০	মবেদক	,,	সমবেদক
১৭৬	৫	অনাস	,,	অনার্স
১৮১	৯	জানুয়ারীবের	,,	জানুয়ারী বের
১৮৪	২০	পেন-ক্র	,,	পেন-থ্রু
১৮৮	৭	একঘেঁয়মিত্বটা	,,	একঘেঁয়েমিত্বটা
১৮৯	২	১ বছর	,,	২ বছর
১৯১	৭	Them urder	,,	The murder
১৯২	১৪	অসামান্য নয়?	,,	অসামান্য নয়?)
১৯৩	১১	দ্রৌপদীর-স্ত্রীর	,,	দ্রৌপদী-স্ত্রীর
২০৩	৬	বং কং	,,	বাং কং মানে বাংলা কংগ্রেস
২০৭	২৬	প্রার্থনা	,,	প্রার্থনা।
২০৮	১৩	(বৈশাখী) ছল	,,	(বৈশাখী) ছিল
২১০	১৯	বালাদেশের	,,	বাংলাদেশের
২১৫	৩	১১ই মার্চর	,,	১১ই মার্চের
২১৫	২৪	৯৭২এ	,,	১৯৭২এ
২১৮	১৭	তঁকে	,,	তাঁকে
২২৪	৪	কীর্তি (!	,,	কীর্তি (!)
২২৫	১৫	রিস্কার	,,	পরিস্কার
	২৫	ব্রতি	,,	প্রতি
২২৬	২২-২৩	নিয়ম চালু হয়।	,,	নিয়ম চালু হয়।'
২২৭	৩	১৯ ৯-৭০	,,	১৯৬৯-৭০
২৩১	৩	র্যালোচনা	,,	পর্যালোচনা
২৩২	১৬	ভূমিক	,,	ভূমিকা

২৩৪	৮	২০ ২।৭২	,,	২০।২।৭২
২৩৪	১২	ডেমে	,,	ডেমো
২৩৪	২৪	সাব্যস্ত	,,	সাব্যস্ত
২৩৫	১৫	অজ্জত	,,	অজিত
২৩৮	৩	দেওয়	,,	দেওয়া
২৪৫	৩	সদিচ্ছা নিয়ে	,,	সদিচ্ছা নিয়ে একস্‌পেরিমেণ্ট
২৪৫	২৩	ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট	,,	ষ্টেট ট্রান্সপোর্টে
২৪৭	৬	ষ্টেটবা র	,,	ষ্টেটবাসের
২৫১	১৮	জনদরদী কথ	,,	জনদরদী কথা
২৫২	১৯	পে ন থেকে	,,	পেছন থেকে
২৬১	২০	প্রধান	,,	প্রবীণ
	২০	এম পি	,,	এম. পি
২৬৫	১৪	মুসোলনি	,,	মুসোলিনি
২৬৭	৩	সেদন	,,	সেদিন
২৬৭	১৯	দের	,,	এদের
২৬৮	৬	যপকাষ্ঠ	,,	যুপকাষ্ঠ
২৬৯	৩	সুনাম বিশিষ্ট জমিদার	,,	সুনামী বিশিষ্ট জমিদার
২৭০	৫	কিছু না জেনে	,,	কিছু না জেনেও
	১১	হাসহাসি	,,	হাসাহাসি
	১৯	এর মধ্যে বেশী	,,	এর মধ্যে বেশী)
২৭১	৬	নিয়েগের প্রচলত	,,	নিয়োগের প্রচলিত
	১২	সাফই'	,,	সাফাই'
	১৮	কশী	,,	কাশী
২৭৪	১৪	খাতিরে নিলে	,,	খাতিরে নিলেও
২৭৭	৩	রকারের	,,	সরকারের
৭৪	৬	বারীণ ঘোষ	,,	অরবিন্দ ঘোষ
১৮৬	২৩	beliave	,,	believe

মন্তব্য

(ক) (১) 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই', (২) 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' (৩) 'অনশনের রীলে রেস'—এই তিনটি পিস্ই অবশেষে বাদ দিতে হল বইয়ের কলেবর বৃদ্ধিরোধের জন্য। ১নং প্রবন্ধটি ১৯৭৩-এর মার্চে লিখেছিলাম সিদ্ধার্থ-সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। ১৯৭২-এর ইলেকশন-পূর্ব লেখা 'বাঙলা যাহা আজ ভাবে ভারত তাহা কাল ভাবিবে', 'পূর্বদিগন্তে রক্তিমাভা' প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলিতে বলা ছিল বামপন্থীদের জেতবার কথা, কিন্তু লোকে বলে সেটা নাকি হয়নি অর্থাৎ আমার কথাটি ভুল হয়েছিল। 'কাদম্বিনী'র প্রবন্ধটি ঐ ১৯৭২-সিরিজের শেষ প্রবন্ধ হিসাবে গণ্য হতে পারতো, সেটির অভাবে ঐ সিরিজটি অসম্পুর্ণ থাকলো। সেটার দ্বারা প্রমাণ করা যেতো আমার কথাটা অত্যন্ত সত্যকথা ছিল। ২নং এবং ৩নং প্রবন্ধেরও এই বইয়ে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সে হিসেবে বলা যায় কিছুটা অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি এ বইয়ে থেকেই গেল। উপায় কি? সর্বদিকে সম্পূর্ণতা আসবে ও সঙ্গতি থাকবে সব ঘটনায়, এটা আমাদের বাঙালী-জীবনে কবে আর আশা করতে পেরেছি? অতএব···থাক্।

আর একটি কথা, ১৯৭২এর ইলেকশন-পূর্ব প্রবন্ধগুলি ভাব-প্রবণ লেখা বলে মনে হবে। তবে তা'বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না—লেখাগুলোর মধ্যে তথ্য আছে, যুক্তিও অনুপস্থিত নয়। যুক্তিবাদী কর্মবীর সুভাষচন্দ্রের ভাবপ্রবণতা কিছু কম ছিল কি? বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই তো তাই।

(খ) ইংরেজী বয়ানের বাংলা অনুবাদ করে দেওয়া প্রয়োজন সহজবোধযোগ্য সাবলীল পাঠের জন্য। কিন্তু সেটা করে ওঠা গেল না। এই বড় ত্রুটীটা অতএব বইয়ে আপাততঃ থেকেই গেল।

(গ) আমার লেখায় ইংরেজী শব্দের অণুপ্রবেশ ঘটেছে একটু বেশী পরিমাণে। এটা সচেতন অবস্থাতেই ঘটেছে—অনায়াসে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা চলতো, কিন্তু তা ইচ্ছাপূর্বকই করিনি। এর যুক্তিভিত্তিক কারণ বিশ্লেষণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপাততঃ বিরত থাকলাম।

গ্রন্থকার